১ নভেম্বর ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

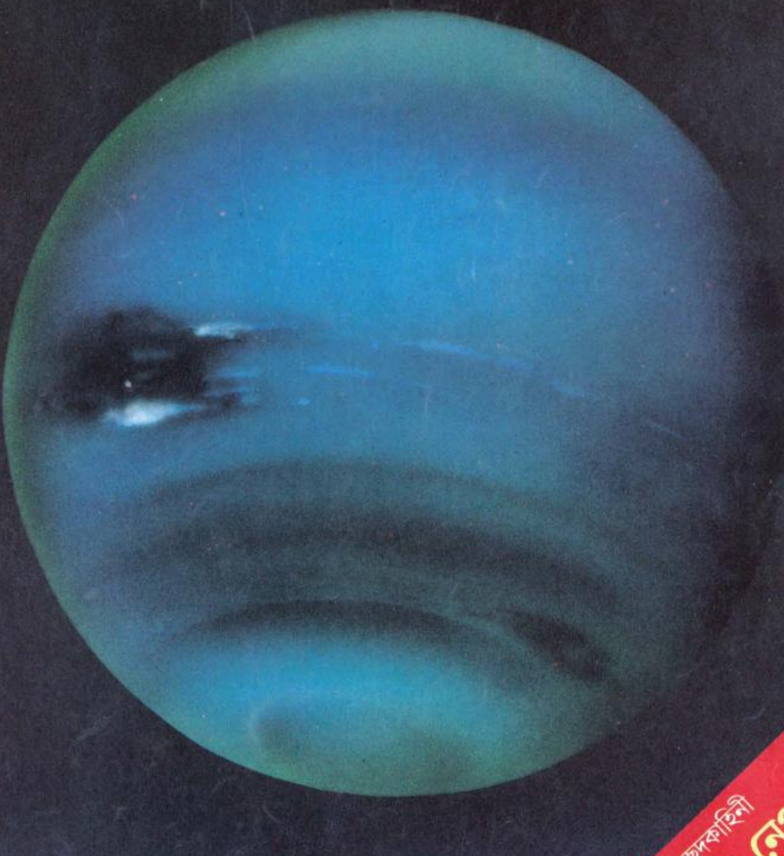

প্রচ্ছদকাহিনী
নীল গ্রহ নেপচুন
শৈলেন ঘোষের সম্পূর্ণ নাটক
কল্যাণ চক্রবর্তীর এই দেশ এই বিশ্ব
জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ
তুলসী সেনগুপ্তের গল্প

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

মুখে ফুটে ওঠে চরিত্র,
দেখলেই বোঝা যায়।

এদের পেছনে রয়েছে এইচ্ এম টির অভিজাত টেক্নলজি এবং বিক্রীর পর সেরা। সবচেয়ে সেরা, অন্যদের থেকে আলাদা, চরিত্র বলে।

hmt
QUARTZ

ট্রামে বাসে ঠাসাঠাসি,
বাদুড় ঝোলা রোজ,
ঘরে ফিরে এসে তাই
পড়ে এর খোঁজ...

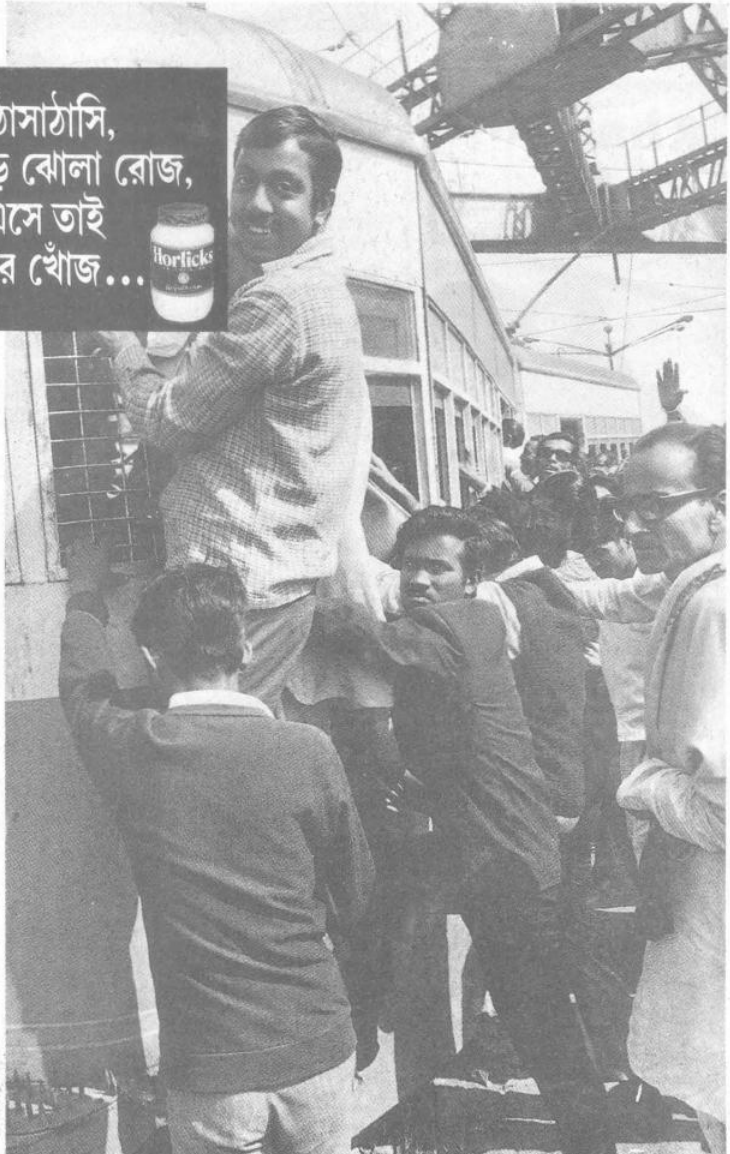

দশটা-পাঁচটা। ডাল-হা-উ-সি। এ-স-প্লা-নেড! এছাড়াও খেলার ভীড়, 'সেলের' ভীড়, মিটিং-এর ভীড়, কাজে যাওয়া আর বাড়ী ফেরায় যেন সমান কসরৎ। ভাগ্যিস হরলিক্স ছিল। কলকাতার জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে, প্রাণে ফুর্তি, কাজে উদ্যম ছড়িয়ে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য পুষ্টি যুগিয়ে। তাইতো কলকাতার ঘরে ঘরে সব সময়ই পাবেন হরলিক্স। হাজার ধকল সয়ে বাড়ী ফিরে এসেই আবার তরতাজা। আর মুখে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি যা একমাত্র কলকাতা ছাড়া আর কোথায় এমন প্রাণ কাড়া!

কলকাতা
১৬৯০-১৯৯০

প্রাণের শহর কলকাতায়, পুষ্টি যোগায়, মনমাতায়, হরলিক্স

HTA 3793

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ নাটক

আলোর চমক শৈলেন ঘোষ ৭০

প্রচ্ছদকাহিনী

নীল গ্রহ নেপচুন বিমল বসু ১২

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৪
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫৩

গল্প

তীর্থের কাক তুলসী সেনগুপ্ত ৬০
জলের মানুষ অনিতা অগ্নিহোত্রী ৯১

কবিতা

পামলির ভাই প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৭

কমিক্‌স

টারজান ৫২, রোভার্সের রয় ৫৭, গাবলু ৩৯, টিনটিন ৮৭, পঞ্চরত্ন ৮৯

বিজ্ঞানবিচিত্রা

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১
রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট চঞ্চল পাল ৪০

বিশ্ববিচিত্রা

কলম্বাসের বারো হাজার বছর আগে সুব্রত রায় ২১

এই দেশ এই বিশ্ব

ভারতের বন্যপ্রাণী — কল্যাণ চক্রবর্তী ২৮

গ্রন্থাগার

আমাদের গ্রন্থাগার জগমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৭

ভ্রমণ

সিমলি পাহাড়ের জঙ্গলে যুধাজিৎ দাশগুপ্ত ৩১

কেরিয়ার গাইড

ফিশারিজ পড়তে হলে দেবব্রত মল্লিক ৮৪

খেলাধুলো

সাঁতারু সঞ্জীবন তানাজি সেনগুপ্ত ৪২
আমি সম্বরণ ব্যানার্জি ৪৩
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৪
ইংল্যান্ডের নির্বাচকদের …সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪৬
খেলার খবর ৪৭
কিথ আর্থারটন ৪৯, আন্দ্রে আগাসি ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, কুইজ ৮, শব্দসন্ধান ২৭, চেনা না-চেনা ৩৬, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৪৮, বাইরের জানালা ৫৯, আকাশে ওড়ার কথা ৬৫, নিজের হাতে বানাও ৬৮, হাতে-কলমে ৯৪, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

প্রচ্ছদ

সুবীন দাস

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

৩১

বনে-জঙ্গলে বেড়ানোর মজাই আলাদা। গাছের ছায়ায় দেখা মেলে অজানা কত জীবজন্তুর। কীটপতঙ্গও সেখানে চোখে পড়ে অনেক। প্রকৃতির পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের

১২

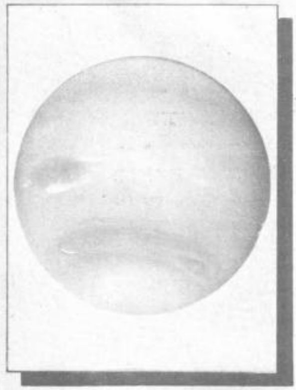

আমেরিকার কেপ ক্যানাভেরাল কেন্দ্র থেকে মহাকাশে উৎক্ষেপণের বারো বছর পর ভয়েজার-২ পৌঁছেছে নেপচুনের কাছে। এটাই তার অভিযানের লক্ষ্য। যাত্রাপথে বিভিন্ন সময়ে বৃহস্পতি, শনি আর ইউরেনাসের নানা খবর পাঠিয়েছে ভয়েজার-২। তারপর পৃথিবী থেকে ২৮০ কোটি মাইলেরও বেশি দূরের নেপচুন গ্রহ সম্পর্কে সে যেসব খবর পাঠিয়েছে তা যেমন অভিনব, তেমনই চমকপ্রদ। ভয়েজার-২-এর পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতেই পরিবেশিত হল এবারের প্রচ্ছদকাহিনী। নেপচুনের রং কেন উজ্জ্বল নীল, নেপচুনের উপগ্রহের সংখ্যা কত—এ-ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই নিবন্ধে।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও

জন্য অপেক্ষা করে থাকে এরকমই নানা বিস্ময় । সিমলি পাহাড়ের জঙ্গলও এর ব্যতিক্রম নয় । আর এই জঙ্গলও খুব একটা দূরে নয় । প্রায় বাড়ির কাছেই । এবারের ভ্রমণ এই সিমলি পাহাড়ের জঙ্গলে, প্রকৃতির চিরদিনের নিমন্ত্রণে ।

৩৭

বৌদ্ধ যুগে ভারতে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল । বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও জ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য লেখা হয়েছিল অনেক পুঁথি । আসলে, ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো । এবং এই চর্চায় আমাদের গ্রন্থাগারগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে ।

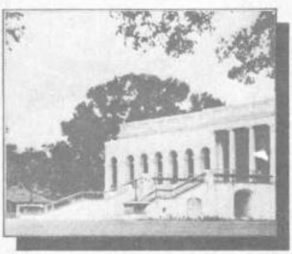

৭০

শৈলেন ঘোষের সম্পূর্ণ নাটক 'আলোর চমক' । নাটকে তিনটি দৃশ্য । দু'টি দৃশ্য রাস্তার, আর একটি সুলতানের দরবারের ।

৪২

এর আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সাঁতারু খাজান সিং, বুলা চৌধুরী, উর্মিলা ছেত্রী ও সুমিতা পাড়ুইয়ের কথা । এবার প্রকাশিত হল দূরপাল্লার সাঁতারু সঞ্জীবন মণ্ডলের একাগ্র সাধনা ও সংগ্রামের খবর । নানা অসুবিধার মধ্যেও সঞ্জীবন যেভাবে এতদিন ধরে সাঁতার কেটে যাচ্ছেন সেটাই অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে ।

আগামী সংখ্যায়

শ্যামসুন্দর বসুর প্রচ্ছদকাহিনী

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

হিমানীশ গোস্বামীর সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

বিচিত্র পাথর-রহস্য

সমারসেট মম-এর গল্প

রাজকন্যা সেপ্টেম্বর

অরূপরতন ভট্টাচার্যের নিবন্ধ

আকাশ চেনো

সন্ধ্যা দত্তের নিবন্ধ

হেনরি ডুনান্ট ও রেডক্রস

Disproportionate Returns for SMALL INVESTMENTS & What more & Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

*** An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

ক্যাপটেন হতে হলে

খুব ভাল লাগে আমার 'আনন্দমেলা'র 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগটি। ২৩ অগস্ট সংখ্যায় 'অথৈ সমুদ্রে জাহাজে-জাহাজে' লেখাটি পড়লাম। লেখাটি এত সংক্ষেপে লেখা হয়েছে যে, সব

তথ্য ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। যেমন, হায়ার সেকেন্ডারিতে কমপক্ষে শতকরা কত নম্বর পেতে হবে, কত বয়স হওয়া দরকার, ভর্তি হওয়ার জন্য কোথায় এবং কখন যোগাযোগ করতে হবে, কীভাবে ভর্তি হতে হয়, পরীক্ষা হলে তার বিষয় কী, কীরকম মেডিকেল ফিটনেস থাকা দরকার, পড়তে গেলে কীরকম খরচ লাগে—এইসব প্রশ্নের উত্তর জানালে ভীষণ ভাল হয়।

কে. এ. সমাদ্দার
হাওড়া
রূপক ভট্টাচার্য
প্রফুল্ল কানন, কলকাতা-৫৯

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। ২৩ অগস্ট সংখ্যায় দেবব্রত মল্লিকের লেখা 'অথৈ সমুদ্রে জাহাজে-জাহাজে' পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। কিন্তু লেখাটির মধ্যে যদি লেখক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানাতেন, তা হলে খুব ভাল হত। পাঠকরাও ওই তথ্যগুলি জেনে উপকৃত হতেন। তথ্যগুলি হল

(১) এই কোর্স পড়ার জন্য ন্যূনতম বয়স

(২) এই কোর্সে ভর্তির জন্য হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করা যে-কোনও মহিলা আবেদন করতে পারেন, না, এই কোর্স শুধুমাত্র পুরুষরাই পড়তে পারবেন?

(৩) শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা এই কোর্সে পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন, না, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররাও আবেদন করতে পারেন?

(৪) এই কোর্স পড়তে হলে ভর্তির আবেদনপত্র কোথা থেকে, কীভাবে এবং কোন সময় সংগ্রহ করতে হবে?

পাপিয়া হালদার
বেহালা, কলকাতা-৬০

লেখকের উত্তর

ভারতীয় জাহাজে মেয়েরা কাজ করছেন, এ-খবর এখনও পর্যন্ত জানা নেই। বিদেশে জাহাজে মেয়েরাও কাজ করছেন। যাই হোক, আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই

(১) ভিন্ন-ভিন্ন কোর্সে পড়ার জন্য ন্যূনতম বয়সও আলাদা। তবে ১৮ বছর থেকেই মোটামুটিভাবে শুরু হয়।

(২) শুধুমাত্র পুরুষরাই এই কোর্সে পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

(৩) কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররাই আবেদন করতে পারেন।

(৪) প্রতিটি কোর্সে ভর্তির জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় পরিচিতি

আনন্দমেলার ৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বিদ্যালয়-পরিচিতি বিভাগে আমাদের স্কুলের পরিচিতি পড়ে খুব ভাল লাগল। লেখক নীরদ রায়কে এজন্য ধন্যবাদ জানাই। লেখাটিতে দু-একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়েছে—তাই এই চিঠি। লেখাটির এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, 'অঙ্কের শিক্ষক সুহাসকুমার সরকার এবং ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক সরোজকুমার চক্রবর্তী ।' আসলে অঙ্কের শিক্ষকের নাম হবে সুভাষকুমার সরকার এবং ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষকের নাম হবে মনোজকুমার চক্রবর্তী।

নীলাদ্রিশেখর গোস্বামী
জেনকিন্‌স্‌ স্কুল, কোচবিহার

একজন নিয়মিত পাঠক আমি 'আনন্দমেলা'র। এর প্রতিটি বিভাগের যেরকম উন্নতি হয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। সব ক'টি বিভাগের মধ্যে আমার বেশি ভাল লাগে 'বিদ্যালয়-পরিচিতি' বিভাগটি। এই বিভাগে 'নাকতলা উচ্চ বিদ্যালয়' সম্পর্কে যদি পরিচিতি প্রকাশ করেন, খুব আনন্দিত হব।

সুদীপ বসু
নাকতলা উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা-৭০

এঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স

আনন্দমেলা ৩১ মে সংখ্যায় প্রকাশিত 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগে 'মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা' লেখাটি পড়লাম। এই লেখায় লেখক অমর দাশ একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই কোর্সটি হল পাঁচ বছরের। আমি কোচবিহার পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র। আমি জানি এই কোর্স তিন বছরের।

অর্ণব মুখোপাধ্যায়
কোচবিহার পলিটেকনিক

লেখকের উত্তর

এঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স তিন বছরের। আমার লেখায় অনবধানবশত এই কোর্স পাঁচ বছরের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুলটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

বউ-কথা-কও পাখি বাসা বাঁধে

'পাখি ও শাবকের কথা' আনন্দমেলা ৯ অগস্ট সংখ্যায় সাধনা মুখোপাধ্যায়ের এই লেখাটি পড়লাম। লেখিকা লিখেছেন, কোকিল, বউ-কথা-কও পাখিরা নিজেরা বাসা তৈরি না করে কাক বা অন্য পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে। কোকিল বাসা তৈরি না করে অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে ঠিকই, কিন্তু বউ-কথা-কও নিজের বাসা নিজেই তৈরি করে। এদের বাসা হয় খুব গোছানো এবং আঁটসাট। বাসা তৈরি করার জন্য এই পাখিরা কলা গাছের শুকনো পাতলা খোসা, শুকনো বাঁশপাতা ব্যবহার করে।

সেখ নাসিরউদ্দিন
উত্তর মৌড়ি, হাওড়া-২

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়

এক বৎসর
১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর
৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)

আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফ্‌ট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

ডাক মাশুল লাগবে না

পামলির ভাই

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

পামলি ভাইকে বলে, রাত হল, ঘরে আয়,
ছাদের ওপরে তুই কী করিস অবেলায় ?
মা রাগ করেছে, বাবা তাস-টাস জড়িয়ে,
এখন কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন ছড়িয়ে—
ছাদের পাশে যে আছে ঝুরিনামা বটগাছ
সেখানে তাকিয়ে থেকে তুই কী ভাবিস সাতপাঁচ ?
রাজকুমারীরা কি কেউ থাকে ওর কোটরে ?
আজকাল ওরা যান বড় বড় মোটরে !
জোনাকি ধরিস কেন ? ওরাও তো আলো দেয়।
বাবা এনেছেন আম, চিঠি লিখে মালদায়।
আম-টাম খেয়ে তুই ধারাপাত নিয়ে বোস,
অঙ্ক না পারলেই করিস তো ফোঁসফোঁস।
প্রথমে তো নেমে আয় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়
এখন উঠেছে ঝড়, গাছে পাতাগুলো তোতলায়।
ঝড় শুরু হলে পরে নামবে তো বৃষ্টি
এখন বাইরে থাকা মানে অনাসৃষ্টি।
কী করিস একা-একা ঘুটঘুটে আঁধারে ?
জলের ট্যাংকে তুই ছবি এঁকেছিস বাঁ-ধারে।
মা বলেছে তোকে আজ দেবে খুব পিট্টি,
বিকেলে খেলি না আম, ফেলে দিলি মিষ্টি।
আমাকে লুকিয়ে তুই কাল খেলি পেয়ারা,
তারপর চড় খেয়ে কী যে হল চেহারা !
কিছুই লাগে না ভাল, বললে তো চলে না।
পড়াতেও মন নেই, মন ফুটবলে না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

নাপাম

১৯৪৫ সালের ৯ মার্চ মাঝ রাতে টোকিও শহরে হঠাৎ বিমান আক্রমণের সাইরেন বেজে উঠল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপর্ব চলেছে। দুটো মার্কিন বি-২৯ বিমান উড়ে এল টোকিওর আকাশে ; প্রতি রাতেই যেমন উড়ে আসে। মানুষজন তেমন আমল দিল না। ঘড়িতে তখন রাত্রি ১২-১৫।মিঃ। বি-২৯ বিমানথেকে অদ্ভুত এক বোমা এসে পড়ল শহরের কেন্দ্রস্থলে। তাতে সৃষ্টি হল আগুনের শিখায় আঁকা একটি X চিহ্ন। এবার সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে তিনটি জঙ্গি বিমান থেকে ঝরে পড়ল মোট ১৯০০ টন আগুনে-বোমা, যে বোমা আগে কেউ দ্যাখেনি। শহরের ঘন বসতিপূর্ণ কেন্দ্রাঞ্চলের কাঠের বাড়িগুলোতে আগুন ধরে গেল। ঝোড়ো বাতাসে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল শহরতলির দিকে। এরপর কয়েকদিন ধরে চলল অগ্নিলীলা। তাপমাত্রা উঠল ১৮০০° ফারেনহাইট। টোকিও শহরের বিরাট এলাকা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মারা পড়ল প্রায় ৮০ হাজার মানুষ। গৃহহারা হল অন্তত দশ লক্ষ। ধ্বংসস্তূপ জুড়ে শুধু দগ্ধ, ঝলসানো মৃতদেহ। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

নাপাম! আগুনে-বোমা নাপামের লকলকে জিভ সেদিন টোকিওর এক-চতুর্থাংশ এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছিল। নাপাম বোমার সেটাই প্রথম বড় রকমের প্রয়োগ। কী এই বোমা, যা অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে একটা বড় শহরকেও পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে?

নাপাম হল জেলিজাতীয় একরকমের রাসায়নিক বিস্ফোরক। কয়েকটি জৈব অ্যাসিডের মিশ্রণ। এর দুটি প্রধান উপাদান— ন্যাপথেনিক অ্যাসিড এবং পামিটিক অ্যাসিড থেকেই 'নাপাম' শব্দটির উৎপত্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটেন রাবার ও গ্যাসোলিন মিশিয়ে এক রকমের আগুনে-বিস্ফোরক তৈরি করে। কিন্তু জাপান রাবার-উৎপাদক সমস্ত এলাকা দখল করে নেওয়ায় অক্ষ শক্তি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আগুনে-বোমা উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়। এর দায়িত্ব দেওয়া হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এবং দু'টি বেসরকারি কম্পানিকে। এই যৌথ গবেষণা চলে একবছরেরও বেশি। এবং নাপাম নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় ২৫ শতাংশ ওলেয়িক অ্যাসিড, ২৫ শতাংশ ন্যাপথেনিক অ্যাসিড এবং ৫০ শতাংশ পামিটিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে। এরপর বিমানে ব্যবহারযোগ্য পেট্রলের সঙ্গে সেটি মেশাতেই পাওয়া যায় জেলিজাতীয় একটি পদার্থ, সংঘাতে অথবা আগুনের ছোঁয়া পেলেই যা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

নাপাম তৈরি হতেই মার্কিন সেনাবাহিনী যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে যায়। কারণ, এই বোমা যেমন সহজেই বানানো যায়, তেমনই খরচও যথেষ্ট কম। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, নাপাম অন্য যে-কোনও জ্বলনশীল রাসায়নিকের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে জ্বলে এবং অধিকতর তাপমাত্রার সৃষ্টি করে। নাপামের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোনও পদার্থের সংস্পর্শে এসে জ্বলতে থাকলে পদার্থটি যতক্ষণ না পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ছিনেজোঁকের মতো তার গায়ে লেগে থাকে। সুতরাং, যুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসাবে এর জুড়ি মেলা ভার।

মার্কিন সেনাবাহিনীর রাসায়নিক যুদ্ধবিভাগ প্রথম এম-৬৯ নামে বড় আকারের একটি নাপাম বোমা বানায় এবং খুব উঁচু থেকে সেটি নিক্ষেপ করলে মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে সেটি বিস্ফোরিত হয়। এটা ছিল পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। তারপর ১৯৪৫-এ জাপানে নাপাম ফেলা হয়, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

আজও নাপাম একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র। বিশেষত, গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে খুবই উপযোগী। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে নাপাম প্রয়োগ করেছিল। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল বহু গ্রাম এবং ফসলের খেত।

আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে উভয়পক্ষই যথেচ্ছ নাপাম ব্যবহার করে। বর্তমানে গ্রেনেড, আকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড তৈরিতেও নাপাম ব্যবহৃত হচ্ছে।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) হেভিওয়েট বক্সিংয়ের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান মাইক টাইসনের সাম্প্রতিকতম লড়াইটি ছিল কার বিরুদ্ধে ? **শাশ্বত কুমার,** পাঠভবন, বিশ্বভারতী ।

(২) এম সি সি কথার পুরোটা কী ? **সুমন্ত বেরা,** ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুল ।

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন রাষ্ট্রপতি নিজের নামানুসারে

বর্ষের নামকরণ করেছিলেন ? **কৌস্তভ দাশ,** দঃ ত্রিপুরা ।

(৪) রয়টার কী ? **দেবাশিস**

মাইতি, হুগলি ।

(৫) কোন ভারতীয় ক্রিকেট-অধিনায়ক ভারতে পর পর পাঁচটি টেস্টই টসে জিতেছেন ? **সৌমেন মণ্ডল,** বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ।

(৬) C. I. D.-র পুরোটা কী ? **কমল সিওয়া,** জলপাইগুড়ি ।

(৭) কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কে ছিলেন ? **রথীন্দ্রনাথ দে,** কোন্নগর ।

(৮) ১৯৮৭-তে গঠিত ইলেকট্রনিক্স কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম কী ? **কল্যাণ মাহাতো,** পশ্চিম দিনাজপুর ।

(৯) মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ কথাটা কী ? **অরিজিৎ সেনগুপ্ত,** মেদিনীপুর ।

(১০) 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থটি কার লেখা ? **অভিজিৎ ব্যানার্জি,** বৈদ্যবাটী ।

(১১) বেগম আখতার কী ধরনের গানের জন্য বিশেষভাবে পরিচিতা ছিলেন ? **শর্মিতা মাইতি,** ঝাড়গ্রাম ।

(১২) ১৯৮০-র 'ভারতরত্ন' কে ? **দেবাশিস চক্রবর্তী,** সোদপুর হাই স্কুল ।

(১৩) সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'অপরাজিত'-র সঙ্গীত পরিচালক কে ?

(১৪) 'মহাভারত' টিভি সিরিয়ালে দ্রৌপদীর ভূমিকায় কে অভিনয় করছেন ? **শুভ্রজিৎ** সেনগুপ্ত, মেদিনীপুর ।

(১৫) কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এ বিশ্বশ্রেষ্ঠ বোলার কে ? **সৌমেশ মণ্ডল,** ভোগপুর ।

(১৬) কোন সালে আর্থার

কোনান ডয়েল-এর জীবনাবসান ঘটে ? **অয়ন চক্রবর্তী,** হেয়ার স্কুল ।

(১৭) মিলখা সিংহের পুত্র কোন

খেলায় বিখ্যাত হয়েছেন ?

(১৮) অর্জুনের ধনুকের নাম কী ? **দেবচাঁদ মণ্ডল,** বাঁকুড়া ।

(১৯) ইহুদিদের ভাষার নাম কী ? **ধ্রুবজ্যোতি বণিক,** শিশুবিহার স্কুল, আগরতলা ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) গ্রেগ চ্যাপেল আবির্ভাব এবং বিদায়লগ্নে সেঞ্চুরি করেন ।

(২) আনটানারিভো ।

(৩) সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মা জগত্তারিণী দেবীর নামানুসারে ।

(৪) ম্যাপ তৈরি করার প্রণালী ।

(৫) ওয়াটারপোলো ।

(৬) পঞ্চায়েত ।

(৭) পল্লব রাজ মহেন্দ্রবর্মন ।

(৮) নিউ ইয়র্ক বন্দরের কাছে বেডলোর দ্বীপ ।

(৯) ৪০ হাজার ২৩২ কিমি ।

জিমি কার্টার

ডন ব্রাডম্যান

(১০) ৫৬৯৭×১০^{১৮} (টন) আনুমানিক ।

(১১) অশোক গানদোত্রা ।

(১২) হেমোসেপিয়েন্স ।

(১৩) ইতালি ।

(১৪) আইজাক নিউটন ।

(১৫) গ্রাহাম বেল ।

(১৬) ডন ব্রাডম্যান ।

(১৭) অমনি ।

(১৮) শ্রীলঙ্কার রুমেশ রত্নায়েকে ।

(১৯) সত্যজিৎ রায় ।

(২০) জিমি কার্টার ।

(২১) মাইকেল চ্যাং ।

কুইজ

বিষয় :
জওহরলাল নেহরু

প্রশ্ন

(১) নেহরু-পরিবারের পদবি কী ছিল ?
(২) নেহরু-পরিবার হিসেবে কীভাবে তাঁরা পরিচিত হলেন ?
(৩) জওহরলাল নেহরু ব্রিটেনের কোন স্কুল ও কলেজে পড়েছিলেন ?
(৪) জওহরলালের পিতার নাম মতিলাল । জওহরলালের মায়ের নাম কী ?
(৫) কমলার পদবি কী ছিল ?
(৬) স্বরূপকুমারী কার নাম ?
(৭) ১৯২১ সালে জওহরলাল প্রথম জেলে যান । সেই জেলটি কোথায় ?
(৮) ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন জওহরলাল । তাঁর পূর্বসূরি কে ?
(৯) জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনী কাকে উৎসর্গ করেছেন ?
(১০) নেহরু তাঁর আত্মজীবনী কোথায় লিখেছিলেন ?
(১১) Glimpses of World History নেহরু প্রথমে কীভাবে লিখেছিলেন ?
(১২) জওহরলালের প্রশংসা করে এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, "a soldier whose banner is the banner of the exploited and a patriot whose humanity and vision are not obstructed by the barriers of his land and its past." কে এই বিখ্যাত ব্যক্তি ?
(১৩) গান্ধীজি সত্যাগ্রহের জন্য প্রথমে দু' জন স্বেচ্ছাসেবীকে বেছে নিয়েছিলেন । জওহরলাল ছিলেন দ্বিতীয় । প্রথমজন কে ?
(১৪) ১৯৪৫-এ, যুদ্ধের পর, নেহরু বহু বছর বাদে ব্যারিস্টারের গাউন গায়ে চাপিয়েছিলেন । কেন ?
(১৫) নেহরু তাঁর এক স্মরণীয় ভাষণের শুরুতে বলেছিলেন, "Friends and Comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere and I do not quite know what to tell you and how to say it." কখন তিনি এই ভাষণ দিয়েছিলেন ?
(১৬) প্রথম এশিয়ান গেমসে নেহরুর বিখ্যাত বাতাটি কী ছিল ?
(১৭) পঞ্চশীল নীতি নেহরু কোথা থেকে গ্রহণ করেছিলেন ?
(১৮) "I want to take a pledge...now and here that we shall see this matter to the end and the end will have to be victory for India."
নেহরুর এই অঙ্গীকারের উপলক্ষ কী ?
(১৯) নেহরু তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কী নির্দেশ দিয়ে গেছেন ?
(২০) পাশের ছবি তিনটির পরিচয় কী ?

(ক)

(খ)

(গ)

উত্তর : (১) কল । (২) ওঁদের এক পূর্বপুরুষকে কাশ্মীরে একটি খালপাড়ে জায়গির দেওয়া হয়েছিল ; খাল বলতে সেখানে বোঝায় নাহার । তখন ওঁদের বলা হত কল-নেহরু । পরে কল চলে গিয়ে নেহরু পদবিটা থেকে যায় । (৩) হ্যারো ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে । (৪) স্বরূপ রানি । (৫) কল । (৬) জওহরলালের বোন । রণজিৎ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নামে পরিচিতা হন । (৭) লখনউয়ে । (৮) তাঁর পিতা মতিলাল । (৯) স্ত্রী কমলাকে । (১০) ১৯৩৪-এর জুন থেকে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারাগারে । (১১) কন্যা ইন্দিরাকে চিঠির আকারে লিখেছিলেন । (১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । (১৩) বিনোবা ভাবে । (১৪) ভারতীয় জাতীয় ফৌজের বন্দীদের বিচার হয়েছিল লাল কেল্লায় । তাঁদের পক্ষে সেদিন জওহরলাল নেহরু আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । (১৫) গান্ধীজির মৃত্যুর সময় । (১৬) Play the game in the spirit of the game. (১৭) বুদ্ধের শিক্ষা থেকে । (১৮) চিন যুদ্ধ—নভেম্বর, ১৯৬২ । (১৯) তিনি চেয়েছিলেন তাঁর চিতাভস্মের অনেকটাই যেন আকাশ থেকে ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর কিছুটা চিতাভস্ম যেন ভাসিয়ে দেওয়া হয় এলাহাবাদের কাছে গঙ্গায়, যাতে তা সমুদ্রে গিয়ে মেশে । ২০ (ক) ভাস্কর জ্যাকব এপস্টাইন ও তাঁর করা জওহরলাল নেহরুর আবক্ষ মূর্তি ; ২০ (খ) বিড়লা হাউসের গেট থেকে নেহরু জানাচ্ছেন গান্ধীজির মৃত্যুর খবর, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ; ২০ (গ) ফিরোজ গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর সঙ্গে নেহরু ।

স্কাইসাইকেল

নাম, পার্সোনাল জাইরোপ্লেন। ওজন ৩০৬ পাউন্ড। চেহারায় অনেকটা হেলিকপ্টারের মাসতুতো ভাই— তবে মাপে ছোট। এই বিচিত্র উড়ানযন্ত্রটি উঠতে পারে ১৪,৫০০ ফুট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ অনুভূমিক গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৯৩ মাইল। আর ওপরে উঠতে পারে মিনিটে ১৪০০ ফুট হারে। যন্ত্রটির পাল্লা হল ৩১৫ নটিকাল মাইল। এতে দু'জনের বসার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এ ছাড়া শস্যক্ষেত্রে কীটনাশক ছড়ানো কিংবা নজরদারির কাজে ব্যবহারের জন্য কিছু মালপত্র রাখার ব্যবস্থাও আছে। এই আকাশযানটির দাম ১০,০০০ ডলার। তৈরি করেছেন নিউ মেক্সিকোর 'জাইরো-২০০০' কম্পানি।

চোখ বাঁচাতে তরল সানগ্লাস

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার ওপরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের স্তর, যাকে বলা হয় ওজোনোস্ফিয়ার। সূর্য থেকে যে-বিকিরণ পৃথিবীর দিকে আসে তাতে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি থাকে। এই রশ্মি গাছপালার পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই, এমনকী, মানুষের পক্ষেও। আবহমণ্ডলের ওজোনস্তর অতিবেগুনি রশ্মির অনেকটাই শুষে নেয় এবং পৃথিবীকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। আবহবিদদের মতে দূষণের ফলে ওজোনস্তর ক্রমেই তার উপকারিতা হারাচ্ছে এবং আমাদের চোখ অতিবেগুনি রশ্মির কাছে আরও বেশি বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অতিবেগুনি রশ্মি দু' ধরনের : 'এ' এবং 'বি'। চক্ষুবিশেষজ্ঞদের ধারণা, 'এ' রশ্মি রেটিনার কোষ নষ্ট করে দিয়ে বয়স্ক মানুষদের অন্ধত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর 'বি' রশ্মি হচ্ছে চোখে ছানি পড়ার কারণ। খুব উন্নতমানের সানগ্লাস ব্যবহার করলে দু' ধরনের অতিবেগুনি রশ্মির অন্তত ৬০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ রুখে দেওয়া যায়। নিউ জার্সির চক্ষুবিশেষজ্ঞ নেভিল এ-ব্যারন বলেছেন, "সানগ্লাসের ফ্রেমের পাশে যে-ফাঁক থাকে তাতেই শতকরা ৩৫ ভাগ ঝুঁকি থেকে যায়।" সুতরাং চোখকে নিশ্চিতভাবে বাঁচাতে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করলেন একটি তরল ওষুধ। এই ওষুধ এক ফোঁটা চোখে দিলে দুই থেকে চার ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত— শতকরা ৯৮ ভাগ অতিবেগুনি রশ্মি রুখে দেওয়া যাবে। চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে চোখে আবার এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলেই হবে। এই ওষুধে চোখের কোনও ক্ষতি হয় না, আর ওষুধ দেওয়া অবস্থায় দেখতেও কোনওরকম অসুবিধে হয় না।

কাপড় কাচা যন্ত্র তৈরির কাজে রোবট

ছবিতে দেখা যাচ্ছে রোবটের 'হাত' তৈরি করছে কাপড় কাচা যন্ত্র। কিন্তু রোবটকে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালনা করছে কে? প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার বা পি· এল· সি। কোনও একটা বড় মাপের কাজ প্রথমে ভেঙে নেওয়া হয় ছোট-ছোট ধাপে। যেমন, আমাদের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কাজ। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখার আগে আমাদের চোখ সিঁড়িটার অবস্থার নানান খবর পৌঁছে দেয় আমাদের মস্তিষ্কে। সিঁড়ির ধাপের উচ্চতা কত, সিঁড়িটা পিছল কি না, সিঁড়ির ধাপগুলো কিসের তৈরি—অর্থাৎ, আমাদের শরীরের ওজন নিতে পারবে কি না, এইসব নানান খবর নিয়ে মস্তিষ্ক তুলনামূলক বিচার করে। বিচারে সন্তুষ্ট হলে তবেই সে পা-কে নির্দেশ দেয় সিঁড়ির ধাপে পা রাখার জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সিঁড়িতে প্রথম পা রাখার আগে কিছু বিষয় বিচার করতে হয়। পরিভাষায় একে বলে 'লজিকাল স্টেপ'। যদি কোনও ভাবে কোনও যন্ত্রে এই লজিকাল স্টেপগুলো নিখুঁতভাবে পালন করার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে সেই যন্ত্রকে দিয়ে অনেকরকম কাজই করানো সম্ভব। প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার ঠিক এই লজিকাল স্টেপগুলোই রোবটকে দিয়ে পালন করায়। আর একই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দেয় ঠিক কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশটি ক্রমানুসারে সে পালন করবে। সিমেন্স কম্পানির সিমাটিক-এস ফাইভ পি· এস· সি-র কর্মদক্ষতা এমন যে, তার পরিচালিত রোবট শুধু কাপড় কাচা যন্ত্র কেন, গাড়িও তৈরি

করতে পারে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় তারা বহুরকমের কাজ করে চলেছে গোটা পশ্চিম জার্মানি জুড়ে। এসব শুনে মনে হয়, রোবটের যুগ বুঝি সত্যিই এসে পড়ল।

অনুসন্ধানী

নীল গ্রহ নেপচুন

বিমল বসু

ঝোড়ো আবহাওয়ায় নেপচুন

পৃথিবী থেকে ২৮০কোটি মাইলেরও বেশি দূরের এই গ্রহ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য পাঠিয়েছে ভয়েজার-২।

কন্ট্রোল প্যানেলে মনিটরের বিশাল পরদায় ফুটে উঠল ঘননীল একটি গোলক। নক্ষত্রখচিত মেহগনি রঙের আকাশে যেন সুবৃহৎ একখণ্ড নীলা। আকারে পৃথিবী থেকে দেখা পূর্ণিমার চাঁদের মতো। 'ওই তো নেপচুন!' ক্যাপ্টেন রণজয় স্মিথ-এর পাশে বসে থাকা মেয়েটি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল। মহাকাশযান 'গ্র্যান্ড-ট্রাভেলার' তখনও গ্রহটি থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে। "ইয়েস", ক্যাপ্টেন বললেন। "আর এক দিনেই ওর দু' হাজার মাইলের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব", মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন ক্যাপ্টেন। পামেলা গর্গ নামে মেয়েটি লম্বা পাড়ির এই মহাকাশযানের রেডিও এঞ্জিনিয়ার। ক্ষণিকের আবেগে কন্ট্রোল-সুইচ থেকে সরে গেল তার আঙুল। মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে পাশের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। অপরূপ ওই জ্যোতিষ্ককে চাক্ষুষ দেখতে না পেলে যেন তার মন ভরছে না।

২১৬০ সালে সৌরমণ্ডল চক্কর দিতে বেরিয়েছে গ্র্যান্ড-ট্রাভেলার। ১৭৬ বছর অন্তর-অন্তর গ্রহগুলি পরস্পর এমন একটা অবস্থানে আসে যে, এক-একটি গ্রহের অভিকর্ষ বলকে কাজে লাগিয়ে কোনও মহাকাশযান গুলতি থেকে ছোঁড়া গুলির মতো ছিটকে পরবর্তী গ্রহের দিকে ছুটে চলে। ফলে, ঘণ্টায় ৮০ হাজার মাইল বেগে ধাবমান যানে গতি সৃষ্টির জন্য খুব সামান্য শক্তিরই প্রয়োজন হয়। সেই মহালগ্নেই দশজন যাত্রীসহ গ্র্যান্ড টুরে বেরিয়েছে গ্র্যান্ড-ট্রাভেলার।

কাল্পনিক কাহিনী। তবে আজকের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এখন থেকে একশো চৌষট্টি বছর পরে সেই মহাক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তার অনেক অনেক আগেই, হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন মহাকাশযানে চড়ে মানুষ যাবে গ্রহদের দরজায়-দরজায়, যেমন গেছে আজকের মানুষবিহীন পাইওনিয়ার,

রোমাঞ্চকর শেষ ছবি

বারো বছরে ৪৪৩ কোটি মাইল পথ পেরিয়ে ভয়েজার-২ গত ২৪ অগস্ট তার শেষ লক্ষ্য নীল গ্রহ নেপচুনের কাছে পৌঁছেছে। দূর মহাবিশ্বের গ্রহদের সম্বন্ধে সফল হয়েছে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা। মহাবিশ্ব সম্পর্কে পুরনো অনেক ধ্যানধারণাই চিরদিনের মতো বদলে যাচ্ছে

ইউরেনাস
২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৬

ভয়েজার প্রভৃতি গ্রহসন্ধানী যান।

মার্কিন গ্রহ-যান ভয়েজার-২ গত মাসের শেষাশেষি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৭ সালের ২০ অগস্ট আমেরিকার কেপ ক্যানাভেরাল মহাকাশ-কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার বারো বছর পর পৌঁছেছে অভিযানের শেষ লক্ষ্য নেপচুনের কাছে। যাত্রাপথে বিভিন্ন সময়ে বৃহস্পতি, শনি আর ইউরেনাসের বুড়ি ছুঁয়ে, গ্রহগুলির অনেক হাঁড়ির খবর পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত নেপচুন এবং তার উপগ্রহগুলি সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাতে বিজ্ঞানীদের চক্ষু চড়কগাছ! ভয়েজার প্রেরিত অসংখ্য ছবি বিশ্লেষণ করে প্যাসাডেনার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির (জে পি এল) পর্যবেক্ষক এবং বিজ্ঞানীরা বিস্মিত। গ্রহটি সম্পর্কে এতদিন তাঁদের যা কিছু জানা ছিল তার প্রায় সবটাই ওলটপালট হয়ে গেল। ইউরেনাসের মতো নেপচুন শান্ত শিষ্ট প্রায়-মৃত কোনও গ্রহ নয়, বরং রীতিমত সক্রিয়। নেপচুনের রং উজ্জ্বল নীল, গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে মোট পাঁচটি বলয়, তার বুকে সবসময় চলেছে তীব্র গতির ঝোড়ো হাওয়া। এবং এর উপগ্রহের সংখ্যা মাত্র দু'টি নয়, ৮টি। ভয়েজার-২ আবিষ্কার করেছে নেপচুনের আরও ছ'টি উপগ্রহ।

সৌরমণ্ডলের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কৃত হয় আজ থেকে ১৪৪ বছর আগে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ২৮০ কোটি মাইলেরও বেশি। তাই আকারে পৃথিবীর প্রায় চারগুণ হলেও খালি চোখে গ্রহটিকে দেখা যায় না। সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের চলার অসঙ্গতি লক্ষ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এর জুড়ি একটি গ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করেন। ১৮৪০ সালে বিশিষ্ট প্রুসীয় জ্যোতির্বিদ ফ্রেডারিক হেলিওপজ বেসেল না-দেখা গ্রহটির অবস্থান নির্ণয়ের পরিকল্পনা করেন গাণিতিক পদ্ধতিতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ-কাজে তিনি হাত দেননি। পাঁচ বছর পর জন অ্যাডাম নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্পন্ন করেন সেই জটিল গণনা, সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে। নিশ্চিতভাবে তিনি প্রমাণ করেন

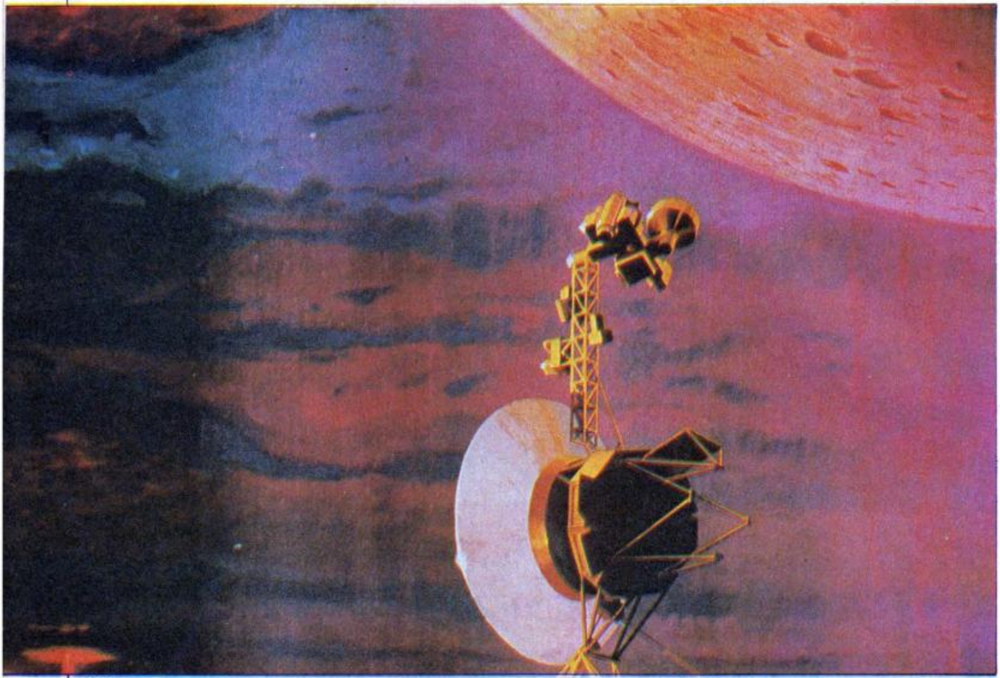

শিল্পীর কল্পনায় মহাকাশ-পাড়ি

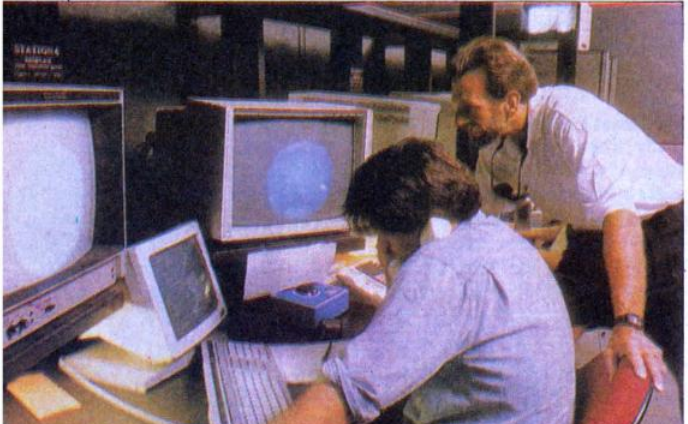

যে, ইউরেনাসের কক্ষপথ ছাড়িয়ে রয়েছে কোনও একটি জ্যোতিষ্ক, সম্ভবত নতুন কোনও গ্রহ, যার অভিকর্ষীয় টানেই কক্ষপথে ইউরেনাসের চলা কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়ে। এর পর চেষ্টা চলে নতুন জ্যোতিষ্কটিকে চাক্ষুষ করার। ইতিমধ্যে ফরাসি জ্যোতির্বিদ লেভেরিয়ের অদৃশ্য গ্রহটির কক্ষপথও নির্ণয় করে ফেলেন। এইসব গণনা তিনি পাঠিয়ে দেন বার্লিন মানমন্দিরের জি· গ্যাল-এর কাছে, গ্রহটিকে খুঁজে বের করার জন্য গ্যালকে তিনি অনুরোধ জানান। লেভেরিয়েরের চিঠি গ্যালের হাতে পৌঁছয় ১৮৪৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। সেই রাতেই লেভেরিয়ের নির্দেশিত অবস্থানে দূরবিন তাক করে গ্যালে সৌর পরিবারের অষ্টম সদস্যটিকে প্রথম দেখতে পান। রোমক সূর্যদেবতার নামে গ্রহটির নাম দেওয়া হয় 'নেপচুন'। নেপচুনকে প্রত্যক্ষ করার দু' বছর আগেই অবশ্য তার বৃহত্তম উপগ্রহ 'ট্রাইটন' আবিষ্কৃত হয়। তারও বহু বছর পর ১৯৪৯ সালে সন্ধান পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপগ্রহের, যার নাম 'নেরিদ'। এবং মাত্রই

ভয়েজার-২-এর সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ

গত অগস্টের শেষে নেপচুনের প্রায় গা ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া ভয়েজার পাঠিয়েছে আরও ছ'টি নতুন উপগ্রহের খবর। সেগুলি আকারে এতই ছোট (ব্যাস ৫০-৯০ মাইল) যে, মূল গ্রহে প্রতিফলিত সূর্যালোকের ছটায় ঢাকা পড়ে থাকে, দূরবিনে ধরা পড়ে না।

নেপচুনের যে বলয় আছে, বহুকাল আগেই দূরবিনে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ভয়েজার-২ সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। গ্রহসন্ধানী এই যানের ক্যামেরায় প্রথমে একটি, তারপর দু'টি এবং শেষপর্যন্ত মোট পাঁচটি বলয় ধরা পড়েছে। বলয়গুলি ছোট-বড় প্রস্তর ও জমে-যাওয়া মিথেন ইত্যাদি গ্যাসের বরফখণ্ড এবং ধূলিকণার পুঞ্জ, নেপচুনকে ঘিরে সদা আবর্তনশীল। সবচেয়ে বাইরের বলয়টি টুকরো-টুকরো বিচ্ছিন্ন বরফখণ্ডের সমাবেশ। ভিতরের দিকের একটি বলয় আবার সরু আংটির মতো, অবিচ্ছিন্ন এবং প্রায় আদ্যন্ত কঠিন।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা-সংস্থা নাসা-র অধীন জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের হাতে তৈরি মাত্র ১৮১৯ পাউন্ড ওজনের ভয়েজার-২ আশ্চর্য এক স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান। ছোট, অথচ অতি তুখোড় একটি কম্পিউটার একে চালনা করছে, পৃথিবী থেকে আসা নির্দেশমাফিক। যানটিকে বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাচ্ছে প্লুটোনিয়াম কোষ, যার মধ্যে পারমাণবিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। ১৯৭৭ সালের অগস্টে যানটি উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পরে-পরেই

নেপচুনের রহস্যময় উপগ্রহ ট্রাইটন। সম্ভবত একসময় গ্রহ ছিল

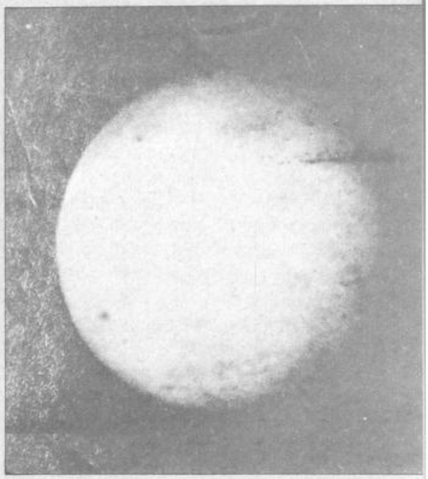

দূরতম কে

সৌরমণ্ডলে প্লুটোকেই দূরতম গ্রহ বলে আমরা জানি। ২৪৮ বছরের সূর্য পরিক্রমা-পথে বেশিরভাগ সময়েই প্লুটো অন্য আটটি গ্রহের তুলনায় পিতৃনক্ষত্র থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু কখনও কখনও নেপচুন হয়ে যায় দূরতম গ্রহ। প্লুটোর অতি উপবৃত্তাকার কক্ষপথই এর কারণ। এই কক্ষপথে প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে কাছে এলে দূরত্ব হয় ২৭৪ কোটি মাইল, আর দূরতম অবস্থানে এই ব্যবধান দাঁড়ায় ৪৫৭ কোটি মাইল। কিন্তু যখনই প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথ ভেদ করে চলে যায় তখন দূরতম ও নবম গ্রহ হওয়ার দাবিদার নেপচুন। নীল গ্রহ নেপচুনই রয়েছে সূ থেকে সবচেয়ে দূরে। ১৯৭ সালে ওই অবস্থানে পৌঁছেছে এবং ১৯৯৯ পর্যন্ত দূরতম গ্র হিসাবেই থেকে যাবে। তার প্লুটোর পালা। পরবর্তী ২২ বছর ধরে যথারীতি নবম এব দূরতম গ্রহ হবে প্লুটো।

সূর্য

আমরা যতটা জানি

এটি একটি মাঝবয়সী নক্ষত্র। কেন্দ্রের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ কোটি ৭০ লক্ষ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্ক ও সৌর ঝড়ের যে আবর্তন লক্ষ করা যায়, তা সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছতে চলেছে। এর ফলে পৃথিবীতে বেতার তরঙ্গের গোলমাল ধরা পড়তে পারে ও শীতকালে উত্তর আকাশে সৌরজ্যোতি দেখা দিতে পারে।

পরিসংখ্যান

ব্যাস ৮৬৫,০০০ মাইল
বয়স : ৪৫০ কোটি বছর
গ্রহ-উপগ্রহ ৯টি গ্রহ

বুধ

আমরা যতটা জানি

চাঁদের চেয়ে একটু বড়। উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে ঘণ্টায় ১১০,০০০ মাইল বেগে। এই গতিবেগ সূর্যের অভিকর্ষীয় টানকে আটকে রেখেছে। এর বুক জুড়ে অসংখ্য গহ্বর। কোনও আবহাওয়া নেই। দিনে ফোসকা-পড়া গরম, রাতে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা।

পরিসংখ্যান

ব্যাস : ৩,০৩১ মাইল
চাঁদ : একটিও নেই
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব : ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল
সূর্যপ্রদক্ষিণ : ৮৮ দিন

এর কম্পিউটার মস্তিষ্কে সামান্য গোলমাল দেখা দেয়। ভূ-কেন্দ্র থেকে বেতার সংকেত মারফত বিজ্ঞানীরা তা সারিয়ে ফেলেন।.এর পর বারো বছরের যাত্রাপথে একটা না একটা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেইছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দূরতম গ্রহের উদ্দেশে পাঠানো পৃথিবীর এই যান্ত্রিক দূত সম্পন্ন করেছে তার প্রতিটি দায়িত্ব। ১৯৭৯ সালে বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি, ১৯৮১-তে শনি এবং ১৯৮৬ সালে ইউরেনাস গ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে পাঠিয়ে দিয়েছে অসংখ্য ছবি, যেগুলি বিশ্লেষণ করে ওই তিনটি গ্রহ সম্পর্কে জানা .গেছে বহু অজ্ঞাত তথ্য। সবশেষে অন্তিম লক্ষ্যস্থল নেপচুনের উত্তর মেরুর মাত্র তিন হাজার মাইল ওপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে রওনা দিয়েছে সৌরমণ্ডলের সীমারেখার দিকে, যার নাম হেলিওপজ, যেখানে শেষ হয়ে গেছে সূর্যের যাবতীয় প্রভাব। ওই সীমান্ত ছাড়িয়ে ভয়েজার ক্রমশ আরও দূরে চলে যাবে, তারপর একসময় হারিয়ে যাবে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতায়। পৃথিবী থেকে আর কোনও হদিস মিলবে না তার।

বারো বছর ধরে মোট ৪৪৩ কোটি মাইল পথ পেরিয়ে নেপচুন সম্পর্কে এমন কী অজানা সব তথ্য পাঠিয়েছে ভয়েজার, যা দেখে বাঘা-বাঘা বিজ্ঞানীরাও প্রায় হতভম্ব? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হল, নেপচুন রীতিমত সক্রিয় এবং ঝোড়ো একটি গ্রহ। এর বায়ুমণ্ডল আছে, যার মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, তার সঙ্গে কিছু মিথেন এবং সামান্য ইথেন। গ্রহটির বুকে সবসময়ে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া, ঘণ্টায় চারশো মাইল বেগে। এই বাত্যাপ্রবাহে ঘনীভূত মিথেনের পুঞ্জমেঘ প্রবল বেগে উঠে আসছে উপরদিকে। নেপচুনে রয়েছে দ্বিস্তর মেঘ। অনেক উঁচুতে হালকা সাদা একরকমের মেঘপুঞ্জ। এবং তার প্রায় ৫০ কিলোমিটার নীচে অপেক্ষাকৃত ঘন মেঘের স্তর। এই স্তরও রয়েছে গ্রহপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার উঁচুতে। মজার ব্যাপার হল, উপরের মেঘের ছায়া এসে পড়ে নীচের মেঘস্তরে। পৃথিবী ছাড়া এই প্রথম ভিন্ন এক

আরও অনুসন্ধান

আগামী এক দশকের মধ্যে সৌরমণ্ডলের রহস্য সন্ধানে নতুন কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠাবে 'নাসা'। ইতিমধ্যেই 'ম্যাগেলান' নামে একটি যান শুক্রগ্রহের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। গত মে মাসে মহাকাশফেরি 'অ্যাটলান্টিস' থেকে যানটি উৎক্ষেপণ করা হয়। আগামী বছরের মাঝামাঝি ম্যাগেলান শুক্রের কাছে পৌঁছে যাবে এবং গ্রহটিকে পরিক্রমণ করতে থাকবে। তারপর আটমাস ধরে চিরকুয়াশার ঘোমটা-ঢাকা ওই গ্রহের ঘন কার্বন-ডাইঅক্সাইড মেঘের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত রেডার সংকেত পাঠিয়ে শুক্রপৃষ্ঠের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নেবে এবং সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে গ্রহটির কোথায় কী আছে তার বিস্তারিত মানচিত্র। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, শুক্রের বুকে যদি এখনও আগ্নেয় বিস্ফোরণ চলে, যদি এর বাইরের ত্বক পৃথিবীর মতোই চলমান কয়েকটি খণ্ডের সমষ্টি হয়, যদি কখনও তার বুকে থাকে সমুদ্রের বিপুল জলরাশি, তা হলে ওই মানচিত্র থেকে তার হদিস মিলবে।

আগামী অক্টোবরে ভয়েজারের চেয়েও উন্নত অনুসন্ধানী যান 'গ্যালিলেও' রওনা হবে বৃহস্পতির দিকে। মহাকাশফেরি 'ডিসকভারি' থেকে যানটি ছাড়া হবে। ছ' বছর পর সেটি পৌঁছবে বৃহস্পতির কক্ষে। বাইশ মাস ধরে গ্যালিলেও

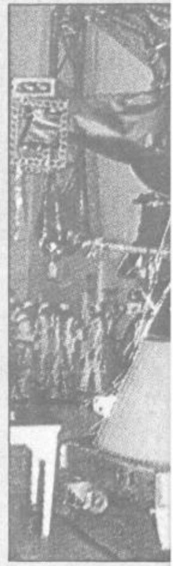

শুক্র

আমরা যতটা জানি

আকৃতি ও ভর পৃথিবীর মতোই। আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। আকাশে সালফিউরিক অ্যাসিডের মেঘ আর কার্বন ডাই অক্সাইডের আবরণ। পাথুরে সমতল পৃষ্ঠ। আগ্নেয় সক্রিয়তারও প্রমাণ মিলেছে।

পরিসংখ্যান

ব্যাস ৭৫২০ মাইল
চাঁদ নেই
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব : ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল
সূর্যপ্রদক্ষিণ ২২৫ দিন

পৃথিবী

আমরা যতটা জানি

সহনীয় তাপমাত্রা, বাতাসে অক্সিজেন ও মাটিতে প্রচুর জলের উপস্থিতির ফলে একমাত্র এখানেই জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ এত দূষিত হয়ে পড়ছে যে আমরা হয়তো ছায়াপথের সবচেয়ে আত্মহননকারী জীব হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছি।

পরিসংখ্যান

ব্যাস ৭৯৬২ মাইল
চাঁদ : একটি
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল
সূর্যপ্রদক্ষিণ : ৩৬৫ দিন

সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করতে-করতে এর আবহমণ্ডল বিশ্লেষণ করবে,

পর্যবেক্ষণ চালাবে গ্রহটির বলয়গুচ্ছ এবং উপগ্রহগুলি সম্পর্কে। শুধু তাই নয়, গ্যালিলেও থেকে ৭৩৭ পাউন্ড ওজনের একটি গবেষণা-যান নামিয়ে দেওয়া হবে বৃহস্পতির অতিঘন বায়ুমণ্ডলে। প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে সেটি গ্রহের বুকে আছড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু তথ্য পাঠাবে, তা থেকে গ্রহটির আবহ-উপাদানের বহু রহস্যই উন্মোচিত হবে।

গ্যালিলেওর পরবর্তী অনুসন্ধানী যান 'ইউলিসিস' ১৯৯০-এর অক্টোবরে পাঁচ বছরের এক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে। বৃহস্পতি গ্রহকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে একেবারে সূর্যের কাছে। সূর্যের উত্তর মেরুর চারপাশে চক্কর দিতে-দিতে আমাদের পিতৃনক্ষত্রের একেবারে উপরতলার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে এমন অনেক কিছু তথ্য পাঠাবে, যা এখনও পর্যন্ত অজানা।

১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর-এ 'মার্স অবজারভার' নামে একটি স্বয়ংক্রিয় যান পাড়ি দেবে মঙ্গলগ্রহে। ১৯৭৬-এর ভাইকিং যানের মতো মঙ্গলপৃষ্ঠে সেটি নামবে না। কিন্তু মঙ্গলের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে গ্রহটির ভৌগোলিক চরিত্র, অভিকর্ষীয় ক্ষেত্র এবং আবহমণ্ডলের আবর্তন সম্পর্কে সংগ্রহ করবে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

নব্বইয়ের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি অভিযানের নাম সি আর এ এফ এবং ক্যাসিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের যৌথ কর্মসূচি। প্রথমে Comet Rendezvous Asteriod Flyby, সংক্ষেপে CRAF নামে একটি অনুসন্ধানী যান ১৯৯৫ সালে রওনা হবে কফ (Kopff) নামে একটি ধূমকেতুর সঙ্গে মোলাকাত করতে। ২০০০ সালে কফ-এর অভিকর্ষীয় টানে ধরা পড়ে তিন বছর ধরে সেটি উড়ে চলবে তার পাশাপাশি। এবং ছোট একটি গবেষণা-যান ধূমকেতুর একেবারে অন্দরমহলে নিক্ষেপ করবে। কফ-এর রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করাই হবে এর কাজ। ক্যাসিনি নামে অনুরূপ একটি যান ১৯৯৬ সালে ছাড়া হবে শনি লক্ষ করে। শনির কক্ষে পৌঁছে গ্রহটিকে পরিক্রমণ করতে থাকবে এবং একটি যান্ত্রিক গবেষককে নামিয়ে দেবে শনির উপগ্রহ টাইটানের বুকে।

গ্রহে দেখা গেল মেঘের ছায়া।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, বৃহস্পতি গ্রহের 'গ্রেট রেড স্পট'-এর মতো স্থির ঘূর্ণিবাত্যার একটি অঞ্চল রয়েছে নেপচুনেও। গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধে এর সন্ধান পেয়েছে ভয়েজার, আয়তনে যেটি প্রায় পৃথিবীর সমান। ভয়েজারের ক্যামেরায় ডিম্বাকৃতির কালো স্পটের মতো ধরা পড়েছে এই সংক্ষুব্ধ অঞ্চল। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রেট ডার্ক স্পট'। নেপচুনের বুকে অবিরাম ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে কীসের শক্তিতে সেটা এখনও রহস্য। জে পি এল বিশেষজ্ঞদের অনুমান, নেপচুনের কেন্দ্র এখনও উত্তপ্ত। কঠিন এই কেন্দ্রাঞ্চলের ব্যাস প্রায় দশ হাজার মাইল। এই কেন্দ্রীয় তাপশক্তিই গ্রহের বুকে জাগিয়ে রেখেছে ঝড়। কেউ কেউ এমনও অনুমান করছেন, নেপচুনের কেন্দ্রে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের

মঙ্গল

পরিসংখ্যান

ব্যাস ৪২২২ মাইল
চাঁদ ২টি
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মাইল
সূর্য প্রদক্ষিণ ৬৮৭ দিন

আমরা যতটা জানি

ভাইকিং মহাকাশযান এখানে প্রাণের সন্ধান পায়নি। পাতলা আবহাওয়ার নীচে এর মাটি ও নুড়ি গোলাপি রঙের। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ও গিরিখাদ রয়েছে প্রচুর। বহুদিন আগে হয়তো এখানে জলধারা বয়ে যেত, আর আগ্নেয়গিরি ছিল সক্রিয়।

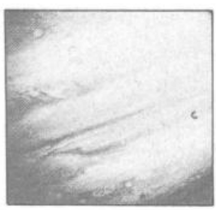

বৃহস্পতি

পরিসংখ্যান

ব্যাস ৮৮,৭৩০ মাইল
চাঁদ ১৬টি
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব: ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল
সূর্য প্রদক্ষিণ ১১·৯ বছর

আমরা যতটা জানি

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। দু'টি পাইওনিয়ার মহাকাশযান এর লাল অঞ্চলটির ছবি পাঠিয়েছে। ভয়েজার-১ ও ২ জানিয়েছে যে এটি একটি বিশাল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র। এই মহাকাশযান দুটি ধুলোর বলয়ও লক্ষ করেছে আর তিনটি নতুন চাঁদ ও 'আইয়ো' নামক চাঁদে আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছে।

প্রভাবে সম্ভবত মিথেন ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে কার্বন ও হাইড্রোজেন। এবং তারপর কার্বন কেলাসিত হয়ে বিশুদ্ধ হীরকে পরিণত হয়েছে। তাই যদি ঘটে থাকে তা হলে বলতে হবে নীল গ্রহ নেপচুনে তাপ সৃষ্টি করছে মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক এঞ্জিন। হিরের তৈরি এই এঞ্জিন বা কেন্দ্রীয় গর্ভে ক্রমাগত পদার্থ এসে পড়ছে, গলে যাচ্ছে, সৃষ্টি করছে নিরবচ্ছিন্ন তাপশক্তি।

নেপচুন কেন নীল? তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বায়ুমণ্ডলে মিথেনের আচ্ছাদন ভেদ করে আসা সূর্যের প্রতিফলিত আলো গ্রহটিকে রাঙিয়ে দিয়েছে মোহময় নীল রঙে।

ভয়েজার-২ প্রায় ২৮০ কোটি মাইল দূর থেকে যে সংকেত পাঠাচ্ছে, তা বড়ই ক্ষীণ। এর শক্তি এক ওয়াটের বহু সহস্র কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত ক্ষীণ বেতার সংকেত ধরার জন্য তাই ৩৮টি সুবিশাল রেডিও অ্যান্টেনা বসানো হয়েছে চারটি মহাদেশ জুড়ে। আর অতদূর থেকে আলোর বেগে পাঠানো সংকেতের পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগছে চার ঘণ্টারও কিছু বেশি। ভূ-কেন্দ্র থেকে ভয়েজারকে কোনও নির্দেশ পাঠাতেও লাগছে একই সময়। যানটি যত দূরে যাবে, সময়ের এই ব্যবধান ততই বেড়ে চলবে।

ভয়েজার-২ আর-একটি দারুণ কাণ্ড করেছে, যেটা ছিল প্রায় অপ্রত্যাশিত। নেপচুনের বৃহত্তম উপগ্রহ ট্রাইটন সম্পর্কে পাঠিয়েছে পিলে চমকে দেওয়ার মতো সব

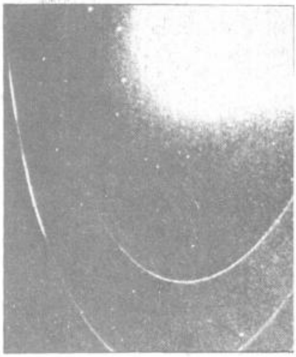

ভয়েজার-২ জানাল, নেপচুনেরও বলয় আছে

খবর। গত ২৫ অগস্ট নেপচুনের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করেই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাইটনের প্রায় ৩৮ হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে সে উড়ে যায়। এবং তার কয়েক ঘণ্টা পর থেকে জে পি এল কন্ট্রোল-রুমে যেসব ছবি আসতে থাকে সেগুলি দেখে পর্যবেক্ষকরা আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। দারুণ এক বিস্ময়ের জগৎ ট্রাইটন। সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে ভয়েজার প্রকল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্টোন বলেছেন, "আমরা অনেকেই মনিটরের পরদার সঙ্গে প্রায় আঠার মতো আটকে গিয়েছিলাম। এক-একটি করে ছবি আসছে, ফুটে উঠছে এক অজানা জগতের অদ্ভুত আশ্চর্য সব ভূখণ্ড।"

এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতত্ত্ববিদ ল্যারি সোডারব্লম মন্তব্য করেছেন, "ট্রাইটনে প্রত্যেকের জন্যই মিলবে কিছু না কিছু। জটিল ভূতাত্ত্বিক চরিত্র, মেরু অঞ্চলের মিথেন-নাইট্রোজেন-বরফ, বিচিত্র রাসায়নিক গঠন এবং আবহমণ্ডল।" বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ট্রাইটনের কেন্দ্রাঞ্চল সম্ভবত পাথরে গড়া। তার ওপরে জলের বরফের পুরু স্তর। এই স্তর আবার জমাট মিথেন ও নাইট্রোজেনের পাতলা আচ্ছাদনে ঢাকা। উপগ্রহপৃষ্ঠে আছে মিথেনের ঝুরঝুরে তুষার। আর আবহমণ্ডলে গ্যাসীয় মিথেন ও নাইট্রোজেন। ভয়েজার প্রেরিত ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে মনে করা হচ্ছে, ট্রাইটন সম্ভবত ছোট একটি গ্রহ। কোনও একসময় নেপচুনের অভিকর্ষীয় টানে ধরা পড়ে গিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথ ছেড়ে নেপচুনকেই প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। গোলাপি-নীল রঙের এই উপগ্রহটি আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট। চাঁদের তুলনায় এর ব্যাস চারশো মাইল কম। এরও নীল রঙের কারণ, মিথেন-বরফ কেলাসে বিচ্ছুরিত সূর্যালোক। ট্রাইটনে যে একসময় আগ্নেয় বিস্ফোরণ ঘটেছিল তারও নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে।

১৯৭৭ সালে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির পরস্পর বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে আসার সুযোগ নিয়ে ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এর ফলে ভয়েজার-২-এর নেপচুনে পৌঁছতে সময়

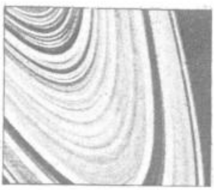

শনি

পরিসংখ্যান

ব্যাস : ৭৪,৫৬০ মাইল
চাঁদ : ২০ বা তার বেশি
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব : ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল
সূর্য প্রদক্ষিণ : সাড়ে উনত্রিশ বছর

আমরা যতটা জানি

ভয়েজার-১ জানিয়েছে, শনির বলয় আসলে কয়েক হাজার বলয়ের সমষ্টি। চওড়ায় মাত্র ১০০ ফুট। 'টাইটান' নামক চাঁদে রয়েছে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোকার্বনের আবহাওয়া যা প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রাণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

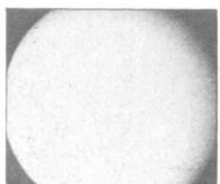

ইউরেনাস

পরিসংখ্যান

ব্যাস : ৩২,৫৬০ মাইল
চাঁদ ১৫টি.
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল
সূর্যপ্রদক্ষিণ : ৮৪ বছর

আমরা যতটা জানি

এখানে প্রচুর জলের উপস্থিতি। কিন্তু এর অক্ষটি অনুভূমিক। অর্থাৎ, এর ঘূর্ণনের ফলে মেরু দু'টি এক-একবার করে সূর্যের সামনে আসে। ভয়েজার-২ আবিষ্কার করেছে এর চারপাশে ন'টি ঘনসন্নিবেশিত বলয়। তা ছাড়া রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্র।

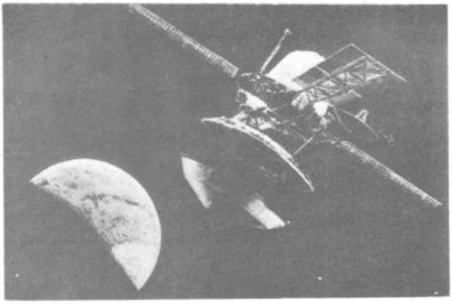

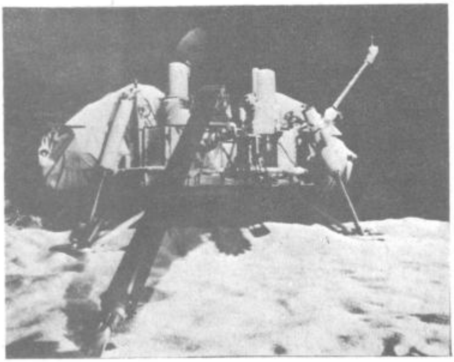

(বাঁ দিকে) রকেট : মহাশূন্যের রহস্য-সন্ধানে
(ডান দিকে উপরে ও নীচে) ভয়েজার-এর পূর্ববর্তী দু'টি গ্রহসন্ধানী মহাকাশযান

লাগল ১২ বছর। না হলে ৩২ বছর লেগে যেত। ভয়েজার-১ বৃহস্পতি এবং তারপর ১৯৮১ সালে শনিকে পাশ কাটিয়ে সৌরমণ্ডল ছেড়ে ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শূন্যের দিকে চলে যায়। তার আগে বৃহস্পতি ও শনি সম্পর্কে পাঠিয়ে দেয় প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ অজানা তথ্য।

ভয়েজার-২ এখন নেপচুন থেকে বহু কোটি মাইল দূরে। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে গভীর মহাশূন্য লক্ষ্য করে। ২০১৫ সাল নাগাদ সম্ভবত গ্রহসন্ধানী ওই যানের আর কোনও সাড়া মিলবে না। ততদিনে তার শক্তি উৎপাদক কোষগুলির দম ফুরিয়ে আসবে। কিন্তু ভয়েজার তবু ভেসে চলবে এবং পরিকল্পনা মতো সবকিছু ঠিকঠাক চললে ৪২,০০০ সাল নাগাদ যানটি রস-২৪৮ নামক নক্ষত্রের ১·৭ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তারপর ? কোথায় যাবে ভয়েজার ? বলা যায়, সেটা প্রায় কল্পকাহিনীর কথা। ২৯৬,০০০ সালে পৌঁছে যাবে সিরিয়াস নক্ষত্র থেকে ৪·৩ আলোকবর্ষ দূরে। আর ওই দুই নক্ষত্রের যদি এমন কোনও গ্রহ থাকে, যেখানে উন্নত বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে, তা হলে হয়তো তারা পৃথিবীর দূতটিকে ধরে ফেলবে এবং এর ভেতরে সঞ্চিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে জানতে পারবে, বহু আলোকবর্ষ দূরের পৃথিবী নামে এক প্রাণময় গ্রহের মানুষ নামক বাসিন্দাদের কথা। কিন্তু ততদিন কি মানুষ টিকে থাকবে এই গ্রহে ?

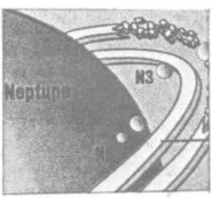

নেপচুন

ভয়েজার-২ নেপচুনের চারপাশে পাঁচটি বলয় আবিষ্কার করেছে। এর তিনটি এত পাতলা যে সপ্তাহে একবার চোখে পড়তে পারে। বাইরের বলয়টি বরফের টুকরো দিয়ে তৈরি। কিন্তু ভেতরেরটি প্রায় জমাট বাঁধা কঠিনাকৃতি। এর চাঁদ আটটি। তার মধ্যে রঙিন ট্রাইটন দেখতে খুব সুন্দর।

প্লুটো

পরিসংখ্যান

ব্যাস ১,৯০০ মাইল
চাঁদ ১টি
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব : ৩৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল
সূর্যপ্রদক্ষিণ : ২৪৮ বছর

আমরা যতটা জানি

সবচেয়ে ছোট গ্রহ। জমাট বাঁধা জল ও মিথেন দিয়ে তৈরি। সৌরজগতে সবচেয়ে বেশি উপবৃত্তাকার এর আবর্তন পথ। এর চাঁদ 'চারোন'-এর আকৃতি প্রায় অর্ধেক। তাই অনেক সময় মনে হয়, প্লুটো যেন যুগ্ম গ্রহ।

ফোটো : নিউজউইক-এর সৌজন্যে

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ক্যামেরা

Snapper

স্ন্যাপার আপনার পয়সার পুরোপুরি মূল্য উসুল করে। মডেলের বিরাট শ্রেণী—আর, এমন একেকটি অনন্য বৈশিষ্টাপূর্ণ হয় এ, যার দরুণ এক অতুলনীয় ক্যামেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যেই তো অন্য যে কোনো ক্যামেরার তুলনায়, স্ন্যাপার অনেক বেশী লোকেদের হাসিমুখের দেয়, পরিচয়।

Snapper ক্যামেরা

হাসিমুখের দেয় পরিচয়!

আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া কতৃক মার্কেট করা হয়েছে।

ULKA-11402 BEN

কলম্বাসের বারো হাজার বছর আগে

সুব্রত রায়

শিং-এর মতো দু'মুখো ঘোড়ার দার্শনিক ছবি। মেস-দ'-অজিল থেকে পাওয়া

প্রথম কবে মানুষ এল এ নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব। ইদানীং কিছু তথ্য আর নমুনা পাওয়া গেছে যা দেখে ধারণা করা সম্ভব আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে বুদ্ধিমান মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয় পৃথিবীর বুকে। তারা নিজেরা ভাবতে পারত। মাথা খাটিয়ে দল বেঁধে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল তাদের। ঠিক আজকের মানুষের মতো তারাও ছিল উন্নত। আগেকার বিরাটাকৃতি প্রায়-দানব গোষ্ঠীর থেকে আলাদা। প্রশ্ন হল, প্রথম যুগের সেই বুদ্ধিমান মানুষদের আদি নিবাস ছিল কোথায়? অতযুগ আগের পৃথিবীর চেহারা অবশ্য আজকের মতো ছিল না। বরফযুগের হিমবাহরা তখন বিপুলাকার। মেরুপ্রান্তে প্রায় দশ হাজার ফুট পুরু বরফের চাদর ছড়ানো ছিল এখনকার লন্ডন অবধি। ফলে সমুদ্রের জল তখন বেশ কয়েকশো ফুট নীচে।

তখন সমুদ্রের জল কম থাকায় বিরাট এক সেতু জেগেছিল। এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সেটাই ছিল সরাসরি পথ। তা ছাড়া উত্তর আমেরিকার আলাস্কার সঙ্গে ইউরেশীয় সাইবেরিয়ার যোগ ছিল বেরিংজিয়া নামে এক ভূখণ্ডের মাধ্যমে। প্রাচীন সেই প্যালিওলিথিক যুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাদের নিদর্শন রেখে গেছে বহু জায়গায়। পুরনো চুনাপাথরের গুহায় লুকিয়ে আছে অনেক অজানা শিল্পকর্ম। যা দেখে আজকের চাঁদে-যাওয়া মানুষকেও তাজ্জব বনে যেতে হয়।

চেকোস্লোভাকিয়ার ডোল্‌নে ভেস্টোনিস গ্রামে বরফ যুগের কিছু শিল্পকর্ম পাওয়া গেছে। মাত্র আট সেন্টিমিটার লম্বা ম্যামথের দাঁতের উপর খোদাই করা মানুষের আবক্ষ মূর্তি। কার্বন আইসোটোপ দিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে ওই মূর্তি ছাব্বিশ হাজার বছরের পুরনো। এমন নিখুঁত চোখ, গোল নাক, খাড়াই দাড়ির ঢেউ আর চুলের বাঁধন তৈরি করতে রীতিমত দক্ষ কারিগর দরকার। এমনকী, নিশ্বাসের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো অবধি চমৎকার। রাশিয়ার ডন নদীর ধারে কোটেনস্কি। সেখানে তেইশ হাজার বছরের আদিম বাসস্থান আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদরা। শীতের জন্য সে-সময় শিকারিরা ম্যামথের বিশাল হাড়ের কাঠামো দিয়ে ঘর বানাত। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুর সমুদ্র উপকূলে এক ভগ্নস্তূপের মধ্যে মোসে প্রজাতির মানুষের অসামান্য কিছু হাতের কাজ ছড়িয়ে রয়েছে। এখনকার আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েই কেবল তার সমকক্ষ হওয়া যায়।

এ-প্রসঙ্গে ফ্রান্সের কথাও এসে পড়ে। সেখানে ল্যাসকক্সের গুহায় কিছু ছবি আছে। ১৯৬৩ সালে গুহাটি জনসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তার আগে অবধি গুহাচিত্রগুলি দেখার জন্য অগুনতি মানুষ সেখানে যেতেন। ব্রোঞ্জের বিশাল দরজা পেরিয়ে প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে 'হল অব বুলস'। সতেরো মিটার লম্বা, সাত মিটার চওড়া ছ' মিটার উঁচু। দেওয়ালে আলোর ঝলক লাগলেই ফুটে ওঠে প্রাচীনকালের রঙিন জন্তু-জানোয়ার। বড় ষাঁড়, কালো ঘোড়া, লাল হরিণ। বড়-ছোট মিলিয়ে এই গুহায় আছে প্রায় ছ'শো দেওয়ালচিত্র। পনেরশো খোদাই কাজ আর অসংখ্য অজানা চিহ্ন বা জ্যামিতিক টান। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, এই ছবি সতেরো হাজার বছর আগেকার শিল্পীদের। অতদিন আগে মানুষ কীরকম উন্নত ছিল সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটা ঘটনা বলি।

১৯৪০ সাল। সেপ্টেম্বর ১২। চারজন কিশোর চলেছে পাহাড়ের উপর জঙ্গল অভিযানে। দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় মারসেল রভিড্যাট। বয়স সতেরো। আগের রবিবার বনের মধ্যে বিশেষ একটি মরা গাছের শিকড়ের ফাঁকে একটা গর্ত দেখে এসেছে সে। সেখানেই অভিযান। ফুট কয়েক দড়ি, ছুরি আর হাতে তৈরি তেলের কুপি। এই

নিয়ে তারা একের পর এক মাটি সরিয়ে ঢুকে পড়ল গর্তে। ওইখানেই নাকি স্বর্গের পুরনো বাগান। কুপি জ্বালতে অবাক হয়ে গেল সবাই। দেওয়াল জুড়ে দারুণ-দারুণ রঙিন ছবি! কোথাও লাল রং কোথাও বা কালো। সবার আগে চোখে পড়ল বিরাট বড় ষাঁড়ের একটি ছবি।

পরের দিন আবার গেল তারা। বড়সড় ঘরের ডান পাশে আবিষ্কার করল সম্পূর্ণ একটা আর্ট গ্যালারি! উৎসাহ আর উত্তেজনায় খবর দিল স্কুলের শিক্ষক মঁসিয়ে লাভালকে। ছ' দিন বাদে গর্তের মুখ পরিষ্কার করা হলে তিনি এলেন। গুহায় নামতে গিয়ে পাথর আর শিকড়ে ঘষা লেগে কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তবু ছবিগুলো দেখে তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। সারা গুহা প্রায় পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পুরাতত্ত্বের 'পোপ' অ্যাবে হেনরি ব্রেউইলকে সমস্ত ঘটনা জানালেন মঁসিয়ে লাভাল। ক্রমশ ভিড় জমতে লাগল। দর্শকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসতে শুরু করলেন পুরাতত্ত্ববিদরা। মন্টিন্যাক গ্রামের মোড়ে তীর-চিহ্ন দিয়ে লেখা হল 'গ্রোটে ডি ল্যাসকক্স—টু কিলোমিটার্স'।

বাস্তিলের দুর্গ দখলের ঐতিহাসিক দিন ১৪ জুলাই। ফ্রান্সে ওই দিনটিকে 'বাস্তিল ডে' হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৪৮ সালের এই স্মরণীয় দিনে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল ল্যাসকক্সের গুহা। ইতিমধ্যে শাবল-গাঁইতির খোঁচাখুঁচিতে অনেক মূল্যবান ছবি ভেঙে গেছে। তখন দিনে প্রায় ছ'শো লোকের ভিড়। সেই নিশ্বাসে জমে-ওঠা কার্বনডাই-অক্সাইডে দর্শকদের মাথা ধরতে শুরু করল। শেষ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, দেশলাই জ্বালানো যায় না। একই সঙ্গে আর-এক সমস্যা। বাইরের মানুষ তাঁদের শরীরের তাপ নিয়ে এসে দাঁড়াবেন ছবিগুলোর পাশে। গুহার দেওয়াল ছিল ঠাণ্ডা। তাপমাত্রার ওঠানামা হত বারবার। ফলে মুরালের চমৎকার ছবিগুলোতে ফাটল ধরল। খসে পড়ল দারুণ কিছু রঙের টুকরো।

১৯৫৮ সালে বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে বাতাস চালানোর ব্যবস্থা হল। খরচ প্রচুর। হাওয়া টেনে তাকে ফিল্টার করে ঠাণ্ডা করা হল। গুহার ভেতরের অংশ যেন শুকিয়ে না যায় সেজন্য নির্দিষ্ট জলীয় বাষ্প মেশানো হল বাতাসে। কিন্তু ফল হল না কিছু। বছর-চারেকের মধ্যে ভিড় বেড়ে গেল আরও। দৈনিক পনেরোশো। এত মানুষের নিশ্বাসের বিষক্রিয়া কম নয়। ক্রমশ

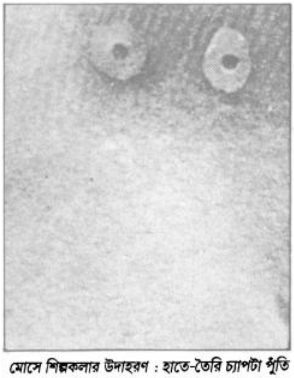

মোসে শিল্পকলার উদাহরণ : হাতে-তৈরি চ্যাপটা পুঁতি

গাইডদের নজরে এল, দেওয়ালে সবুজ-সবুজ ছোপ। অনুসন্ধানে দেখা গেল, সারা গুহায় ভরে গেছে শ্যাওলা ছত্রাক আর ব্যাকটিরিয়া। বাধ্য হয়েই ১৯৬৩ সালে গুহা বন্ধ করা হল। চিকিৎসা চলল অনেকদিন। অ্যান্টিবায়োটিক আর ফরম্যালডিহাইড ছড়িয়েও সব-কিছু সংরক্ষণ করা গেল না। গুহার ভেতর আলোর তীব্রতা কমানো হল! সবসময় আলো জ্বালিয়ে রাখাও নিষেধ। ভেতরে ঢুকতে হলে জুতোকে জীবাণুনাশকে ধুয়ে নিতে হবে। শেষ অবধি দীর্ঘ দু' বছরের চেষ্টায় জীবাণুমুক্ত হল গুহা। কিন্তু গুহার দরজা সকলের জন্য আর খোলা হল না।

ইদানীং ফ্রান্সের বিস্তর জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। পাহাড়ে পাথরের খাঁজে-খাঁজে সেখানে লুকিয়ে রয়েছে বিস্ময়। পিরানিজ পর্বতমালার এন্‌লেনে এমন একটি গুহা। সারা ঘর জুড়ে ছড়ানো হাড় আর ছুঁচলো যন্ত্রপাতি। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে সেই গুহায় আগুন জ্বালানো হত অদ্ভুতভাবে। ফায়ার প্লেস ছিল। সেখানে কাঠের সাহায্যে ধরানো হত আগুন। তারপর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত হাড়। ঘোড়ার দাঁতের তৈরি খুরপি, ম্যামথের হাড়ের কোদাল এইসব বিস্ময়কর জিনিস পাওয়া গেছে সেই গুহায়।

প্রথম মানুষ এল কীভাবে, তার উৎস খুঁজতে-খুঁজতে পুরাতত্ত্ববিদরা পৌঁছে গেছেন আফ্রিকায়। দু' পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষ গোষ্ঠীকে বলে হোমো ইরেকটাস। আজ থেকে ষোলো লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার কেনিয়ায় জঙ্গলে ঘেরা তুরকানা হ্রদের ধারে প্রথম ইরেকটাস মানুষের হদিস পাওয়া যায়। তা ছাড়া বেরিঙ্গো হ্রদের কাছাকাছি অঞ্চলে মাটির নীচে আছে কিছু হোমিনিড জাতীয় পূর্বসূরিদের ফসিল কঙ্কাল। কার্বন আইসোটোপ পরীক্ষায় সেই কঙ্কালের বয়স পঞ্চাশ লক্ষ বছর! তবে এই প্রায়-মানুষেরা এখনকার হোমোসেপিয়ান মানুষদের থেকে অনেক আলাদা। তাদের হাড় ছিল ভীষণ চওড়া আর ভারী। প্রায় দানবাকৃতি। তাদের তুলনায় এখনকার মানুষ অনেক বেশি উন্নত ও বুদ্ধিমান।

আফ্রিকায় মানুষের প্রথম উদ্ভব হল কেন? কারণ তখনকার প্রাকৃতিক পরিবেশে সবুজ বনজঙ্গল আর ফলমূলে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল একমাত্র আফ্রিকা। ধীরে-ধীরে জনসংখ্যা বাড়ে। বাসস্থান আর খাবারের সন্ধানে সেই যুগের মানুষ ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন দিকে। ইজরায়েল দশ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকটাস প্রথম পৌঁছয়। ভারতের নর্মদা নদীর তীরে সম্ভবত তাদের পা পড়ে আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। চিনের এক অংশে সাড়ে চার লক্ষ বছরের ফসিল ইরেকটাস খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই নিয়ানডারথাল শ্রেণীর প্রাচীন মানুষদের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের মুখ। চোয়ালের হাড় বিশেষ লম্বা হওয়ার জন্য কিছুটা ছুঁচলো। আর বড় সামনের দাঁত। এই দাঁতে তৃতীয় হাতের কাজ করত। তাদের যন্ত্রপাতিগুলো ছিল অদ্ভুত ভোঁতা। ফলে ব্যবহার করতে প্রচুর গায়ের জোর লাগত। সেই যুগের আঙুলের হাড়ের আকৃতি দেখেই এ-বিষয়ে অনুমান করা যায়। হাতের আঙুলে হাড়ের মাথাগুলো ছিল মোটা ফুলোমতন। যন্ত্রে কোনও হাতল লাগানো থাকত না। সামান্য কাজেই তাই হাতে আঙুলের ডগায় প্রচুর চাপ পড়ত। তখন পায়ের আঙুলের হাড় ছিল চ্যাপটা। এখনকার ঠিক উলটো। অর্থাৎ মাংসল আঙুলগুলো ছিল ছড়ানো। উঁচু-নিচু অসমান পথে চলাফেরা বা কোনও কিছু বেয়ে ওঠা। এ-সমস্ত অভ্যাসে আঙুলের হাড়ে সরাসরি চাপের বদলে পাশের দিকে চাপ পড়ে বেশি। তাই ওই অবস্থা। সে যুগের মানুষ এখনকার মানুষের মতো ধীরেসুস্থে চলার বদলে লাফিয়ে গাছ বেয়ে অথবা দৌড়ে চলত। হাড়েই তার প্রমাণ।

এক লক্ষ বছর আগে অবধি এমন ছিল। তারপর এক পরিবর্তন। হোমোইরেকটাস থেকে পৃথিবীতে এল হোমোসেপিয়ান। এখনকার বুদ্ধিমান মানুষ। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে-সঙ্গে উন্নতি ঘটল কলাকৌশলের। বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ ঘটল। তার প্রথম লক্ষণ কোদাল-ছুরি-খুরপি সব-কিছুর গায়ে বসানো হল হাতল। ফলে শক্তিক্ষয় কম। যান্ত্রিক সুবিধা গেল বেড়ে।

সতেরো হাজার বছর আগে ল্যাসকক্সের গুহায় মানুষের আঁকা শিল্পকর্ম

পাখির হাড়ের তৈরি বাঁশি । পঁচিশ হাজার বছরের পুরনো

তখনকার মানুষ কি সঙ্গীতচর্চা করত ? সম্ভবত, হ্যাঁ । পঁচিশ হাজার বছরের পুরনো পাখির ফাঁপা হাড়ের তৈরি বাঁশি পাওয়া গেছে । নিশ্চয়ই তা থেকে সুন্দর সুর বেরোত । ফ্রান্সের লি কন্তির খাড়াই পাহাড়ে প্রায় একই সময়ের হাতির দাঁতের শৌখিন বোতাম আবিষ্কার করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা ।

স্পেনের উত্তর দিকে মেস-দ'-অজিল । সেখানে শিঙের মতো দু' মুখঅলা দারুণ একটা জিনিস মাটির নীচে ছিল । দু' মুখে দুটো ঘোড়ার মুখ । সম্ভবত পুরুষ ঘোড়া আর স্ত্রী-ঘোড়া । একটা মরা । তার চোখ বন্ধ । মাথার খুলিতে চামড়া নেই । অন্যটা জীবন্ত । তাই আসল ঘোড়ার মতো । এমন নিখুঁত শিল্পকলা ষোলো হাজার বছর আগেকার মানুষের হাতের কাজ ! জীবন আর মৃত্যুর দার্শনিক ভাবনাকেই বোধ হয় ভাস্কর্যের রূপ দেওয়া হয়েছে ।

জীবজগতের সৃষ্টির পর পৃথিবীর সময়ের চাকা বরফযুগে পৌঁছেছে । আবার ফিরে এসেছে আজকের মতো উষ্ণ পরিবেশে । শেষ আঠারো হাজার বছর আগে এমন অবস্থা ঘটেছিল । তখন আল্পস, পিরেনিজ, এমনকী আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বত থেকেও নেমে এসেছিল হিমবাহ । সবুজ বন ক্রমশ কমতে কমতে ঊষর ভূমির সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবী জুড়ে । মহাদেশীয় বরফের আস্তরণে এতই জল জমেছিল যে, আজকের ইংলিশ চ্যানেল ছিল একেবারে খটখটে শুকনো । অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডের মধ্যেই ছিল তাসমানিয়া আর নিউগিনি । অমন যে জলে ভেসে থাকা বন্দর নগরী ভেনিস সে-সময় তার থেকেও সমুদ্র ছিল দুশো মাইল দূরে ।

তবে তখন মানুষ প্রকৃতিকে বুঝত । আজ আমরা কম্পিউটার আর মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে যে দক্ষতা অর্জনের গর্ব করছি সে-যুগের মানুষ প্রকৃতিকে ঠিক সেই দক্ষতা নিয়েই বুঝতে পারত । তাই প্রকৃতির খেয়াল খুশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধীরে-ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে নিজেদের বিস্তার করতে পেরেছিল ।

তেরো হাজার বছর আগে যখন উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ইউরেশিয়া মহাদেশের মানুষ পথ খুঁজতে শুরু করে । বাইরের বড় জগৎটাকে জানার জন্য । খাবার জল, বাসস্থানের তাগিদে । তখন সাইবেরিয়া আর আলাস্কার মধ্যে জল নেই । আছে হাজার মাইল চওড়া বেরিংজিয়া ভূখণ্ড । সেই পথে কলম্বাসের জন্মের বারো হাজার বছর আগে উন্নত শ্রেণীর হোমোসেপিয়ান মানুষ উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে ।

তারপর পৃথিবীতে তুষার যুগ শেষ হয় । বেরিংজিয়ার বরফ ভূখণ্ড গলে তৈরি হয় কার বেরিং সাগর । কিছু মানুষ বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমেরিকায় বাস করতে থাকে । বারো হাজার বছর পরে ভারত খুঁজতে বেরিয়ে কলম্বাস আবিষ্কার করেন মাথায় পালক-গোঁজা কিছু মানুষ । এখন তারা রেড ইণ্ডিয়ান । আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক তারাই ।

সম্প্রতি ওয়াশিংটন প্রদেশের ইস্ট ওয়েনাটসিতে এক আপেলের বাগানে প্রাচীন যুগের অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছেন জনৈক পুরাতাত্ত্বিক । পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেই সংগ্রহের বয়স বারো হাজার বছর । আমেরিকায় সেটিই প্রাচীনতম বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ । আর পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকায় পনেরোশো বছরের পুরনো মোসে শিল্পকলা । সূক্ষ্মতার বিচারে যা অসামান্য ।

এগারো হাজার বছর আগেকার অস্ত্রশস্ত্র, হারপুন ইত্যাদি । লি কন্তির খাড়াই পাহাড়ের গায়ে পাওয়া গেছে

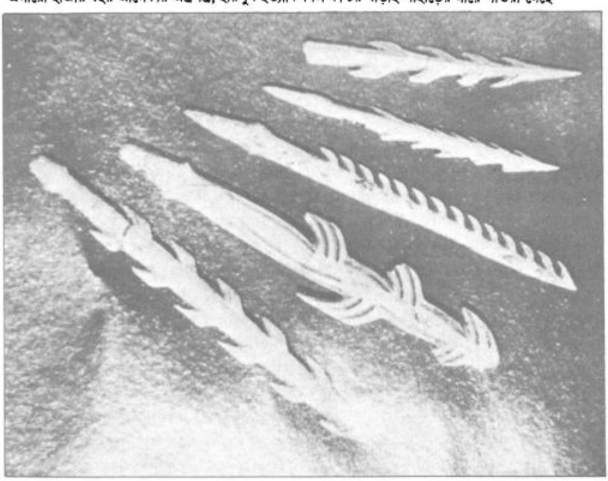

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামের মানুষরা চাষবাসের কাজ জানে না। জন্তু-জানোয়ার শিকার করাই এদের জীবিকা। এরা বনে-পাহাড়ে ঘুরে-ঘুরে হরিণ-মোষ-শুয়োর-খরগোশ আর নানারকম পাখি শিকার করে। সেইসব মাংস নিজেদের খাওয়ার জন্য কিছুটা রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিয়ে আসে বাজারে। মাংস বিক্রি করে যা টাকা পায়, তা দিয়ে চাল-ডাল-তেল কেনে। এদের নুন কিনতে হয় না। জঙ্গলের মধ্যেই একটা জায়গায় নুন-পাথর আছে, এরা সেই পাথর এনে গুঁড়ো করে নেয়। জন্তু-জানোয়াররাও সেই নুন-পাথর চাটতে আসে।

এই জঙ্গলে চম্পকের সৈন্যবাহিনীর তাঁবু পড়ায় ওই আদিবাসী গ্রামটির বেশ অসুবিধে হয়েছে। এত লোকজন, ঘোড়া আর রথের আনাগোনায় এই জঙ্গলের সব প্রাণী ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে অন্য বনে। গ্রামের লোকদের শিকার জুটছে না। তাদের না খেয়ে থাকার মতন অবস্থা।

দিনের বেলায় শিকার করা খুব মুশকিল, তাই রাত্তিরবেলা সেই গ্রামবাসীরা দল বেঁধে দূর-দূর বনে যায় শিকারের খোঁজে, আবার সকাল হওয়ার আগেই ফিরে আসে। সৈন্য-সামন্তদের সামনেও তারা পড়তে চায় না, কারণ তাদের হাতে শিকার করা জন্তু-জানোয়ার দেখলে সৈন্যরা কেড়ে নেয়।

তিনজন ওই গ্রামের আদিবাসী একটি হরিণ শিকার করে ফিরছে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে। হরিণটি বেশ বড়, দু'জনে মিলে কাঁধে করে বয়ে আনছে সেটাকে, আর-একজন চলেছে সামনে সামনে।

সামনের লোকটির নাম হিংকা। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা ঝোপের আড়ালে শুকনো পাতায় কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে! সৈন্য-সামন্তরা এত ভোরেই জেগে উঠেছে না কি?

সাবধানে উঁকিঝুঁকি মেরেও সে কাউকে দেখতে পেল না। অন্য লোক দু'জন জিজ্ঞেস করল, "কী রে, হিংকা, কী হল?"

হিংকা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "চুপ!"

আর একটুক্ষণ কান খাড়া করে থেকেও সে কোনও শব্দ শুনতে পেল না। তখন সে ভাবল, "তা হলে নিশ্চয়ই মনের ভুল। সৈন্যরা এলে আর চুপিচুপি হাঁটবে কেন, তারা লুকিয়েও থাকবে না। গ্রামের লোক দেখলে তারা হইহই করে তেড়ে এসে শিকার কেড়ে নেয়।"

আবার চলতে শুরু করল গ্রামবাসীরা।

খানিক বাদে আবার সেই শব্দ। কেউ যেন খুব সাবধানে, আস্তে-আস্তে পা ফেলছে। এবার হিংকার সঙ্গে অন্য দু'জন লোকও শুনতে পেয়েছে সেই শব্দ।

তিনজনেই নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই। একজন কেউ লুকিয়ে-লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করছে। তারা থেমে যাবার একটু পরেই থেমে যাচ্ছে সেই পায়ের শব্দ। জন্তু-জানোয়ার নয়, মানুষেরই পায়ের আওয়াজ। নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তচর। যে-মতলবই থাক, গুপ্তচরকে ফিরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

হরিণটাকে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে রেখে তিনজনে তীর-ধনুক বাগিয়ে এগিয়ে গেল তিন দিকে।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এখানেও আবছা-আবছা ভাব। বড়-বড় গাছগুলোর ডগার ওপর সোনালি আলো পড়েছে। কিন্তু তলার দিকে অন্ধকার। রাত এখনও কাটেনি ভেবে এখনও ডেকে চলেছে কয়েকটা ঝিঁঝি পোকা।

হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন চমকে উঠল। সে দেখতে পেয়েছে, একটু দূরে একটা গাছের ডালে এক ঝলক রং। গোলাপি আর নীল রঙের একটা কাপড়।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে সে একটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কোনওরকমে মুখ বাড়িয়ে দেখল, একটা গাছের ডালে আটকে গেছে একটি রঙিন রেশমি ওড়না, আর একজন খুব সুন্দর চেহারার মহিলা সেটি টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছেন। মহিলার মাথার চুল সমস্ত খোলা, তাঁর গায়ের রং গলানো সোনার মতন। এখানকার জঙ্গলে-পাহাড়ে এরকম কোনও মহিলাকে আগে কোনওদিন দেখা যায়নি।

লোকটি বড়-বড় চোখ মেলে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। সকালবেলা একা-একা এই নিবিড় অরণ্যে এক সুন্দরী মহিলা!

লোকটি কোনও সাড়াশব্দ করেনি, তবু তার নিশ্বাসের শব্দও যেন শুনে ফেললেন সেই মহিলা। ঝট করে মুখ ফিরিয়েই তিনি দেখতে পেলেন লোকটিকে। তার হাতে তীর-ধনুক।

মহিলাটি আদেশের সুরে বললেন, "আমি এ রাজ্যের রানি, তলতা-দেবী। আমার দিকে অস্ত্র তুলছ কেন? নামাও। হাত নামাও!"

লোকটি সেই আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারল না। তীর-ধনুক ফেলে দিল মাটিতে। কিন্তু সে খুব ভয়ও পেয়ে গেল।

সে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, "ভূত! ভূত! ওরে হিংকা, ওরে মংরু, শিগগির এদিকে আয়! মরে গেলাম! ভূত!"

লোকটি অমন সুন্দর একজন মহিলাকে দেখেও ভূত ভাবল কেন কে জানে! এরা যখনই খুব ভয় পায়, তখনই ভূতের কথা ভাবে!

হিংকা আর মংরু নামে অন্য দু'জন লোক হুড়মুড় করে ছুটে এল এদিকে। মহারানি তলতাদেবীকে দেখে একটু দূরে তারা থমকে গেল। কোনও অপদেবতা মনে করে তারাও ধরল তীর উঁচিয়ে।

চম্পকের শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে এসে মহারানি তলতা-দেবী বিপদে পড়ে গেছেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর রাজধানীতে ফিরে যাওয়া দরকার, কিন্তু তিনি জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

এই লোক তিনটিকে হরিণ শিকার করে নিয়ে যেতে তিনি আগেই দেখেছেন। তিনি একবার ভেবেছিলেন, ওদের কাছ থেকে শহরে যাওয়ার পথটা জেনে নেবেন। তার পরেই তাঁর মনে হয়েছিল, এই লোকগুলো যদি চ্যাঁচামেচি করে চম্পকের সৈন্যদের জানিয়ে দেয়!

এখন এরা তাঁর দিকে তীর তুলেছে দেখে সেই সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। এখন তিনি আবার কিছুতেই চম্পকের হাতে ধরা দেবেন না।

তিনি হাতের তলোয়ারটা তুলে ধীর, গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি এই দেশের মহারানি। তোমরা আমার প্রজা। আমার দিকে তোমরা অস্ত্র তুলো না। বরং আমাকে যদি তোমরা সাহায্য করো, তা হলে তোমাদের আমি অনেক পুরস্কার দেব!"

হিংকা হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "মহারানি! এঃ! বললেই হল! মহারানি একা-একা জঙ্গলে ঘুরবেন? তাঁর সঙ্গে কত লোক-লশকর, দাস-দাসি, ঘোড়া-উট থাকে!"

মংরু বলল, "আমরা কোনওদিন মহারাজাকেও দেখিনি, মহারানিকেও দেখিনি। আমরা এই জঙ্গলের বাইরে কোথাও যাই না। রাজা-রানিরাও কোনওদিন এদিকে আসেন না!"

তলতাদেবী বললেন, "আমি পথ হারিয়ে চলে এসেছি। তোমাদের সাহায্য চাই!"

হিংকা বলল, "আপনি আমাদের দিকে তলোয়ার উঁচিয়েছেন যে বড়! তীর-ধনুকের সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে পারবেন?"

মংরু বলল, "ওরে হিংকা, তলোয়ারের হলদে রঙের বাঁটটা অত চকচক করছে কেন? সোনার তৈরি নাকি রে?"

দু' দিক থেকে দু'জন ধনুকের ছিলা টান করে রেখেছে। তলতা-দেবী বুঝলেন, এদের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে।

তিনি তলোয়ারটা নামিয়ে রেখে বললেন, "না, আমি প্রজাদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। তোমরা বিশ্বাস করছ না যে, আমি এ-দেশের মহারানি? ঠিক আছে, তোমরা আমাকে রাজধানীতে নিয়ে চলো। সেখানে গেলেই তোমাদের সন্দেহ মিটে যাবে। ভয় নেই। রাজধানীতে গেলে তোমাদের কেউ ক্ষতি করবে না। মহারাজ খুশি হয়ে তোমাদের অনেক পুরস্কার দেবেন!"

হিংকা বলল, "যাঃ বাবা! রাজধানীটা আবার কোথায়? আমরা কি কখনও সেখানে গেছি নাকি? আমরা সৈন্য-সামন্তদের ভয়ে সব

এটি নিরাপদ!
এটি দীর্ঘস্থায়ী!
এটি ভীলাইন!

<u>নিরাপত্তা</u> ঃ ভীলাইন স্টোরেজ ওয়াটার হীটারে তিনটি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আছে। একটি থার্মোস্টাটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল – তাপমাত্রার অতিরিক্ত বৃদ্ধি নিবারণ করে। একটি ফিউজিব্‌ল্‌ প্লাগ– যা গলে গিয়ে অতিরিক্ত প্রেশার নিবারণ করে। এবং একটি প্রেশার রিলীজ ভাল্‌ভ।

<u>দীর্ঘস্হায়ীত্ব</u> ঃ বিশিষ্ট ইস্পাতের তৈরী ভেতরের পাত্রটি সুরক্ষাকারী ভিট্রিয়াস এনামেলে ঢাকা, যার মরচে নিবারণের ক্ষমতা অতুলনীয়। ইউ.এস.এ.-তে তৈরী স্টোরেজ ওয়াটার হীটারেও এই একই প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে।

ভীলাইন স্টোরেজ ওয়াটার হীটার ভোল্টাসের নিবেদন ...... নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, দীর্ঘস্হায়ী ... বছরের পর বছর!

ভীলাইন
স্টোরেজ ওয়াটার হীটার

CLARION/B/V/128/244 BEN

বিক্রয় ব্যবস্হাপনায় ঃ
ভোল্টাস লিমিটেড
অ্যাপ্লায়েন্সেস বিজনেস গ্রুপ
১৯, জে. এন. হেরেডিয়া মার্গ
ব্যালার্ড এস্টেট
বম্বে ৪০০ ০৩৮।

ভোল্টাস
ভীলাইন
ঘরকন্নার উপযোগী নির্ভরযোগ্য উপকরণ

সময় লুকিয়ে থাকি। আমরা রাজধানীর কিছু জানি না!"

তলতাদেবী ভুরু কুঁচকে দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "তোমরা সৈন্যদের দেখলে ভয় পাও? কেন? তোমরা বুঝি সৈন্য নও!"

মংরু বলল, "আমরা সৈন্য হতে যাব কেন? আমরা এই জঙ্গলের মধ্যে গ্রামে থাকি। শিকার করে খাই। সৈন্যরা আমাদের জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। আমাদের দিয়ে জোর করে অনেক কাজ করায়, তার বদলে কিছু দেয় না!"

তলতাদেবী এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। এরা তা হলে চম্পকের বিদ্রোহী সৈন্য নয়। নিরীহ গ্রামবাসী!

তিনি এবার বললেন, "তোমরা এই রাজ্যের বিশ্বাসী প্রজা! তোমরা রাজধানী চেনো না। তা হলে তোমরা আমাকে এই জঙ্গলের বাইরে কোনও রাস্তায় পৌঁছে দিতে পারবে? তা হলেই হবে। আমার খুব বিপদ!"

লোক তিনটি পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কী করবে বুঝতে পারছে না। তাদেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, রোদ উঠে যাচ্ছে চড়া হয়ে।

প্রথম যে-লোকটি ভয় পেয়ে তীর-ধনুক ফেলে দিয়েছিল, সে বলল, "ওরে, অত কথায় কাজ কী? ইনি ভূত না মানুষ, তা কে জানে! ইনি যেখানে ইচ্ছে যান, আমরা চল পালাই!"

হিংকা বলল, "তলোয়ারখানা দেখে বড্ড লোভ হচ্ছে। আমাদের গ্রামে কারও এরকম অস্ত্র নেই! কখনও চোখেও দেখিনি!"

মংরু বলল, "হাতে কীরকম আংটি রয়েছে দ্যাখ! নির্ঘাত মনে হচ্ছে সোনার। তাতে হিরে-মুক্তো বসানো। ওরে, ওরকম একটা আংটি বিক্রি করে দিলে কত চাল আর ডাল পাওয়া যাবে বল তো? সারা বছর আমাদের খাওয়ার চিন্তা থাকবে না।"

তলতাদেবী বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা আমাকে জঙ্গলের বাইরে কোনও বড় রাস্তায় নিয়ে চলো। তা হলে আমি তোমাদের এই তলোয়ার আর আমার হাতের আংটি উপহার দেব! চলো, চলো, শিগগির চলো।"

মংরু বলল, "এটা মন্দ কথা নয়। ওনাকে জঙ্গলের বাইরে পৌঁছে দিলেই যদি অমন ভাল জিনিস দুটো পাওয়া যায়, তা হলে তো বহুত মজা! চল তা হলে যাই!"

হিংকা বলল, "দূর গাধা! এখন আমরা জঙ্গলের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত যাব, আবার ফিরে আসতে হবে, এর মধ্যে যদি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে যাই? তখন কী হবে? সৈন্যরা আমাদের এইসব জিনিস কেড়ে নেবে না? মেরেও ফেলতে পারে। তার চেয়ে আর-একটা কাজ করা তো অনেক সহজ!"

হিংকা মংরুর দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করল। মংরু তাকাল অন্য লোকটির দিকে। সে-ও ভুরু নাচিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস!"

তারা তখন তিন দিক থেকে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল মহারানির দিকে।

মহারানি আবার তলোয়ার তুলে নিয়ে বললেন, "খবর্দার, আমার কাছে আসবে না! আমাকে ধরার চেষ্টা করবে না।"

লোক তিনটি লোভীর মতন হি-হি করে হেসে উঠল একসঙ্গে।

ঠিক সেই সময় আরও তিনটি লোক ঝোপ সরিয়ে উপস্থিত হল সেখানে। তাদের মধ্যে একজন তলতাদেবীর দিকে তাকিয়েই দারুণ চমকে গিয়ে বলল, "কে? কে? ইনি কে?" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

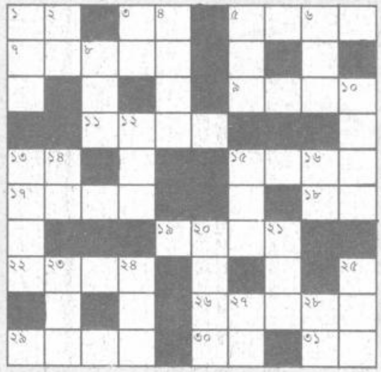

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বৃত্তের মধ্যরেখা। (৩) পাপড়ি। (৫) মিশরে দ্রষ্টব্য। (৭) মহাভারতের দুই যুযুধান পক্ষ। (৯) চাতাল। (১১) তুর্কি রাজধানী। (১৩) শ্রেষ্ঠ। (১৫) টাটকা। (১৭) খ্যাতি। (১৮) বৎসর। (১৯) ধর্ম বা জাতি-বিশেষ। (২২) তিমিকেও নাকি গিলতে পারত। (২৬) যার উত্তরাধিকারী নেই। (২৯) কাশ্মিরের বিখ্যাত উদ্যান। (৩০) চব্বিশ সেকেণ্ড সময়ে কি চার তোলা মাংস সেদ্ধ হবে?—এই প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্যে শব্দটির তিনটি অর্থ পাবে। (৩১) শিঙাড়ার মধ্যে বাড়ি।

উপর-নীচ : (১) উৎকণ্ঠিত, কাতর। (২) কাঠিও এমন হয়, লাঠিও এমন হয়। (৩) শাস্তি। (৪) রাশিযোগে সমুদ্র। (৫) প্রেতবিশেষ। নীচাশয় মানুষকেও এমন বলা হয়। (৬) সংযুক্ত। (৮) খড় ইত্যাদির গাদা। (১০) পথের দস্যু। (১২) স্তুতিকারক। (১৩) রণক্ষেত্রে ইনিই সর্বেসর্বা। (১৪) সে-ইনিও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। (১৫) এই বাদ্যযন্ত্রের এক জুড়িদার আছে। (১৬) এর সাহায্যে নানান ম্যাজিক, নানান খেলা। (২০) কথোপকথন। (২১) রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থ। (২৩) বক্তৃতা। (২৪) ঢেউ। (২৫) সিংহের শোভা। (২৭) বুনো হলেই গলা ধরতে পারে। (২৮) শত্রু।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	রূ	দ্যা	ন			ব	র	রু	চি
ঞ্জী			তু	ঘ	ল	ক			তো
র	সা	য়	ন			ল	শ	ক	র
	ধা		দা			ম		র্ণি	
	র	থ		দা	দা		ঢা	কা	
ঋ	ণ		মা	তা	ম	হ		র	সা
য		স্বা	দু			রি	ক্ত		বু
ভ	দ্র		র	স	ক	ষ		খু	দ
	ব	সু		মী	ন		নী	র	
প	ণ		স	হ	ক	র্মী		পি	ক

রঞ্জন

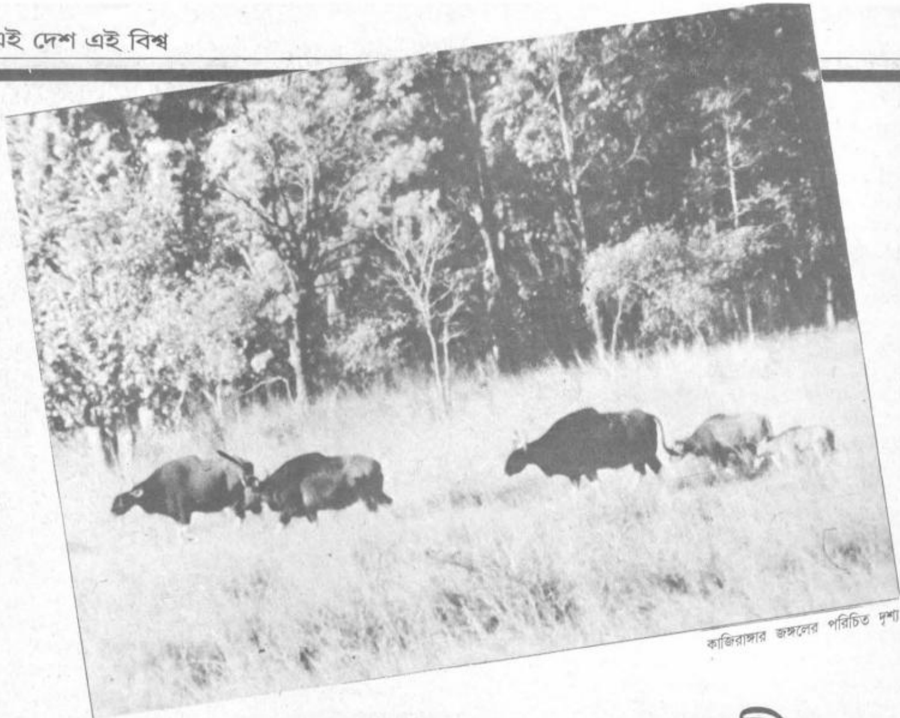

কাজিরাঙ্গার জঙ্গলের পরিচিত দৃশ্য

ভারতের বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য

কল্যাণ চক্রবর্তী

যে অরণ্য শুধু বন্যপ্রাণীদের জন্যই সংরক্ষিত, যেখানে মানুষের অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ, তাকেই বলা হয় অভয়ারণ্য। বনের গাছপালা কাটার সঙ্গে-সঙ্গে বন্যপ্রাণীদের ওপরেও হামলা হয়ে থাকে। মানুষের লোভের শিকার এইসব বন্য জন্তুজানোয়ার। তাই আইন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সারা দেশে অনেক অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে।

আজ ভারতবর্ষে ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা ৫৪টি। আর অভয়ারণ্যের সংখ্যা ৩৭৩টি। ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে আছে ২১,০০৩ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল। সারা ভারতে অভয়ারণ্যের মোট এলাকা ৮৮,৬৮৯ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট আয়তনের ২·৮ শতাংশ। ন্যাশনাল পার্ক ও অভয়ারণ্যের মোট আয়তন হল ১০৯,৬৯২ বর্গ কিলোমিটার, যা ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের ৩·৩ শতাংশ। ন্যাশনাল পার্ক ও অভয়ারণ্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অভয়ারণ্যে গবেষণার প্রয়োজনে অনুমতিসাপেক্ষে কখনও-কখনও গাছ কাটা চলে। কিন্তু ন্যাশনাল পার্কে তা চলে না। গোচারণও অভয়ারণ্যে অনুমতিসাপেক্ষে চলতে পারে। কিন্তু ন্যাশনাল পার্কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী সম্পদ অন্য যে-কোনও দেশের মতোই বনের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। আফ্রিকার বন্যপ্রাণী সম্পদ সারা বিশ্বে সুপরিচিত। কিন্তু বন্যপ্রাণী সম্পদের বৈচিত্র্যে অবশ্যই ভারতবর্ষ পৃথিবীর

শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে।

বন্যাপ্রাণীদের দু' ভাগে ভাগ করা যায়—মাংসাশী ও তৃণভোজী। এ-দেশে মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে সিংহ, বাঘ, লেপার্ড, স্নো-লেপার্ড, ফিশিং ক্যাট, কারাকাল ও বিড়াল পরিবারভুক্ত অন্যান্য প্রাণী। কুকুর পরিবারভুক্ত মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে ধূসর নেকড়ে, তিব্বতি কালো নেকড়ে, হায়েনা, বুনো কুকুর, শেয়াল ও খ্যামক শেয়াল। ক্ষুদ্রতর মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে রাটেল, মার্টেন, সিবেট ক্যাট, বেজি প্রভৃতি।

তৃণভোজী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বুনো হাতি। তারপরে গণ্ডার, বুনো মোষ ও বাইসন। ভারতে বহু প্রজাতির হরিণ। তিনটি প্রজাতির গবাদি গোষ্ঠী ও দুটি গ্যাজেল প্রজাতি রয়েছে। হরিণ প্রজাতির সর্ববৃহৎ হচ্ছে সম্বর। তারপরে রয়েছে হাঙ্গুল বা কাশ্মিরি হরিণ ও সোয়াম্প ডিয়ার। চিতল হরিণের আকৃতিও বেশ বড় ও তারা দেখতে সুন্দর। কিন্তু হরিণ প্রজাতির সবচেয়ে সুন্দর সদস্য হচ্ছে ব্রো-আনটলার্ড ডিয়ার বা নাচুনে হরিণ। কিন্তু দুঃখের কথা, নাচুনে হরিণ প্রজাতি আজ বিপন্ন। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষের মণিপুর রাজ্যের কৈবুল-লামজাও জাতীয় উদ্যানে নাচুনে হরিণ রয়েছে। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসের সুমারি অনুযায়ী ৬৪টি নাচুনে হরিণ রয়েছে এই জাতীয় উদ্যানে। হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার ও ফোর হর্নড ডিয়ার আকৃতিতে ছোট, কিন্তু ভারতবর্ষে সবচেয়ে ছোট হরিণ প্রজাতি হচ্ছে মাউস ডিয়ার বা চেভরোটিন, যা প্রায় খরগোশের মতো।

ডাচিগ্রাম অভয়ারণ্যে মৃত গণ্ডারের দেহ ঠোকরাচ্ছে হলদে ঠোঁট নীল ম্যাগপাই পাখি

আফ্রিকাতে বহু প্রজাতির গবাদিগোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী রয়েছে। যেমন, অ্যান্টিলোপ ও গ্যাজেল প্রজাতি। কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র তিনটি অ্যান্টিলোপ প্রজাতি রয়েছে। যেমন নীলগাই, কৃষ্ণসার দু'টিই সমতলের প্রাণী ও তৃতীয়টি তিব্বতি গবাদি গোষ্ঠী, যা হিমালয়ের উঁচু এলাকায় থাকে।

ঘাসের জঙ্গলে হরিণ (কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক)

দুটি গ্যাজেল প্রজাতি রয়েছে ভারতে—চিংকারা ও তিব্বতি গ্যাজেল। তিনটি ভালুক প্রজাতি রয়েছে ভারতবর্ষে। ব্রাউন বিয়ার থাকে হিমালয়ের উঁচু এলাকায়। হিমালয়ের ব্ল্যাক বিয়ার দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় ও ইন্ডিয়ান শ্লথ বিয়ার থাকে সমতলে। বিড়াল-ভালুক প্রজাতির মধ্যে রয়েছে বিন্টুরং ও পাণ্ডা। হিমালয়ে দুটি প্রজাতির বুনো ভেড়া, আইবেক্স, মারখর, বুনো ছাগল বা টর, মেরো ও গুড়াল রয়েছে। মাত্র দুটি প্রজাতির শুয়োর রয়েছে আমাদের দেশে। ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড পিগ ও পিগমি হগ। প্রথমটিকে দেখা যায় সমতল থেকে ২৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ, পিগমি হগ অত্যন্ত বিপন্ন। অসমের মানস, পবিতোরা ও আরও কয়েকটি অভয়ারণ্যেই এরা সীমাবদ্ধ।

রেপটাইল শ্রেণীর মধ্যে ঘড়িয়াল, মাগার ও মার্শ কুমির উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি প্রাণী প্রজাতিরই আজ বিপন্ন অবস্থা। বিভিন্ন অভয়ারণ্যে কুমির-প্রকল্পের আওতায় এদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে কুমির প্রজাতি থাকলেও এখানে কোনও অ্যালিগেটর নেই। সবচেয়ে বড় সাপ হচ্ছে পাইথন। এরা শতকরা একশো ভাগই বিষহীন। তবে এরা খাদ্য প্রাণী জড়িয়ে নেয় ও পুরো গিলে ফেলে। বিষধর সাপের মধ্যে রয়েছে কিং কোব্রা, কমন কোব্রা, ক্রেট, রাসেল ভাইপার, স-স্কেলড ভাইপার ও পিট ভাইপার প্রভৃতি।

কাজিরাঙ্গার জঙ্গলেই আশ্রয় নিয়েছে ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডার

গোরিলা, ওরাংওটাং বা শিম্পাঞ্জি ভারতবর্ষে না থাকলেও বানর প্রজাতির বহু প্রাণী এখানে রয়েছে। যেমন লাঙুর, রেসাস বানর, লায়ন টেইলড ম্যাকাক, ক্র্যাব-ইটিং ম্যাকাক, গোল্ডেন লাঙুর প্রভৃতি। সবচেয়ে বড় পাখি সারস রয়েছে এখানে, যা উচ্চতায় দেড় মিটারও হতে পারে। সবচেয়ে ছোট পাখি সান-বার্ড উচ্চতায় সাত সেন্টিমিটারের বেশি হয় না। এরা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘুরে ঘুরে পরাগ সংগ্রহ করে প্রজাপতির মতো।

ভারতবর্ষে সত্যিই বহুবিচিত্র বন্য প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে— যেমনটি অন্য কোথাও নেই। বন্যপ্রাণী সম্পদের বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষকে সাতটি বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে এক হিমালয় অঞ্চল ; দুই, উত্তর ভারতের বনভূমি—সমতল ও পাহাড়ের পাদদেশ ; তিন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ; চার, দক্ষিণের মালভূমি ; পাঁচ, দক্ষিণের বনভূমি ; ছয়, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এবং সাত, মরুভূমির অঞ্চল।

বিভিন্ন অঞ্চলের বন্য প্রাণী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। এক, হিমালয় অঞ্চল। এ-অঞ্চলে আছে তিব্বতি কালো নেকড়ে, জায়ান্ট ওয়াইল্ড শিপ, তিব্বতি বুনো গাধা ক্যায়ং, তিব্বতি গ্যাজেল ও অ্যান্টিলোপ, ভুরাল বা ব্লু সিপ। আইবেক্স, মারখর, টর, গোরাল, কস্তুরীমৃগ, সেরো, হাঙুল, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, ব্রাউন বিয়ার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে স্নো-লেপার্ড। প্যান্থার ও বাঘ। এই অঞ্চলের অভয়ারণ্যগুলিও এইসব প্রাণী নিয়ে তৈরি হয়েছে।

দুই, উত্তর ভারতের বনভূমি— সমতল ও পর্বতের পাদদেশ। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশার বনাঞ্চল ও অভয়ারণ্যে বুনো হাতি দেখা যায়। পাহাড়ের পাদদেশে বাঘ, প্যান্থার, শ্লথ বিয়ার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, সম্বর, সোয়াম্প ডিয়ার, চিতল, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর, সজারু, খরগোশ, মার্শ খরগোশ, রাটেল। প্যাঙ্গোলিন, হায়েনা, বুনো কুকুর। শিয়াল ও খ্যাঁকশিয়াল প্রভৃতি প্রাণী। সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে ঘড়িয়াল, মাগার, পাইথন, কিং কোব্রা, কমন কোব্রা, ক্রেট, ভাইপার, র‍্যাট, স্নেক প্রভৃতি।

তিন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বন্য প্রাণী-সম্পদে এ-অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বহু বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি রয়েছে। যেমন বুনো হাতি, গণ্ডার, বুনো মোষ, বাইসন, বাঘ, প্যান্থার, নাচুনে হরিণ সমেত প্রায় সব প্রজাতির হরিণ, পিগমি হগ, হিসপিড হেয়ার, যা অত্যন্ত বিপন্ন। এ ছাড়া রয়েছে বিন্টুরং ও পাণ্ডা, এবং বিপন্ন কয়েকটি বানর-প্রজাতি।

চার, দক্ষিণের মালভূমি এ অঞ্চলের বনভূমিও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এখানে আছে বাইসন, বুনো মোষ। প্রায় সব প্রজাতির হরিণ ও হাঙুল ছাড়া, নীলগাই, কৃষ্ণসার, চিংকারা প্রভৃতি। দক্ষিণের দিকে যতই যাওয়া যাবে, ততই বুনো মোরগ-মুরগি বেশি করে চোখে পড়বে।

পাঁচ, দক্ষিণের বনভূমি এই অঞ্চলে বিভিন্ন পাখি ও সাপের প্রজাতির বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। মাউস ডিয়ার, লায়ন-টেইল্‌ড ম্যাকাক এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। নীলগিরি থর নীলগিরি পর্বতের বনভূমিতে দেখা যায়।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চিতল হরিণ নিয়ে আসা হয়েছে মূল ভূখণ্ড থেকে। বিপন্ন কিছু বন্য প্রাণী এখানে দেখা যায়। যেমন, দুগং, কোকোনাট ক্র্যাব ও ক্র্যাব ইটিং ম্যাকাক। বড় পা বিশিষ্ট মেগাপড পাখি আন্দামানের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। কোকোনাট ক্র্যাব নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে আনতে পারে।

ছয়, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এই অঞ্চলটিতেও আছে বিচিত্র সব বন্য প্রাণী। ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির এই অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে কৃষ্ণসার, বিভিন্ন হরিণ প্রজাতি। বুনো শুয়োর ও বাঘ। সুন্দরবন অঞ্চল, আন্দামান, ওড়িশার চিল্‌কা এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

সাত, মরুভূমি অঞ্চল পঞ্জাবের কিছু বনভূমি, হরিয়ানার কিছুটা অঞ্চল, রাজস্থান ও গুজরাত নিয়ে এ-অঞ্চলের ব্যাপ্তি। যেসব বন্য প্রাণী গহন বনের চেয়ে স্বল্প পরিসরের বন ও ফাঁকা জায়গা বেশি পছন্দ করে এই অঞ্চলের অধিবাসী তারাই। অ্যান্টিলোপ ও গ্যাজেল প্রজাতি তাই স্বাভাবিক কারণে এখানেই বেশি পাওয়া যায়। সিংহ, বুনো গাধা এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী। পাখির মধ্যে আছে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, লেসার বাস্টার্ড, স্যান্ড গ্রাউস প্রভৃতি। যেখানে বন বেশি ঘন সেখানে বাঘ, প্যান্থার, বিভিন্ন হরিণ প্রজাতি রয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখন ভারতবর্ষেও বনের ওপর মানুষের বিরাট চাপ পড়েছে। ফলে বন হচ্ছে সঙ্কুচিত— বন্যপ্রাণী স্বাভাবিক কারণেই আজ বেশ কোণ ঠাসা হয়ে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭২-এর ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগের ফলে বহু বিপন্ন বন্য প্রাণী আজ আবার মানুষের নজরে আসছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প ও কুমির-প্রকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাতিদের নিয়েও প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতিতে যেহেতু প্রত্যেকটি প্রাণীর একটি নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে, তাই কোনও প্রাণীর মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পরিবেশের অনৈক্য সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্ষতি হয় মানুষেরই। কোনও প্রাণী একবার নিশ্চিহ্ন হলে তার সুষ্ঠু পুনরুদ্ধার কেবল কষ্টসাধ্যই নয়, প্রায় অসম্ভবও। তাই মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রয়োজন। এর অন্য কোনও সহজতর বিকল্প নেই। তবে অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের সংখ্যাও বেশি হওয়া উচিত। প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে, ৫০৩টি অভয়ারণ্য ও ১৪৮টি জাতীয় উদ্যান থাকা দরকার। অর্থাৎ, ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের ৪.৬ শতাংশই হওয়া উচিত অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান।

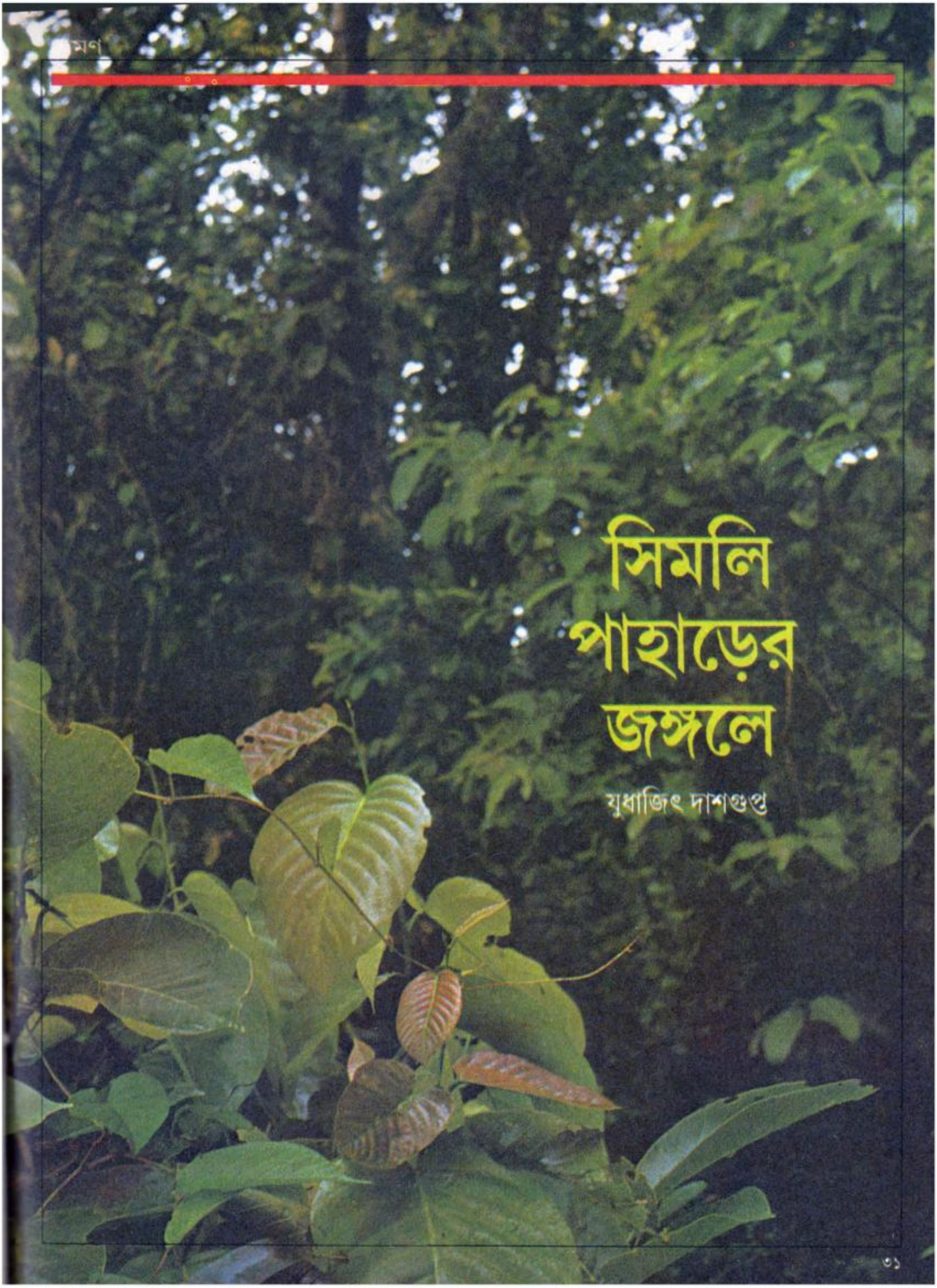

সিমলি পাহাড়ের জঙ্গলে

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

শ্যাওলা-সবুজ প্রাচীন ডালে সাম্রাজ্য ছড়িয়েছে নানারকম এপিফাইট অর্কিড

এক-একজন মানুষ যেমন এক-একরকম, এক-একটা জঙ্গলও তেমনই, আলাদা-আলাদা, কেউ কারও মতো নয়। ওড়িশায় সিমলি পাহাড়ের উপর এই জঙ্গলটাও অতুল— প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে, মাটি আর অন্যান্য পরিবেশের বৈচিত্র্যে একদম আলাদা।

এই জঙ্গলটা একসময় ছিল ময়ূরভঞ্জের মহারাজাদের শিকার করার জায়গা। নিজেরা শিকার করতেন বলেই এখানে বাঘের ঘরের আশেপাশে বাইরের কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না তাঁরা। ফলে জঙ্গলটা নষ্ট না হয়ে বেঁচে আছে। সিমলিপাল এখন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের আওতায়। খৈরির কথা মনে পড়বে এখানে এলেই। খৈরি নদীর কূল থেকে এই বাঘিনীটিকে কুড়িয়ে এনে পালন করেছিলেন তখনকার বনপাল সরোজ রায়চৌধুরী। এ-জঙ্গলে শাল গাছই বেশি।

জঙ্গলে কচু-ফুল

সতর্ক প্রেয়িং ম্যান্টিস

পাথরের ফাঁকে নাম-না-জানা ফুল

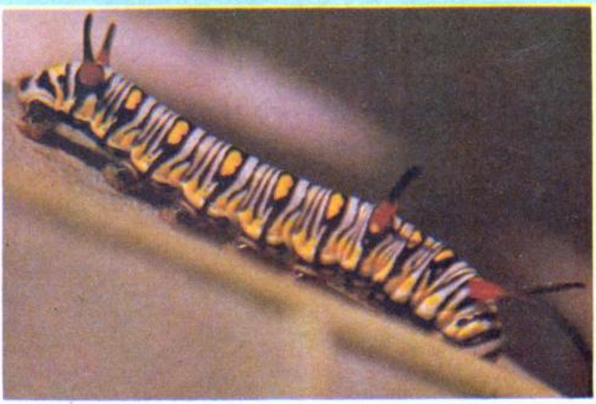

মনার্ক প্রজাপতির উজ্জ্বল লার্ভা

ঘাসজমির মধ্যে ফুটে আছে লিলিজাতীয় ফুল

বর্ষার গোড়ায় শালের নরম সবুজ আর ফিকে লাল পাতায় জঙ্গলের রূপ খুলেছে চমৎকার। শাল ছাড়াও বেশি করে চোখে পড়ে আমলকী গাছ। পথের উপর জাম ছড়িয়ে পড়ে, ফেটে বৃষ্টির জলে ধুয়ে বেগুনি হয়ে রয়েছে কত জায়গায়। সেই জাম কয়েকটা কুড়িয়ে খেলেই বোঝা যায় কী মিষ্টি আর কী অপূর্ব তার স্বাদ। কোথাও-কোথাও কদম গাছ, ফুল ধরেছে। কাঞ্চন ফুলের গাছও প্রচুর।

এইসব দেখতে দেখতে, পাখির কিচিরমিচির শুনতে শুনতে, আঁকাবাঁকা পথটা যশিপুর থেকে শুরু হয়ে কখন ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। পথটা আগাগোড়া লাল কাঁকর ছড়ানো। কোথাও-কোথাও জলেভেজা পথ বেয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বনের নীচের মাটি দেখা মুশকিল, সেখানে ছোট-বড় সবুজ-সবুজ চারা গজিয়েছে। সবুজ চাদরে ঢেকে ফেলেছে বনভূমি। একটা বিরাট মোটা শালের গুঁড়িকে জড়িয়ে একটা সরু ফ্যাকাসে সবুজ রঙের লতা সবে মাথা উঁচিয়েছে। কচি খুদে-খুদে শেকড় গাছের ছালে একটা-দুটো আঁচড় কেটেছে। বোধ হয় প্রতিটি শালগাছের গুঁড়ির কাছে গেলেই এমন দেখা যাবে। এ হল বর্ষার নির্ভুল সঙ্কেত।

আমাদের জিপটা যখন চাহালায় বাংলোবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, ততক্ষণে সামনের ষাট-সত্তর ফুট উঁচু ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর মাথায় ছপছপে মেঘ জমতে শুরু করেছে। গাছের চূড়াগুলো ঝাপসা। দূরের পাহাড়-জঙ্গলও ঝাপসা। বাতাস রীতিমত ভিজে। গাছপালাগুলো ভীষণ সবুজ। স্তব্ধ। আমরা বললাম 'বৃষ্টি আসবে'। কথা ফুরাল না, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। ঘাসজমির মধ্যে ফুটে থাকা ছোট্ট বেঁটে-বেঁটে গাছগুলো সাদা-সাদা ফুলসমেত শুয়ে পড়ল মাটিতে।

এই বৃষ্টির অপেক্ষাতেই এই অঞ্চলের নদী-নালাগুলো এতদিন তাদের খটখটে বুক বার করে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে ছিল। এই প্রথম বর্ষার ফোঁটাগুলো জঙ্গলের মাটিতে গিয়ে পড়বে, বনভূমি ঢেকে যাবে সবুজে। বৃষ্টি হচ্ছিল না বলে উইপোকাদের নতুন রানি সেজেগুজে মাটির গর্তেই বসে ছিল, বাইরে বেরনো হচ্ছিল না। এখন তাঁর পাতলা ডানা গজিয়েছে, তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন বৃষ্টির মধ্যেই। চাহালায় পৌঁছে একটা ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম, একটা উইয়ের গর্ত থেকে সেকেন্ডে প্রায় গোটা কুড়ি করে উইপোকা বেরোচ্ছে ডানা কাঁপাতে-কাঁপাতে।

খৈরির ছবি পুরনো অ্যালবাম থেকে

জঙ্গলে কখনওই একটা ঘটনা এমনি-এমনি শুরু হয়ে অকারণ শেষ হয়ে যেতে পারে না। বৃষ্টিতে উইপোকাগুলো তাদের গর্তের কাছাকাছি এনে জড়ো করে আরও বেশ কয়েকটা প্রাণীকে। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল বলে দেখতে পাইনি, তবে এদের মধ্যে একটা প্রাণী হল গিরগিটি। দীর্ঘজিহ্ব। টপ করে জিভ বার করে শিকারসমেত মুখে ঢুকিয়ে নিতে এক সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে। আর আসে কিছু পতঙ্গভুক পাখি। বৃষ্টির তেজে এরাও সে-সময় ওখানে ছিল না। চওড়া ঘাসের পাতার নীচের দিকে একটা উইপোকাকে কামড়ে ধরে আছে দেখি একটা মাকড়সা। ডানাসমেত উইপোকাটা মাকড়সার শরীরের প্রায় ছ'গুণ তো হবেই। কিন্তু একবার কামড় বসাতে পারলে মাকড়সার বিষ উই কেন, তার থেকেও বড় প্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারে। আর-একটা উইপোকা ডিমের থলি পাহারা দিতে থাকা একটা স্ত্রী-মাকড়সার জালে গিয়ে ধরা দিয়েছে। গর্তের আশেপাশের বাতাসে কেবল পতনশীল বৃষ্টিকণা আর উড়ন্ত উই। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর ধবধবে রঙের তিন ফুট মোটা গুঁড়ি বেয়ে গলগল করে জলের ধারা নামছে। মাটিতে যেখানে এসে পড়ছে, সেখানে জমাট সাদা ফেনা। বৃষ্টির চেহারা দেখে মনে হল, এ যাত্রায় জঙ্গলে স্বেচ্ছাবিহার হয়তো আর হল না, বৃষ্টি ছুটি দেবে না খুব শিগগির। কিন্তু তাতে মন খারাপ হওয়ার আর কোনও কারণ ছিল না তখন। কারণ বৃষ্টি তখন জঙ্গলের সম্পূর্ণ নতুন রূপ খুলে দিয়েছে। ছাতা মাথায় এখানে-ওখানে কাছাকাছি চোখ মেলে ঘুরতে থাকলাম।

চোখ মেললে কী হবে, চোখকে ফাঁকি দিতে দক্ষ জঙ্গলের ছোটখাটো প্রাণীরা। একটা শুকনো পাতার নীচে বসে আছে আর-একটা পাতারই মতো দেখতে এক মথ। সবুজ ঝিঁঝিপোকা মিশে আছে সবুজ ডালের সঙ্গে। মাকড়সার জালে জল পড়তে তারা চলে গেছে জালের অবলম্বন গাছের কোনও পাতার নীচে। পাতা উলটে-উলটে তাদের খুঁজে বার করতে হচ্ছে। পাগুলো গুটিয়ে শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে সরু একটা ডালের সঙ্গে প্রায় মিশে রয়েছে একটা প্রেয়িং ম্যান্টিস। খয়েরি রং। কাছেই আর-একটা রয়েছে গাছের মোটা গুঁড়ির উপর সতর্ক, শিকার ধরার ভঙ্গিতে। এরা মাংসাশী। প্রেয়িং ম্যান্টিসের সামনের পা দুটোর ভিতর দিকের গায়ে খাঁজকাটা---সেই পায়ের ভাঁজে এরা আঁকড়ে ধরে কোনও উড়ন্ত পোকাকে। একবার ধরা পড়লে নিস্তার পায় না কেউই। উড়তে পারে। কিন্তু ওড়া দেখে মনে হয় তেমন অভ্যস্ত নয়। তাই উড়ে-উড়ে শিকার ধরার চেয়ে এক জায়গায় ধৈর্য ধরে বসে উড়ন্ত শিকার ধরাই সুবিধে এদের পক্ষে। বৃষ্টি থামার পরেও গাছের গুঁড়ির গায়ে কয়েক ঘণ্টা বসে ছিল একটা ম্যান্টিস। পরে সে জায়গা বদলালেও গাছের গুঁড়িটা ছাড়েনি। এদিকটায় প্রেয়িং ম্যান্টিসের ডিমের ছড়াছড়ি। স্ত্রী-ম্যান্টিস ডিম পেড়ে ডিমগুলোকে ফেনার মতো একটা পদার্থ দিয়ে ঢেকে দেয়। ফেনাগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়ে কঠিন খোলার মতো একটা মোড়ক তৈরি

সুনির্মল বসু—চিরকালের কিশোরপ্রিয় লেখক

শুধু ছোটদের জন্য লেখাটাই যথেষ্ট নয়, যদি-না সে লেখা হয় ছোটদের উপভোগ্য। আমাদের সৌভাগ্য যে, কেউ-কেউ অন্তত এ-কথাটা বুঝতেন। বুঝতেন বলেই, তাঁদের লেখা সময়ের সীমা পেরিয়ে নিরন্তর আনন্দের চিরন্তন উৎস হয়ে থেকে গেছে। এমনই একজন চিরকালীন কিশোরপ্রিয় লেখক সুনির্মল বসু। তাঁর অজস্র রচনার সবটুকুই ছোটদের জন্য। তাদের মনের মতো করে লেখা। সহজ, স্বাদু, মজাদার। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত চার-চারটি দুর্দান্ত গ্রন্থের একটিতে 'কানাকড়ি' নামের এক দীর্ঘ কাহিনী, সেইসঙ্গে চমৎকার একটি নাটিকা—'শহুরে মামা'। এটি তাঁর তিন খণ্ড রচনা-সম্ভারে নেই। গ্রামের দুই বিচ্ছু ছেলের হাতে শহুরে অহঙ্কারী মামার নাজেহাল হবার বৃত্তান্তে-ভরা এ-নাটিক করতে যত মজা, পড়তে তার কম নয়। আরেকটি বই-'ছন্দের টুংটাং'। এতে সুনির্মল বসু শিখিয়েছেন কবিতা লেখার গোপন কথা। চোখে-দেখা আর কানে-শোনা চারপাশের সব-কিছুকে কী করে ধরা যায় সহজ ছন্দ-মিলে, তাই নিয়ে এই বই। আর দুটি আশ্চর্য বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও মধুসূদনের ছোট্টবেলা থেকে শুরু করে সারা জীবনের নানান কাহিনী। এ-বই দুটিও বারবার পড়ার।

সুনির্মল বসুর বই

ছন্দের টুংটাং ৮·০০ বঙ্কিমচন্দ্র ৪·০০ মাইকেল মধুসূদন ৬·০০
শহুরে মামা ও কানাকড়ি ১০·০০

বিমল মিত্রের ছোটদের উপন্যাস

বিমল মিত্র বড়দের মহলে তো দারুণ জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু ছোটদের জন্যও যে-কটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং স্বাদে মন-কেড়ে-নেওয়া। যেমন ধরো, রাজা হওয়ার ঝকমারি। এক রাজা ঠিক করলেন যে, পৃথিবীর সব-থেকে বোকা লোকটিকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকেই তিনি বসাবেন নিজের সিংহাসনে। রাজার দুই ছেলে। দুজনেই ছুটল—এ-প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত। তারপর? তারপর যে কী, তাই নিয়েই 'রাজা হওয়ার ঝকমারি'। 'দাশরথির বাহাদুরি'তে বিমল মিত্র শুনিয়েছেন একটি ছেলের মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরভক্তিতে অটল থেকে বড় হবার এক অসাধারণ কাহিনী। সেই ছেলেটির নাম দাশরথি। এ-কাহিনী শুধু গল্পের খিদেই মেটাবে না, অনুপ্রাণিতও করবে তোমাদের।

আবার ধরো, তাঁর 'কে ?' নামের উৎকণ্ঠা-উদ্বেল মহান উপন্যাসটি। এক চেহারার দুই ছেলেকে নিয়ে কীসব গোলমেলে কাণ্ড। অসংখ্য দাবিদার, অজস্র জটিলতা। আর এ-সবের জট ছাড়িয়ে দারুণ রোমাঞ্চকর ও দারুণ নাটকীয় একটি কাহিনী শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত চোখের সামনে। এই উপন্যাসের মধ্যে মানুষের আত্মপরিচয় অন্বেষণের একটি মহান বক্তব্যও খুব সূক্ষ্মভাবে মিশে রয়েছে।

বিমল মিত্রের বই

রাজা হওয়ার ঝকমারি ১০·০০ দাশরথির বাহাদুরি ১২·০০ কে ? ১৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

ছড়ার মজা, মজার ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০
সত্যজিৎ রায়ের
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ১৬·০০

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর
মৌ মিছরি মণ্ডা ১০·০০
অন্নদাশংকর রায়ের
হৈ রে বাবুই হৈ ১০·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটনো ৬·০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাশের
সাদা বাঘ ১০·০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয় ২০·০০
গৌরী ধর্মপালের
ঘোড়া যায় ৬·০০

রমাপদ চৌধুরী ও সুধীর মৈত্রের
ভূতগুলো সব গেল কোথায় ২০·০০
আদিনাথ নাগের
হিজঙ্গলের দেশে ৬·০০
কমলকুমার মজুমদারের
পানকৌড়ি ১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকারের
মামার বাড়ি ৮·০০
অতুল্য ঘোষের
টুকটুক ও পুজোর ছুটি ৫·০০

করে। তার ভিতরে ডিমগুলো জল-বৃষ্টি, পোকামাকড়ের হাত থেকে বেঁচে থাকে। দু'রকম ডিমের থলির দেখা পাওয়া গেল এখানে—সরু ডালের সঙ্গে শক্ত করে আটকানো ছিল সেগুলো।

খুঁজে-খুঁজে খুঁজে-খুঁজে, দেখতে-দেখতে, জঙ্গলের নিচু মহলের চেহারাটা ফুটে উঠতে থাকল। কিন্তু খুব নীচে যে নজর যায়নি সেটা বোঝা গেল হাঁটুর কাছে প্যান্টের উপর দাঁড়িয়ে লকলক করতে থাকা একটা জোঁককে দেখে। এক ঝটকায় সেটাকে ফেলে দিয়েও স্বস্তি পেলাম না, প্যান্টের নীচের দিকটা মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে বেঁধে নিতে হল। সিমলিপালে জোঁক প্রচুর। ভঞ্জবাসা নামে একটা জায়গায় শুনেছি ঢালু জমির উপর লক্ষ-লক্ষ জোঁক দাঁড়িয়ে উঠে লকলক করতে থাকে একটা জীবন্ত চাদরের মতো। তারপর থেকে পা ফেলতে হচ্ছিল খুব সাবধানে। ঘাসজমির মধ্যে চমৎকার সাদা লিলি-জাতীয় ফুল ফুটে আছে। একটু দূরে একইরকম আর-একটা ফুল, তবে রংটা গোলাপি।

বৃষ্টির মধ্যেও খাওয়া-দাওয়া ছাড়তে নারাজ নানা ধরনের শুঁয়োপোকাগুলো। শুঁয়োপোকা বলছি বটে, কিন্তু এদের গায়ে শুঁয়ো নেই। মথ বা প্রজাপতির লার্ভা এরা। বিচিত্র এদের গড়ন আর চলনভঙ্গি। কোনওটা হাঁটে সাধারণ শুঁয়োপোকা বা কেন্নোর মতন গুটিগুটি, কোনওটা হাঁটে মাথার দিকটা দিয়ে ডাল আঁকড়ে। শরীরটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে তুলে পেছনের দিকটা টেনে মাথার কাছাকাছি আনে। এবার পেছনের দিকটা শক্ত করে রেখে মাথাটা সটান এগিয়ে দেয়, আবার নতুন করে পিছনটা এগিয়ে আনে। এদের কোনওটাকে একটু টোকা দিলেই হল, ডালের উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়বে, যেন সেখানে একটা নতুন শাখা গজিয়েছে। কোনওটার গা-ভর্তি বড়-বড় শুঁয়ো। কোনওটার গা অদ্ভুত রঙে রঙিন, চিত্রবিচিত্র। এই উজ্জ্বল রং থাকারও একটা কারণ আছে। মথ-প্রজাপতির শূককীট বহু পাখপাখালির প্রিয় খাদ্য। শূককীটদের কারও গায়ে শুঁয়ো আছে, কারও গায়ে নেই। কিন্তু এদের অনেকেই এমন-এমন কিছু গাছের পাতা খেতে অভ্যস্ত, যে-পাতায় কম পরিমাণে হলেও কিছু বিষাক্ত উপাদান আছে। মজার কথা হল, সেই পাতা খেয়ে এই শূককীটদের কোনও অস্বস্তি হয় না, কিন্তু পাতার বিষ ক্রমে-ক্রমে শূককীটের শরীরে জমে এমন একটা পরিমাণে দাঁড়ায় যে অন্য কোনও প্রাণী যদি এদের খায়, তবে দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। তেমন ছোটখাটো প্রাণী হলে মারাও যেতে পারে। যেসব শূককীটের এমন উজ্জ্বল রং, তাদের শরীরে থাকে বিষাক্ত উপাদান। উজ্জ্বল হওয়ার ফলে যে-কোনও প্রাণীরই শত্রুর চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। এরা তাই-ই চায়। একবার যে পাখি উজ্জ্বল শূককীট খেয়েছে, সে ভুলেও আর তার দিকে ঝাঁপাবে না, উজ্জ্বল রং দেখেই সতর্ক হয়ে যাবে পরের বার থেকে।

বৃষ্টি যখন কমল তখন সন্ধে হব-হব করছে। বাংলোর ভিতরে জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় বসে আছি। একপাল চিতল হরিণ, প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা হবে, চলে এল বাংলোর সামনে। কচি ঘাস দাঁতে কাটছে কি কাটছে না, চমকে মুখ তুলে দেখছে আমাদের দিকে। সারারাত হরিণগুলো ছিল বাংলোর সামনেই। ভোরে ধীরে-ধীরে চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে। কিছু পরে দেখি দুটো বাচ্চা হরিণ পথ ভুলে এদিক-ওদিক তিড়িংবিড়িং দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সিমলিপালে পাখি প্রচুর, আগেই বলেছি। পাহাড়ি ময়নার ডাক যে না শুনেছে, সে বুঝতেই পারবে না, পাখির ডাক কত সুরেলা হতে পারে। বাংলোর সামনে ইউক্যালিপটাস গাছগুলোতে জোড়ায়-জোড়ায় ঘুরছে নীলকণ্ঠ। কাঠের গায়ে কাঠঠোকার মতো টাক্ টাক্ কর্কশ ডাক, কিন্তু উড়লেই ডানায় নীলের বাহার দেখা যায়। জিপে করে যাওয়ার সময় পথের উপর থেকে ডানা মেলে উড়ে যায় রেড টার্টল ডাভ, ঘুঘুর জ্ঞাতি—লালচে ধূসর মাথা আর পিঠ। ফাঁকা ঘাসজমি থেকে জঙ্গলের দিকে উড়ে যায় মোহনচূড়া—ওড়ার সময় একঝলক দেখতে পাওয়া যায় ডানার নীচের সাদা-কালো ডোরা দাগ। গাছের টঙে বসে ওখানে ওটা কী পাখি? ফিশিং ঈগল। ওটা কী উড়ে গেল, পায়রার আকৃতি—বাজ। পাখির বাচ্চা ধরে খেতে ওস্তাদ। ডাক শোনা গেল 'পাইড হর্নবিল'-এর। এক ধরনের ধনেশ পাখি। সাদা-কালোয় মেশানো গায়ের রং। ডাক যেন অনেকটা চিলের মিহি সুরের মতো। এক জায়গায় কাচ্চাবাচ্চা সমেত রাস্তা পেরিয়ে গেল এক মুরগি-গিন্নি—রেড জাঙ্গল ফাউল। গ্রে জাঙ্গল ফাউলের দেখাও পাওয়া গেল। পরদিন জিপে করে জোরান্ডার দিকে যেতে-যেতে এইরকম কত যে পাখি চোখের সামনে এসে চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে উড়ে গেল—গুনলে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশরকম হবে। ধনেশের দেখা পাইনি। কিন্তু উপর দিকে চেয়ে পথ চলতে চলতে চোখ আটকে গেল আর-এক দৃশ্যে। বুনো অর্কিড।

সিমলিপালে বেশ কয়েক ধরনের অর্কিড দেখতে পাওয়া যায়। চোখের সামনে যেটা, তার ফুলগুলো হালকা বেগুনি স্তবক, ঝালরের মতো ঝুলছে একটা বড় গাছের গুঁড়ি থেকে। এই প্রথম একটা অর্কিড চোখে পড়ল। একটু যেতে-না-যেতেই আরও এক রকম অর্কিড—এর ফুলগুলো সাদা। গাছ দিয়ে যারা ঘর সাজাতে ভালবাসে, তাদের কাছে নানা ধরনের অর্কিড হল পরম আকাঙ্ক্ষার জিনিস। এক-একটা দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের দামও প্রচুর। কিছু অর্কিড গাছে হয়, কিছু হয় মাটিতে। এইরকম বেশ কিছু অর্কিডের দেখা পাওয়া গেল। জিপে করে আবার চলা। আবার অর্কিড দেখা। আবার দাঁড়ানো। হালকা বৃষ্টি পড়ছিল প্রায় সবসময়েই। এক জায়গায় প্রায় সিকি কিলোমিটার পথ জুড়ে অবিশ্রান্ত উড়ছে উইপোকা। ঈগল কয়েকটা দেখেছিলাম এদেরই কাছাকাছি। জিপ থামিয়ে যখন ঈগল দেখছি, হঠাৎ উঁচুতে গাছের ডালে সরসর আওয়াজে প্রত্যেকের চোখ সেদিকে ফিরল। অতিকায় কাঠবেড়ালি—ইন্ডিয়ান জায়ান্ট স্কুইরেল। লেজসমেত সাড়ে তিন-চার ফুট কি তারও বেশি লম্বা। গাঢ় খয়েরি রঙের পিঠ, বুকটা বাদামি। বাদামি লেজের ডগার রং হালকা। অবলীলায় সে এক গাছের ডাল থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে চলেছে।

সিমলিপালের জঙ্গলে কোনও বড় হিংস্র জানোয়ার দেখতে পাইনি। কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ নেই। জন্তুজানোয়ার জঙ্গলের একটা অংশ—তাদের বাদ দিয়ে গোটা জঙ্গলটা তো পড়েই রয়েছে। জঙ্গলে হাজার-হাজার গাছের গঠন, পাতার গড়ন, নরম পাতার রং কি দেখার মতো কিছু নয়? সহস্রাধিক জংলি ফুল কি কারও মন টানে না? জঙ্গলের পতঙ্গ কি দেখার মধ্যে পড়বে না? খুব চুপিচুপি পা টিপে টিপে বুনো খরগোশের কুড়ি-পঁচিশ ফুটের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তার ছবি তোলায় কি কোনও আনন্দ নেই? একটা জঙ্গলকে বুঝতে গেলে তার সবদিকটা নিয়ে একসঙ্গে দেখতে হবে। সেই শালগাছটার কথা মনে পড়ল, যার গুঁড়ি জড়িয়ে ছোট্ট একটা লতা উপরে উঠছে। শালগাছটা বড়, সহজেই চোখে পড়ে। লতাটা নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু জঙ্গলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে শালগাছের যে ভূমিকা লতাটারও ততটুকুই, কম নয়।

না, জোরান্ডার জলপ্রপাত দেখা হয়নি আমাদের। প্রবল বৃষ্টিতে জোরান্ডার রাস্তায় বান ডেকেছিল, পৌঁছতেই পারিনি সেখানে।

ফোটো লেখক

সকলেই নিজের-নিজের পছন্দমতো পোশাক পরতে ভালবাসেন। কেউ পছন্দ করেন ধুতি-পাঞ্জাবি, প্যান্ট-শার্ট বা পাজামা-পাঞ্জাবি, কেউ পরেন মাথায় টুপি, কেউ বা মাথায় বাঁধেন পাগড়ি। আমাদের দেশের অনেক মনীষীই মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। এই সংখ্যায় এমন কয়েকজন মনীষীর ছবি দেওয়া হল, যাঁরা পাগড়ি বাঁধতেন। দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না।

ক...

খ...

গ...

ঘ...

ঙ...

চ...

ছ...

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকটি মন্দিরের ছবি। (ক) ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। (খ) কোনারকের সূর্য মন্দির। (গ) গোয়ালিয়রের তেলিকা মন্দির। (ঘ) পুষ্করের ব্রহ্মমন্দির। (ঙ) বুদ্ধগয়ার মন্দির। (চ) দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির। (ছ) মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির।

আমাদের গ্রন্থাগার

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার শব্দের অর্থ, গ্রন্থের আগার, আগার মানে গৃহ, অর্থাৎ যে গৃহে গ্রন্থ রাখা হয় তাকে আমরা বলি 'গ্রন্থাগার'। অবশ্য গ্রন্থাগারের ইংরেজি শব্দ 'লাইব্রেরি' কথাটাই আমাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইংরেজদের দেশেই প্রথম গ্রন্থাগার হয়েছিল, বা ইংরেজরাই আমাদের দেশে প্রথম গ্রন্থাগার প্রচলন করেছিল। ভারতবর্ষে দু'হাজার বছর আগেও গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল। তখন কাগজও ছিল না, ছাপাখানাও ছিল না। ধর্মীয় অনুশাসন, জ্ঞানী-গুণীদের চিন্তাভাবনা পাথর বা ধাতুতে খোদাই করে, অথবা পোড়া মাটিতে বা রেশমি কাপড়ের ওপর হাতে লিখে রাখা হত। ক্রমশ এইসব লেখার জন্য তালপাতা এবং ভূর্জপত্র ব্যবহার শুরু হল, এগুলোকে বলা হয় পুঁথি। তখন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল মন্দির, মঠ, বিহার বা যেখানে অধ্যাপনা হত সেইসব গৃহ। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পুঁথি সংগ্রহ করা থাকত আর সেগুলোই ছিল তখনকার দিনের গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারগুলোকে বলা হত ধর্মগঞ্জ, গ্রন্থকুঠি, জ্ঞান ভাণ্ডার, সরস্বতী ভাণ্ডার ইত্যাদি। যেমন, দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে এখনও আছে সরস্বতী মহল। এই গ্রন্থাগার সংস্কৃত পুঁথির জন্য বিখ্যাত। জ্ঞান বা গ্রন্থকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করেই বোধ হয় গ্রন্থাগারের নামকরণের উল্লেখ আছে, যেমন রত্নসাগর, রত্নদধি ইত্যাদি।

বৌদ্ধযুগে ভারতে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও জ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য অনেক পুঁথি লেখা হয়েছিল, এবং সেগুলো রাখার জন্য নতুন গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থাগারগুলো মঠ, বিহার, বা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই অংশ ছিল। এমনই একটি গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায় পাটনার কাছে সেকালের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিশাল ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের খ্যাতি সারা ভারত, এমনকী, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তো বটেই, তিব্বত ও চিন দেশ থেকে মহাপণ্ডিতরাও নালন্দায় জ্ঞানচর্চা করতে আসতেন। হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ, ফা

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা *ফোটো গৌতম চট্টোপাধ্যায়*

হিয়ান প্রভৃতি চিনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় সেকালে নালন্দা ছাড়াও বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা, পঞ্জাব, মথুরা, বারাণসী, কাশ্মির, গান্ধার, আর এদিকে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) পর্যন্ত প্রায় সারা উত্তর ভারত জুড়ে মঠ, বিহার ও তার সঙ্গে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। সেই সময় পশ্চিম ভারতে জয়শলমির, আহমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি জায়গায় জৈনদেরও অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। চতুর্থ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের স্বর্ণযুগ। তারপর ভারতে নানা ধরনের বিপর্যয়ের ফলে এইসব মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের অনেকগুলোই ধ্বংস হয়ে যায়।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ শেষ হল। ভারতে এল মুঘল রাজত্ব। সুলতানদের রাজধানী দিল্লি তখন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হল। সুলতানদের আমলে ইসলামীয় চর্চার জন্য গ্রন্থাগার ছিল। মুঘল বাদশাহদের গ্রন্থাগার প্রীতির প্রমাণ হুমায়ুনই রেখে গেছেন—দিল্লির পুরান কৈলায় (কেল্লা) নিজস্ব গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

দক্ষিণ ভারতে যেসব স্বাধীন মুসলিম রাজত্ব ছিল, সেখানেও গ্রন্থাগারের প্রচলন ছিল—তার শেষ প্রমাণ টিপু সুলতানের গ্রন্থাগার, ইংরেজদের কাছে টিপুর পরাজয়ের সঙ্গে সেটাও মুছে গেল।

মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের চর্চা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি—বারাণসী, ত্রিহুত, মিথিলা, এমনকী নবদ্বীপ অঞ্চলেও ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্য সেকালের গ্রন্থাগারগুলো মঠ, মন্দির, বিহার, আর শিক্ষাকেন্দ্রেরই অংশ ছিল। রাজা, বাদশাহ, আমিরদেরও নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকত। সাধারণ লোকের তখন শিক্ষার সুযোগ ছিল না, আর সেই প্রায়-নিরক্ষর সমাজে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থাগারের প্রশ্নও আসত না। তা ছাড়া তখন ছাপাখানা হয়নি। হাতে লিখে পুঁথি বহু সংখ্যায় নকল করাও দুঃসাধ্য কাজ ছিল, সেটাও শিক্ষা ও গ্রন্থাগার প্রসারের একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গ্রন্থাগার জগতে যুগান্তর এসেছিল এ-দেশে ছাপাখানার প্রবর্তনের সঙ্গে। যদিও ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কিছু বাংলা হরফ ব্যবহার করে হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ ছাপাকে আমরা বাংলা ছাপাখানার সূত্রপাত ধরি, কিন্তু বঙ্গদেশ তথা সারা ভারতেই বোধ হয় প্রথম প্রকৃত ছাপাখানা ছিল শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস। ডঃ উইলিয়ম কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড, এই তিনজন মিশনারির উদ্যোগে ভারতীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস চালু হয়েছিল। মিশন প্রেস চালু হওয়ার সঙ্গেই প্রেসের সংলগ্ন একটি গ্রন্থাগারেরও পত্তন হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস লাইব্রেরি পরবর্তীকালে কেরি সাহেবের নামে উৎসর্গ করা হয়, এবং এখন কেরি লাইব্রেরি নামেই পরিচিত। ১৯৮৮-র জুলাই মাসে কেরি লাইব্রেরির ১৮৮ বছর পূর্তি হয়েছে।

মিশন প্রেসের বই ও অন্যান্য পুঁথি সংগ্রহ করে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটা লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক ছাড়া সাধারণ লোককেও বই পড়ার সুযোগ দেওয়া হত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রন্থাগারটির বিলুপ্তি ঘটে। গ্রন্থাগারের কিছু বই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরাই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। তবে কলেজের অনেক বই লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এর লাইব্রেরি, লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (আফ্রিকা ও প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র) এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতেও দান করা হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম আধুনিক গ্রন্থাগার ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটি। তবে প্রথম দিকে কোনও ভারতীয়কে এই গ্রন্থাগারের সভ্য করা হত না। পরে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ সভায় ভারতীয়দের সভ্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। জওহরলাল নেহরু রোড ও পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটিকে তোমরা এখনও দেখতে পাবে।

এ-দেশে গত শতাব্দীতে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রন্থাগারের চাহিদা বাড়ল, এবং সেই অভাব পূরণ করতে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। সেই গ্রন্থাগারটি ক্রমশ বড় হয়ে এখন ভারতের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেকালের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মতো এখানেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানী-গুণী ছাত্র-অধ্যাপক এই গ্রন্থাগারে পড়তে আসেন। এমনকী, ভারতবিদ্যায় আগ্রহী বিদেশী ছাত্র-অধ্যাপকদেরও আসতে হয় এই গ্রন্থাগারে, নিজ-নিজ বিষয়ে জ্ঞান-পিপাসা মেটাতে। এই ন্যাশনাল লাইব্রেরির একটি শিশু বিভাগও আছে—ছোট-ছোট টেবিল চেয়ার, রং-বেরঙের বই দিয়ে সাজানো।

এদেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রন্থাগারের চাহিদা বেড়েই চলেছে। গত শতাব্দীতে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি একা সব মানুষের বই পড়ার চাহিদা মেটাতে পারেনি। সেজন্য শহরে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় শিক্ষিত সমাজ একত্র হয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিল—চৈতন্য লাইব্রেরি, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, রামমোহন লাইব্রেরি প্রভৃতি তাদের অন্যতম। কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও মূল্যবান সংগ্রহ নিয়ে সাধারণের পড়ার জন্য গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে—উত্তর কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরি, দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারেও একটি শিশু বিভাগ আছে, এখানেও নানা রঙের ছোট-ছোট চেয়ার-টেবিল, আর তোমাদের পড়ার জন্য নানা বিষয়ের উপর প্রচুর বই আছে।

কলকাতার নানা জায়গায় কয়েকটি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবন

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার

বিশেষ শিশু গ্রন্থাগারও আছে, যেমন শেক্সপিয়র সরণিতে শ্রীঅরবিন্দ ভবন, জওহরলাল নেহরু রোডে নেহরু মিউজিয়ামের পাশে নীতিশচন্দ্র লাহিড়ী চিলড্রেন্স লাইব্রেরি প্রভৃতি।

সেকালে শহরে যখন এইভাবে বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠছিল, শহর থেকে দূরে গ্রন্থাগারে উৎসাহী ধনী অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে একের পর এক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। তাদের অন্যতম হচ্ছে মেদিনীপুর, হুগলি, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর, মাহেশ, কোন্নগর, উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো। এই মফস্বল গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি—স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে একটি সুরম্য গ্রন্থাগার ভবনও নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারটির নামকরণ হয়েছে জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। দুষ্প্রাপ্য বই ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারটি দেশী ও বিদেশী জ্ঞানী-গুণী মহলে আজও বিশেষভাবে সমাদৃত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলোকে জনসাধারণের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হত। উৎসাহী গ্রামবাসীরাও গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের যথাসাধ্য অর্থ দান করতেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের সরকার দেশে গ্রন্থাগার প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। গ্রন্থাগার আইন পাশ করে নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করা হচ্ছে, আর পুরনো গ্রন্থাগারগুলোকেও অর্থ সাহায্য করে পাঠক সমাজের আরও প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে। রাজধানী দিল্লিতে দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বড় বড় সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে। রাজ্য সরকারও আইন করে প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও প্রতি জেলার সদরে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে—আর এইসব গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রসারের কাজ চলছে। একালে গ্রন্থাগারগুলো সমাজের এক বিশেষ অংশ। সুনাগরিক গঠনে গ্রন্থাগারগুলোর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা ছাড়াও দেশবাসীকে সমাজের আরও প্রয়োজনীয় করে তুলতে দেশ জুড়ে গ্রন্থাগার প্রসারের কাজ চলছে। আর তোমাদের পড়ার জন্য প্রত্যেক স্কুলে গ্রন্থাগার তো আছেই।

ভাল-ভাল বই পড়লে আনন্দ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মনের বিকাশও ঘটে। আর বই পড়ার রহস্যটা কী জানো? বইয়ের যে পাতাটা পড়ছ তার পরের পাতাতেই হয়তো এমন একটি তথ্য থাকতে পারে, যা তুমি কোনওদিন শোনোনি; আর নতুন কিছু জানলে মনটাও খুশিতে ভরে যায়। আবার বইয়ের কোনও পাতায় এমন একটি উপদেশ-বাণী পেয়ে গেলে, যা তোমাকে সারাজীবন একজন আদর্শ মানুষ হয়ে চলার প্রেরণা দিয়ে যাবে। বইয়ের মতো সারাজীবনের নিঃস্বার্থ সঙ্গী ও সৎ বন্ধু আর কিছুই নেই।

ফোটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

রবার্ট ওয়াট্সন ওয়াট

চঞ্চল পাল

রবার্ট ওয়াট্সন ওয়াট

১৯৩৪ সাল। জার্মানিতে ক্ষমতায় এলেন এডল্ফ হিটলার। ভীতি ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়তে লাগল আশপাশের দেশগুলিতে। কারণ হিটলারের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছিল। তা ছাড়া হিটলার জার্মানি সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানোর দিকে বেশি নজর দিচ্ছিলেন। বিশেষত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল কীভাবে যুদ্ধের কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা শুরু হয়েছিল জার্মানিতে। তাই এ-ব্যাপারে নানারকম গুজবও ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা ইউরোপে। এইসব গুজবের একটি বেতারতরঙ্গ নিয়ে।

বহু দূর থেকে এক ধরনের বেতারতরঙ্গ ছুঁড়ে ঘর-বাড়ি, সাঁজোয়া বাহিনী বা এরোপ্লেন ধ্বংস করে দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে জার্মানি—এই গুজব যখন ইংল্যান্ডে পৌঁছল তখন ব্রিটিশ সরকার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কারণ ব্রিটিশদের ওপর হিটলারের ভয়ানক রাগ। তাই বেতারতরঙ্গের এই কৌশল আগেভাগেই জেনে না নিলে ইংল্যান্ডকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্রিটিশ গুপ্তচরবাহিনী এ-ব্যাপারে কোনও খবরই জোগাড় করতে পারল না।

ফলে, বাকি রইল আর একটি মাত্র বিকল্প। গবেষণা করে এই কৌশল নিজেদেরই আবিষ্কার করে নিতে হবে। ইংল্যান্ডে বেতারতরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করছিলেন যেসব বিজ্ঞানী তাঁদের মধ্যে রবার্ট ওয়াট্সন ওয়াট ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। তাই এ-কাজে ডাক পড়ল তাঁরই।

রবার্ট খাঁটি ব্রিটিশ নন। তাঁর জন্ম স্কটল্যান্ডে। কিন্তু হিটলারের উত্থান যে সারা পৃথিবীতে সর্বনাশ ডেকে আনবে সে-কথা তিনি অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন। তাই ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব তিনি সানন্দে মেনে নিলেন। কিন্তু বেতারতরঙ্গ নিয়ে এতকাল নাড়াচাড়া করে তিনি বুঝেছিলেন যে, আর যাই হোক কোনও জিনিসকে দুমড়েমুচড়ে দেওয়ার শক্তি বেতারতরঙ্গের নেই। অর্থাৎ, জার্মানির বেতার-অস্ত্রটি নিছক গুজব। অথচ এই সত্যটি এখন বললে ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাসই করবে না। তারচেয়ে বরং এমন-কিছু বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে যা পরোক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

শুরু হল রবার্টের গবেষণা। কিন্তু এর জন্য বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হল না। কারণ বেতারতরঙ্গের একটি প্রয়োগ নিয়ে কয়েক বছর ধরে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন রবার্ট। তিনি লক্ষ করেছিলেন, বেতারতরঙ্গ কঠিন বস্তুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ঠিক শব্দের প্রতিধ্বনির মতোই। এই প্রতিধ্বনি ধরার জন্য যদি শক্তিশালী গ্রাহকযন্ত্র তৈরি করা যায় তা হলে প্রতিফলকটি কোথায় আছে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, আকাশের একদিক তাক করে শক্তিশালী বেতারতরঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া হল। সেইসময় আকাশের সেই দিকে যদি কোনও বিমান চলাচল করে তা হলে বেতারতরঙ্গ সেই বিমানে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু প্রতিহত বেতারতরঙ্গ ধরতে পারলে আর এ-কাজ বিন্দুমাত্র শক্ত নয়।

এই পরিকল্পনা নিয়ে রবার্ট গেলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। সব শুনে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তার ওপর জার্মানির বেতার-অস্ত্র যে গুজব, সে-কথা বুঝতে পেরে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরা রবার্টকে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই বেতার-প্রতিধ্বনি যন্ত্রটি তৈরি করে ফেলতে। কিন্তু কাজটা যে খুবই গোপনে সারতে হবে তাও তাঁরা বলে দিলেন। বার্মিংহাম থেকে কিছুটা দূরে একটি জনহীন জঙ্গলে রবার্ট শুরু করলেন তাঁর কাজ। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার।

জায়গাটার নাম ড্যাভেন্ট্রি। জঙ্গলাকীর্ণ হলেও জায়গাটা লোকালয় থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ইচ্ছে করেই এমন জায়গা বেছে

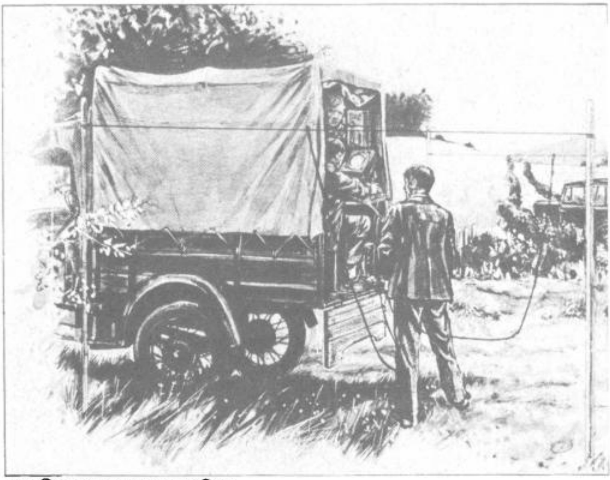

ড্যাভেন্ট্রির জঙ্গলে প্রথম রাডারের এরিয়েল

নেওয়া হয়েছিল। কারণ রবার্ট ও তাঁর দলবল যে গাড়িতে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে যেতেন তার গায়ে লেখা থাকত 'বনভোজন ও শিকারের জন্য'। আশপাশের গ্রাম থেকে দু-একজন কাঠুরে আর মেষপালক পরীক্ষার জায়গায় এসে পড়েছিল। এদিক-ওদিক বাঁশ, তার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকতে দেখে তারা নানারকম প্রশ্ন করত। রবার্ট আর দলের লোকজন একটু বিরক্ত না হয়ে জবাব দিতেন, "আমরা পাখি ধরার নতুন ফাঁদ তৈরি করছি।" এতে সাধারণ লোক বিন্দুমাত্র সন্দেহ করত না, কারণ শহরের মানুষ শিকার বা বনভোজন করতে গেলে শহরের উপকণ্ঠে কোনও নির্জন জায়গাই বেছে নেয়।

একেই তো বেতারতরঙ্গ নিয়ে রবার্ট কাজ করেছেন বহুকাল ধরে, তার ওপর এই রোমাঞ্চকর পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। তাই প্রাথমিক কাজ শেষ করতে রবার্টের লাগল মাত্র ছ' সপ্তাহ। প্রথমে তিনি একটি শক্তিশালী বেতার প্রেরক যন্ত্র তৈরি করলেন। এই যন্ত্র থেকে সেকেন্ডে এক হাজার বেতারতরঙ্গের স্পন্দন বের হত। তারপর তিনি এমন একটি গ্রাহকযন্ত্র তৈরি করলেন যাতে প্রতিহত বেতারতরঙ্গ ফিরে এলেই একটা আলো জ্বলে ওঠে। এই আলোটা জ্বলে উঠত গোল একটা পরদার ওপর। পরদার ঠিক কোন জায়গায় আলোটা জ্বলবে তা নির্ভর করত প্রতিফলকটি কোন্ দিকে কত দূরে আছে তার ওপর। তাই এই গ্রাহক যন্ত্রটির নাম দেওয়া হল 'রেডিও ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং'—সংক্ষেপে 'রাডার'। সব-কিছু নিখুঁতভাবে তৈরি হওয়ার পরেও কোথাও একটা গোলমাল রয়ে যাচ্ছিল। বোঝা গেল, গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েল বা অ্যানটেনাকে আরও উঁচুতে তুলতে হবে।

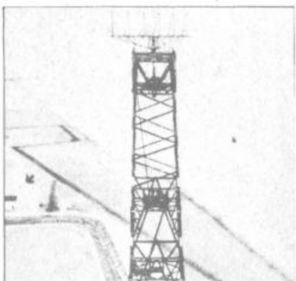

ইংল্যান্ডের সমুদ্রের ধারে রবার্টের তৈরি 'রাডার টাওয়ার'

এরিয়েল বলতে দুটো লম্বা বাঁশের ডগায় একটি তামার তার আড়াআড়িভাবে আটকানো। একদিন সন্ধেবেলা এরিয়েলটিকে উঁচুতে তোলার সময় হঠাৎ গ্রাহকযন্ত্রে ফুটে উঠল একটা উজ্জ্বল আলোর ফুটকি। রাডারের পরদার হিসেব অনুযায়ী প্রতিফলকটি প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে। ক্রমশ বিন্দুটি উজ্জ্বলতর হতে লাগল আর পরদার কেন্দ্রের দিকে সরে আসতে লাগল। বোঝা গেল, প্রতিফলকটি একটি বিমান হতে পারে। সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে কিছুক্ষণ পরে বিমানটি মাথার ওপর এসে পড়ার কথা। কয়েক মিনিট কেটে গেল নিঃশব্দে, সকলেই নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইলেন পরদার দিকে। এমন সময় দিগন্তের কাছ থেকে ভেসে এল গোঁ-গোঁ শব্দ আর একটি বিমান মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। উত্তেজনায় সকলে চিৎকার করে উঠলেন। প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

এখানেই থেমে রইলেন না রবার্ট। কয়েকদিনের মধ্যে আরও শক্তিশালী রাডার তৈরি হয়ে গেল। এবার সেই রাডারের পাল্লা হল ১২০ কিলোমিটার। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে আর রবার্টের তত্ত্বাবধানে ইংল্যান্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূল জুড়ে তৈরি হতে লাগল অনেকগুলি রাডার-কেন্দ্র। ১৯৩৯ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল তখন বলা যায় ইংল্যান্ড রাডারের সাহায্যে পরোক্ষভাবে সুরক্ষিত হয়েই ছিল। শুধু মাটিতেই নয়, যুদ্ধজাহাজ আর যুদ্ধবিমানেও রাডার যন্ত্র লাগানো হতে লাগল। কিন্তু এর মূল কলাকৌশলের মধ্যে ছিল নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা। মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত লোককে নির্বাচন করা হত এই রাডার চালানোর জন্য। এমনকী, রাডারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি হত বিভিন্ন কারখানায়। যাতে কারখানার লোকেরা সম্পূর্ণ রাডার যন্ত্রের নকশা বুঝতে না পারে তাই বহু চেষ্টা করেও জার্মান গুপ্তচররা এ-ব্যাপারে বিশেষ কোনও খবর জোগাড় করতে পারেনি।

প্রথম যখন রবার্ট ওয়াট্সন ওয়াট ড্যাভেন্ট্রির জঙ্গলে রাডার তৈরি করেন তখন ১৯৩৫ সাল। তাঁর বয়স তখন ৪৩। কিন্তু বিশ্ববাসী তাঁকে চিনল আরও প্রায় এক দশক পর। কারণ প্রতিরক্ষার স্বার্থে তাঁর গবেষণা বিস্তারিতভাবে কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর পর থেকে জীবনের শেষ দিন (১৯৭৩) পর্যন্ত তিনি শ্রেষ্ঠ রাডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাক পেয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

সাঁতারু সঞ্জীবন

তানাজি সেনগুপ্ত

সময়টা বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি। বহরমপুরের ভাগীরথীর তীরে গোরাবাজার ঘাট তখন ভিড়ে উপচে পড়ছে। এরই মাঝে জল থেকে উঠে এলেন সঞ্জীবন মণ্ডল। বয়স তিরিশ বছর, গায়ের রং শ্যামলা। চেহারা দেখে মনে হল, এখনই বোধহয় একবার ভাগীরথী এপার ওপার করে এলেন, প্রায়ই যা স্থানীয় ছেলেরা করে থাকে। চোখ শুধু একটু লাল হয়েছে এই যা।

বস্তুত, সেদিন সঞ্জীবন ৮১ কিলোমিটার পথ সাঁতরে এলেন। প্রথম হলেন মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সন্তরণ প্রতিযোগিতায়। সঞ্জীবন সমেত আরও ১৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বী জলে নেমেছিলেন ভোর পাঁচটায়, জঙ্গিপুর ব্যারেজ বা আহিরন থেকে। সঞ্জীবন সময় নেন ১১ ঘণ্টা ৪ মিনিট ০৬ সেকেণ্ড। একটু পিছনেই ছিলেন সঞ্জীবনের অনেকদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী খগেন্দ্রনাথ দত্ত। খগেনই দ্বিতীয় হন। অন্যদের কাছে এই সাঁতার কষ্টসাধ্য হলেও, সঞ্জীবনের কাছে তা খুব একটা কষ্টের ছিল না। কারণ, এই নিয়ে পর-পর তিনবার এখানে তিনি জয়ী হলেন।

নদীয়ার রানাঘাটের ছেলে সঞ্জীবন। সেখানকার স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের গর্ব তিনি। রানাঘাট থেকে সঞ্জীবনের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ওঁর জয়ে খুব খুশি হলেও, সঞ্জীবন নিজে কিন্তু একেবারেই উচ্ছ্বসিত নন। কেন? এত বড় একটা জয়ের পর খুব আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু উলটে তাঁকে বিষাদগ্রস্তই মনে হল। সঞ্জীবন জানালেন, "আনন্দিত হব কী করে বলুন? আমি বহুদিন ধরে সাঁতার কাটছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা চাকরি পেলাম না। অনেক জায়গায় বিজয়ী হয়েছি, এখানেও কমবার জিতিনি, কিন্তু আমার খোঁজ কেউ নেয় না। সুতরাং আনন্দিত হয়ে কী করব? এই আনন্দের কোনও দাম আছে?"

মন্ত্রীসহ বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন সঞ্জীবন, প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন হাজারো, কিন্তু চাকরি এখনও গভীর জলে। বাধ্য হয়েই ছোট একটা তাঁত চালিয়ে সংসার চালাতে হয় তাঁকে। মাসিক আয় অতি সামান্য। কেননা, সারা বছর কাজও থাকে না। খুব বেশি হলে মাসে তিনশো টাকা হাতে আসে। সঞ্জীবন বিবাহিত, দু'টি ছেলে এবং দু'টি মেয়ে তাঁর। মোট ছ'জনের সংসারে ওই টাকায় কী হয় তা সহজেই অনুমেয়।

সংসারই যেখানে চলে না, সেখানে নিজের জন্য আলাদা খাওয়া-দাওয়ার যে প্রশ্নই আসে না তা বলা বাহুল্য। অথচ কে না জানে পরিশ্রমসাধ্য খেলায় কিছু অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাবার প্রয়োজন। সঞ্জীবন হাসতে হাসতে জানালেন, "ছোলাই জোটে না, তো অন্য খাবার।" স্থানীয় ক্লাব অবশ্য তাঁর সাহায্যার্থে যতটা পারে এগিয়ে এসেছে।

সঞ্জীবন ১৯৭৫ সাল থেকে বহরমপুরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। কখনও প্রথম, কখনও বা দ্বিতীয় হয়েছেন। এ ছাড়া কাটোয়া এবং ভারতের অন্যান্য নানা জায়গা, যেমন গুজরাতেও প্রতিযোগিতায় গেছেন তিনি। সাধারণ সাঁতারের চেয়ে দীর্ঘ সন্তরণের প্রকৃতি যেহেতু আলাদা, তার জন্য কি আলাদা কোনও প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি? সঞ্জীবন জানান, "আলাদা কোনও প্রস্তুতি আমি নিই না। পুকুরে ও নদীতে সাঁতরাই, সেটাই আমার প্র্যাকটিস। তবে প্রতিযোগিতার আগের কিছুদিন একটু মন দিয়ে সাঁতরাই এই আর কী!"

সঞ্জীবনের ইচ্ছে, পর-পর পাঁচবার ভাগীরথীর বুকে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার। বারবার বিজয়ী হলেও আরও একটা লাভ আছে অবশ্য সঞ্জীবনের। এখানে জয়ী হলে পুরস্কার হিসেবে যা দেওয়া হয় তার মূল্য একেবারে কম নয়। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, এবারে ৮১ কিলোমিটারের বিজয়ী সঞ্জীবনকে যে সোনার মেডেলটি দেওয়া হবে তার আর্থিক মূল্য সাড়ে তিন-চার হাজার টাকা। সঞ্জীবন মেডেলটি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দেবেন এবং যা পাবেন, তা দিয়ে কিছুদিন তো সংসার চালাতে পারবেন! শুধু এবারই নয়, সঞ্জীবন এটা বরাবরই করেন। মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে, বিষণ্ণভাবে সঞ্জীবন বললেন, "আমার বাড়িতে কোনও মেডেলই নেই। সব বিক্রি করে দিয়েছি।" সত্যিই মেডেল দিয়ে তো আর পেট ভরবে না!

নিজে যা করেছেন করেছেন, ছেলেকে এই দীর্ঘ সাঁতারের জগতে আনতে নারাজ সঞ্জীবন। বললেন, "নেশা। তাই আমি এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। ছাড়তে পারছি না। কিন্তু ছেলেকে অন্য যে খেলাতেই হোক, সাঁতারে কিছুতেই আসতে দেব না।"

এতদিন ধরে দূরপাল্লার সাঁতার দেওয়ার অভিজ্ঞতা আপনার, ইংলিশ চ্যানেল পেরনোর কথা ভাবলেন না কেন? এই প্রশ্নটা করা হয়নি সঞ্জীবনকে, বলা যায় লজ্জাতেই করতে পারিনি। এইসব প্রশ্ন করার অধিকার কি ইতিমধ্যেই আমরা হারিয়ে ফেলিনি?

ফোটো : কিশোর রায়চৌধুরী

আমি

সম্বরণ ব্যানার্জী

'বম্বেতে জন্মালে ও অবশ্যই টেস্ট খেলত'—বলেছিলেন এক প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার। টেস্ট খেলা তো দূরের কথা, বাংলা ও পূর্বাঞ্চল দলে প্রায়ই অবিচার ও উপেক্ষার শিকার হতে হয় সম্বরণ ব্যানার্জিকে। গতবারের রনজি-অধিনায়ক এবারের মরসুমের প্রথমেই বাদ! উপেক্ষিত সম্বরণ এবারের 'আমি'।

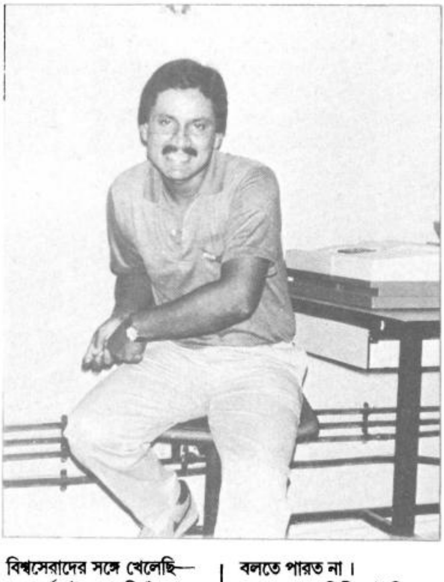

জন্মেছি
১৯৫৪ সালের ১৬ নভেম্বর। অসমের করিমগঞ্জে।
থাকি
গড়িয়া, সাউথ এন্ড গার্ডেনে।
ভাইবোনদের মধ্যে
সবচেয়ে ছোট।
আমার একমাত্র ছেলে
বাবাই, ভাল নাম সায়ন্তন।
ঘনিষ্ঠদের কাছে যে নামে পরিচিত
মাধু!
খেলায় উৎসাহ পেয়েছি
দাদা, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।
কলকাতা-মাঠে ক্রিকেট খেলছি
দু' দশকেরও বেশি, ১৯৬৭ সাল থেকে।
রনজি ট্রোফি খেলছি
১৯৭৩ থেকে। প্রথম ম্যাচ অসমের সঙ্গে।
ক্রিকেট শুরু করেছিলাম
উইকেটরক্ষক হিসেবে।
সেরা ক্যাচ নিয়েছি
বলা মুশকিল। একটা ভাল ক্যাচ নেওয়ার পর পরেরটা মনে হয়েছে আরও ভাল।
সেরা স্টাম্পড করেছি
আমেদাবাদে অশোক মানকড়কে। দিলীপ দোসির বলে লেগ সাইডে। মরসুমটা '৭৬-'৭৭। অশোক বা দিলীপ কেউই কিছু বোঝেনি প্রথমে। বুঝেছিলাম আমি আর আম্পায়ার।
সেরা ব্যাটিং
১৯৮১-তে দিলীপ ট্রোফিতে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে। ৮০ রান করেছিলাম দিল্লির মাঠে। খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম।
সেরা ম্যাচ
রনজি ট্রোফি। বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। ১৯৭৫ সালে কলকাতায়। প্রবল লড়াই করেও আমরা হেরে যাই। ওই ম্যাচেই আমি সবার নজরে আসি।
সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা
আশি সালে কলকাতায় ডবল উইকেট টুর্নামেন্টে বিশ্বসেরাদের সঙ্গে খেলেছি—সোবার্স, ইমরান, মিয়াঁদাদ গাওস্কর, লিলি, গার্নার, হোল্ডিং— অনেকের সঙ্গে।
মজার ঘটনা
দোসির সঙ্গে খুব মজা করতাম। ও ভীষণ ফিটফাট। যখন ব্যাট করতে নামত, আমি ব্যাটে চিকলেট লাগিয়ে রাখতাম, ড্রেসিং রুমে ব্যাট সরিয়ে রাখতাম। রেগে গেলেও কিছু বলতে পারত না।
আর একবার দিলীপ ট্রোফি ফাইনালে বোম্বাইয়ে আমরা প্রায় হারের মুখে। ক্রিজে আমি, আর অনিল ভরদ্বাজ। অনিল এমন ছটফট করে ব্যাট করছিল যে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধ হয় ওকে কোথাও যেতে হবে। আমি গম্ভীর হয়ে চেঁচিয়ে ওকে বললাম, "তোমার চিন্তা নেই। আমাদের কলকাতার টিকিট কাটা আছে। কাল সন্ধেয়।" সবাই শুনে হেসে ফেলে। অনিল অবশ্য লজ্জা পেয়ে ছটফটানি বন্ধ করে।
দুঃখের ঘটনা
অনেক, অজস্র। কতবার যে দল থেকে বাদ পড়েছি কারণ ছাড়াই। তবে সবচেয়ে বাজে লাগছে এবারে দেওধর ট্রোফিতে বাদ পড়ে। খুব প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।
আর কতদিন ক্রিকেট খেলব
খেলে যতদিন আনন্দ পাব।
জুনিয়ারদের জায়গা ছাড়ছি না কেন
কেন ছাড়ব? আমাকে কেউ ছেড়েছিল? নতুন কেউ এসে আমার জায়গা ছিনিয়ে নিক না, ভাল খেলে। সবচেয়ে আগে আমি গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাব।
কীভাবে এখনও নিজেকে ফিট রেখেছি:
প্র্যাকটিস। যে কোনও সাধারণ ক্রিকেটারের চেয়ে দু' তিন ঘণ্টা বেশি অনুশীলন করি।
খেতে ভালবাসি:
ইলিশ মাছ। তন্দুরি, চিকেন।
যাঁকে স্টাম্পড করে সবচেয়ে খুশি হয়েছি:
গাওস্কর।
যাঁকে স্টাম্পড করতে পারলে খুশি হতাম:
ভিভ রিচার্ডস।
প্রিয় ক্রিকেটার
সুনীল গাওস্কর।
আদর্শ ক্রিকেটার
অ্যালান নট।
আমার শখ
খেলা এবং রাজনীতির বই পড়া।
বাংলার সেরা সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার
সৌরভ গাঙ্গুলি, অভিজিৎ চ্যাটার্জি, সঞ্জয় দাস।
স্বপ্ন দেখি
দেখতাম—ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলছি। ক্রিজে আমি, কপিল। বল করছেন উইলিস। এখন আর দেখি না। সব কেমন গুলিয়ে গেছে।

ফোটো সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

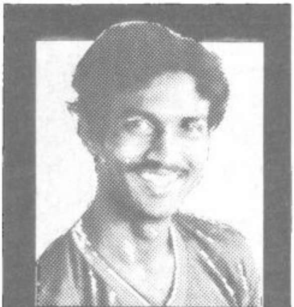

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

প্রথম বছরের সাফল্য দ্বিতীয় বছরে আমাকে পাকাপাকিভাবে ইস্টবেঙ্গল দলে স্থান করে দিল। ১৯৭২ সালে ত্রিমুকুট জয়ের সাফল্য, আবার বলি আমার একার নয়, সামগ্রিকভাবে সবার, ইস্টবেঙ্গল দলের। শ্রীমানীদা খুব খুশি হয়েছিলেন, কেননা তিনিই আমাকে সই করিয়েছিলেন। ১৯৭৩-এ উনিই আমাকে থাকতে বললেন, দল বদলানোর কোনও ইচ্ছা আমারও ছিল না, এত ভাল এক ঝাঁক ফুটবলারকে আমিই-বা কেন ছেড়ে যাব ? আমার পেমেন্টও বাড়িয়ে দিল ক্লাব।

১৯৭৩-এ আমাদের দলে এল সুভাষ ভৌমিক। ভৌমিক আগের কয়েকটা বছর কাটিয়েছে মোহনবাগানে, সময় একেবারেই ভাল যায়নি, প্রায় অপমান করেই মোহনবাগান ওকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের এখানে এসে কী দুরন্ত ফুটবলটাই না খেলল ও ! ডাকাবুকো ভৌমিক একসময় মাতিয়ে দিয়েছিল কলকাতার দর্শকদের। মোহন সিং চলে গেল ইস্টবেঙ্গল থেকে। কেন গেল জানি না। আর্থিক সমস্যা, নাকি আমি থাকায় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা ওকে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, তা বলতে পারব না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কমল ঠিকই, কিন্তু সত্যি বলছি, ও চলে যাওয়ায় আমি দুঃখও পেয়েছিলাম। একসঙ্গে এক বছর তো দু'জনে খেলেছি, পিণ্টু ছাড়া মোহন-ই তো আমার প্রথম বছরের বড় ক্লাবের পার্টনার।

মোহনের দুর্ভাগ্য, ও বেশিদিন খেলতে পারল না। ১৯৭৩-এ মোহনবাগানে গিয়েও সেরকম সাফল্য পায়নি, লিগে আমাদের বিরুদ্ধে যদিও একটা গোল করেছিল। তারপর তো প্রায় হারিয়েই গেল ময়দান থেকে। শুনেছিলাম, ওর পায়ে একটা বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপর থেকেই ওর খেলা খারাপ হতে থাকে। দুঃখের ব্যাপার, মোহনের প্রতিভা থাকলেও তা ঠিক ফুটে উঠতে পারল না।

মোহনকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে ১৯৭২-এ, এক বছরই দেখেছি। এক বছর দেখে কারও সম্বন্ধে মন্তব্য করা যায় না। তবু মোহন সম্বন্ধে বলতে পারি এই কারণেই যে, ওর সঙ্গে আমি শুধু এক দলেই খেলিনি, যখন খেলেছি পাশাপাশিই খেলেছি। তাই ওর খেলাটা দেখেছি খুব কাছ থেকে।

মোহন দেখতে যেমন সুন্দর ছিল, ওর খেলাটাও তেমনই ছিল চমৎকার। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ডান পায়ে ওর যা কাজ ছিল, আমি ক'জনের মধ্যে তা দেখেছি, শুনে বলতে পারব। ওর একটা সোলো ডজ ছিল, তাকিয়ে দেখবার মতো। ছোট্ট জায়গার মধ্যে কাটাতে পারত দারুণ। লিঙ্ক হাফ খেলার আদর্শ খেলোয়াড় ছিল ও। যেমন দ্রুত আক্রমণে উঠত তেমনই আবার পেছনে নেমে আসতও খুব তাড়াতাড়ি। এত ভাল ফুটবল 'সেন্স' যে বলার নয়।

মোহনের একটা ব্যাপারই কম ছিল বলে আমার মনে হয়। লড়িয়ে মনোভাব বা জয়ের উদগ্র চিন্তা ওর খুব ছিল না। এজন্যই বোধহয় ওর ফুটবল-জীবনটাও খুব একটা বড় হল না।

মোহনের সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচটাই বেশ স্মরণীয়। '৭২-এ মহমেডান ম্যাচের কথা আগেই লিখেছি। ওই ম্যাচে মাঝমাঠে আমি আর মোহনই দাঁড়িয়েছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই, ওর সাহায্য ও পরামর্শ না পেলে ওইদিন আমি কতটা সাফল্য পেতাম সন্দেহ আছে।

অনেক খেলোয়াড়কে দেখেছি, সিনিয়ার হয়ে গেলে এমন একটা হাব-ভাব করে যেন নতুন খেলোয়াড়রা কিছুই জানে না। এটা ভুলে যায়, তারাও একদিন নতুন ছিল। এদের দাপটে, অনেক উদীয়মান ফুটবলারও ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে খেলার বারোটা বাজায়। অভিজ্ঞতার দিক থেকে মোহন আমার সিনিয়ার ছিল। ও আর পিণ্টু খেলে এসেছিল প্রি-ওলিম্পিক ফুটবল। খেলেও ছিল খুব ভাল। অহঙ্কারে ওর পা পড়া উচিত ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি।

মোহনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ওর ভদ্রতাবোধ ও খেলোয়াড়ি মানসিকতা। ১৯৭২ সালেরই একটা ঘটনা বলি। জাতীয় ফুটবলে সন্তোষ ট্রোফির খেলা হচ্ছে গোয়ায়। হাবিব বাংলার অধিনায়ক। দলে নির্বাচিত হয়েছিলাম আমি, মোহন দু'জনেই। মোহন খেলছিল, একটা ম্যাচে হাবিব হঠাৎ আমাকে নামাল। মোহনকে বসতে হল। খেলার ইচ্ছা আমার, কিন্তু মোহনের জায়গায়, ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। ব্যাপারটাকে একদম হালকা করে দিল মোহনই। খেলার আগে আমাকে এসে বলল, "ফ্রেন্ড, তুমি কিছু মনে কোরো না। একদিন না হয় তোমার জায়গায় আমি খেলে দেব, তা হলেই তো হল ? আজ তুমি দেখাও বাংলার খেলোয়াড়রা আমরা কেউ কম নই।" আমি জানতাম, মোহন মনে মনে দুঃখ পেয়েছিল, কিন্তু ওর এই কথা আমার খুব ভাল লাগল। খেলার শেষে তাই আমি ছুটে গিয়েছিলাম প্রথমে মোহনেরই কাছে। বলেছিলাম, "ফ্রেন্ড, বাংলার মান রাখতে পেরেছি তো ?"

এইসব ঘটনা অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ। কিন্তু এইসবই চিনিয়ে দেয় একজন প্রকৃত খেলোয়াড়কে। এরকম সতীর্থর কথা বলতেও ভাল লাগে। তাই এতদিন পর মোহন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার নিজেরই খুব আনন্দ হচ্ছে।

তিয়াত্তরে আগেই বলেছি, দল প্রায় একই ছিল। কিন্তু কী-এক অজ্ঞাত কারণে ইস্টবেঙ্গল কিছুতেই ভাল খেলতে পারছিল না। প্রদীপদা চেষ্টা করছেন, বড়ে মিঞার মতো লড়াকু প্লেয়ার আছে, আছে সুধীর, পিণ্টু, সুভাষ, স্বপন তবু আমরা লিগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলাম। ওদিকে মোহনবাগান, আহামরি দল না হলেও বেশ ভাল খেলছে। তাই লিগে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচের আগে টেনশন একেবারে চরমে উঠল।

কিন্তু আমরা একেবারে দাঁড়াতেই দিলাম না ওদের। সুভাষ আর হাবিব গোল করল, মোহন একটা শোধ করেছিল। গোলমাল বাধল সুপার লিগের ম্যাচে। মারামারি, ইট ছোঁড়াছুঁড়ি ইত্যাদি ঘটনায় কলঙ্কিত হয়েছিল কলকাতার ফুটবল। সুভাষের গোলে আমরা

শিল্ড ফাইনালের আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা

জিতেছিলাম ঠিকই, কিন্তু ম্যাচটার কথা ভাবলে এখনও লজ্জা পাই।

লিগ জয়ের পর শিল্ডের সেমি-ফাইনালে আমরা আবার পেলাম মোহনবাগানকে। গুঁড়িয়ে দিলাম একেবারে, পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে তিন গোল দিলাম। সেদিন ডিফেন্সে নইম না থাকলে আরও গোল খেত মোহনবাগান।

ফাইনালে আমাদের সামনে পড়ল উত্তর কোরিয়ার বিখ্যাত পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব। দলে ওদের ছ'জন জাতীয় খেলোয়াড়। শিল্ড কি এবারে তা হলে বিদেশে যাবে ? আমাদের ওপর আর-একটা চাপও ছিল। ১৯৭০ সালে ইরানের প্যাস ক্লাবকে হারিয়েছিল লাল-হলুদ জার্সি-পরা এগারোটি ছেলে। এবার, আমরা কি লাল-হলুদ এবং দেশের সম্মান রাখতে পারব ?

আমাদের নিজেদের ওপর আস্থা অবশ্য কম ছিল না। প্রদীপদার কোচিং-এ আমরাও তৈরি হলাম। খেলার দিন দুপুরে অপ্রত্যাশিত আঘাত এল অন্য জায়গা থেকে। ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম স্তম্ভ সুধীর ডাক্তার নিয়ে টেন্টে হাজির। কলেরার মতো অবস্থা। ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না। সুধীর খেলতে পারবে না ? তা হলে মাঠে আমরা দাঁড়াব কী করে ? ডাক্তার নৃপেন দাস, ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম কর্মকর্তা, ওকে দেখে ওষুধ দিলেন। শেষ চেষ্টা, যদি নামানো যায়।

শুধু ইলেকট্রাল জল খেয়ে সুধীর মাঠে নামল। গর্জে উঠল ইস্টবেঙ্গল মাঠের দর্শকরা। আমরা বুঝলাম, সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। খেলা শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা আক্রমণে গেলাম। পাঁচ মিনিটের মাথায় আকবর গোল করে দিল, দশ মিনিটে সুভাষ। দুরন্ত গোল, তিন চারজনকে হেলায় টলিয়ে ভৌমিক গোলটা করেছিল। প্রথম দশ মিনিট আমরা সর্বস্ব উজাড় করে দিলাম।

তারপর শুরু হল ওদের খেলা। পরের পনেরো মিনিট ফুটবলের ভেলকি দেখিয়ে দিল ওরা। আমাদের গোলের পরই আক্রমণে এসেছিল ওরা। গোলের ১৫ গজ দূর থেকে শট করেছিল একজন স্ট্রাইকার। বলটা আমার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। বলটা লাগলে, হয়তো বধির হয়ে যেতাম। শটটা ক্রসবারে লেগে ফিরে এল। আমাদের গোলকিপার অরুণ বলের ধারে-কাছে যেতে পারেনি। এর পরের কিছুক্ষণ আমরা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। বল শুধু ওদের পায়ে ঘুরছে। তবে কি আমরা পারব না ? মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড ট্যাক্‌লে একটা বল কাড়লাম আমি, দিলাম হাবিবকে, হাবিব থেকে ভৌমিক, আকবর। আমরা আবার ছন্দ

মোহন সিং *ফোটো : সত্যেন সেন*

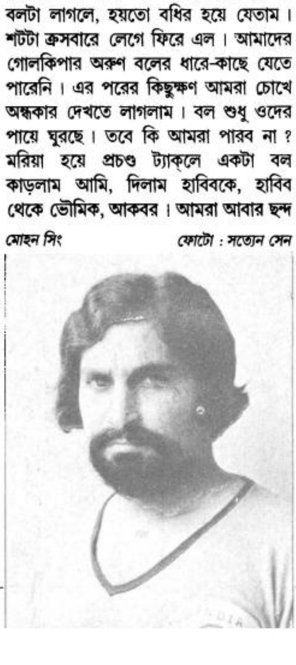

ফিরে পেতে লাগলাম। প্রচণ্ড লড়াই চলতে লাগল।

দ্বিতীয়ার্ধ কিন্তু আমাদের। সারা মাঠের উৎসাহে টগবগ করতে লাগলাম। একটা বল ধরছি, হাজার হাজার কণ্ঠ চিৎকার করে উঠছে। হঠাৎই ওরা অবশ্য ৭২ মিনিটের মাথায় একটা গোল শোধ করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আকবর আবার একটা গোল দেয়। ৩ – ১-এ জিতলাম আমরা।

খেলার শেষ বাঁশি বাজার পরও বিশ্বাস করতে পারিনি, আমরা জিতেছি। তা হলে দেশের সম্মান রাখতে পারলাম। ক্লান্ত শরীর ভেঙে পড়ছে, কিন্তু মন বলছিল আজ প্রয়োজনে আরও নব্বই মিনিট খেলে দিতে পারি। আনন্দে উদ্বেলিত লাল-হলুদ জনতার স্রোত নেমে আসছে আমাদের ভালবাসা জানাতে। কখন যে কার কাঁধে উঠে গেছি মনে নেই, মিনিট-দশেক বোধ হয় আমরা সবাই দর্শকদের কাঁধে-কাঁধেই ঘুরেছি !

কী খেলাটাই না খেলল সেদিন সুধীর। অসুস্থ শরীরেও প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল ও। হাবিব জীবনের অন্যতম সেরা ম্যাচ খেলেছিল সেদিন। ভৌমিক জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেদিন। আকবর, পিন্টু, অশোকলাল কে নয় ?

আর আমি ? লোভ সামলাতে পারছি না। পরের দিনের আনন্দবাজার থেকে তুলে দিচ্ছি, "গৌতম ছোট্ট আকারের ছেলে কিন্তু ফুটবলের আকারের ফুসফুস এবং সিংহের মত কলিজা নিয়ে সে দাপটে রাজত্ব করেছে। পিয়ং ইয়ং খেলোয়াড়রা গৌতম নামটি নিশ্চয়ই মুখস্থ করে নিয়ে দেশে ফিরবে।"

(ক্রমশ)

অনুলিখন তানাজি সেনগুপ্ত

ইংল্যান্ডের নির্বাচকদের দূরদর্শিতা কোথায়

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ইংল্যান্ডকে অ্যাসেজ সিরিজে ৪-০ ম্যাচ হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার

ডেভিড গাওয়ার
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ব্রিসবেনে পৌঁছে প্রথমে যতটা অবাক হলেন, পরে তার চেয়েও বেশি চমকে উঠলেন। বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ বিশাল জনতার তুমুল অভিনন্দন পেয়ে বর্ডার যখন প্রায় শিহরিত, ঠিক তখনই তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজে খেলার জন্য নির্বাচিত ইংল্যান্ড দল থেকে ডেভিড গাওয়ার ও ইয়ান বথামের বাদ পড়ার খবর শুনে।

সত্যিই কি তা-ই ? গাওয়ার ও বথামকে কি ইংল্যান্ডের সত্যিই প্রয়োজন ? ইংল্যান্ড টিমে গাওয়ার, বথামের যোগ্য উত্তরসূরি কি সত্যিই এসে গিয়েছেন ? আসলে, এই দু'জনের বাদ পড়ার ঘটনা থেকেই ইংল্যান্ড দলের ভেতরের সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। লড়াকু একটা দল গড়তে হলে নির্বাচকদের যে দূরদর্শিতা থাকা দরকার, তারই অভাব দেখা যাচ্ছে।

ইংল্যান্ডের লোকেরা সমালোচনা করতে পারলে আর কিছু চায় না। একবার ফর্ম পড়ে গেলে ওদের এই সমালোচনাটা হয়ে ওঠে আরও মর্মান্তিক। যেসব ইংরেজ সাংবাদিক এতদিন বথামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁরাই এখন বথামের পড়তি-ফর্ম দেখে প্রশ্ন তুলেছেন। ইংল্যান্ড দল থেকে তিনি বহিষ্কৃত হওয়ায় এঁরা অনেকেই খুশি। বথাম, গাওয়ার নেহরু কাপ খেলতে ভারতে আসবেন না বলেই দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়ার জন্য তাঁরা দু'জনই আগ্রহী ছিলেন। এই দলে নির্ভরযোগ্য একমাত্র অলরাউন্ডার ডেভিড ক্যাপেল। সাম্প্রতিক অ্যাসেজ সিরিজে বথামের পারফরম্যান্স কি ক্যাপেলের চেয়েও খারাপ ছিল ? হিসেবটা একটু নেওয়া যাক ! তিন টেস্টের চার ইনিংসে বথামের মোট রান ৬২। সর্বোচ্চ ৪৬। গড় ১৫·৫০। বোলিং-এ ২৪১ রানে ৩ উইকেট। পাশাপাশি ক্যাপেল একটি টেস্টে দু'ইনিংস মিলিয়ে রান করেন ২১। গড় ১০·৫০। বোলিং-এ তাঁর সংগ্রহ ১০১ রানে ২ উইকেট। ইংল্যান্ড যে দেশ সফরে যাচ্ছে

ইয়ান বথাম

সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ভিভ রিচার্ডস একবার মজা করে বলেছিলেন, "বথ (বথামের ডাক নাম) যদি ইংল্যান্ড দলে জায়গা না পায়, আমি আন্তিগুয়া সরকারকে বলে ওর এখানে থাকবার ব্যবস্থা করব। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমে বথামের মতো ধুরন্ধর ও ডাকসাইটে অলরাউন্ডার কেউ নেই।"

বথাম সম্পর্কে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি বলেছেন, "ইয়ান যখন খারাপ খেলে, তখন তাকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে কোনও দক্ষ অধিনায়কের পেশাদারি মনোভাব।"

আর ইংল্যান্ড দলে এখানেই গলদ। কখন কাকে অধিনায়ক করা হবে তারই ঠিক নেই। গত ৮ জুন হেডিংলেতে অ্যাসেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড গাওয়ার এ-বছর ইংল্যান্ডের পঞ্চম অধিনায়ক হওয়ার সৌভাগ্য (না কি দুর্ভাগ্য ?) অর্জন করেছিলেন। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে মাইক গ্যাটিং, জন এম্বুরি, ক্রিস কাউড্রে ও গ্রাহাম গুচ অধিনায়কত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পর ওই দায়িত্ব দেওয়া হয় গাওয়ারকে। কিন্তু অধিনায়কত্বের বিরাট চাপে তাঁর মতো নামী ক্রিকেটারও কুঁকড়ে গিয়েছেন বিস্ময়করভাবে। ১৯৮৪-তে ভারতের বিরুদ্ধে ও ১৯৮৫-তে দুর্বল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সহজেই সিরিজ জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হলেন, দলকে উদ্বুদ্ধ করার শক্তিটুকুও গাওয়ারের উবে গেল। শেষ পর্যন্ত এবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও গাওয়ারের দল মুখ থুবড়ে পড়ল। বড় দলের বিপক্ষে অধিনায়কত্বের বড় পরীক্ষায় যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডের সেরা বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান কখনওই জ্বলে উঠতে পারেননি। পারেননি সতীর্থ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সেরা খেলাটা আদায় করে নিতে। গাওয়ারের নেতৃত্বে ৩২টি টেস্টে ইংল্যান্ড জিতেছে মাত্র ৫টি। হেরেছে ১৮টি টেস্টে। কিন্তু ব্যাটসম্যান গাওয়ারের ফর্ম কি ইংল্যান্ড দল থেকে সত্যিই বাদ পড়ার মতো ? পরিসংখ্যান কিন্তু তাঁর পক্ষেই রায় দিচ্ছে ! সাধারণভাবে গাওয়ারের রানের গড় চল্লিশের বেশি। অধিনায়ক হিসেবেও অ্যাসেজ সিরিজের আগে পর্যন্ত ২৬ টেস্টে তাঁর রান ১৮৮৪। গড় ৪৫·৯৫। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছ'টি টেস্টের ·১১ ইনিংসে একটি শতরানসহ গাওয়ার ৩৮৩ রান করেন (গড় ৩৪·৮১), সিরিজে যা তাঁর দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। তবু গাওয়ার বাদ পড়লেন। কিন্তু গাওয়ার, বথাম বাদ যাওয়ায় পিছিয়ে পড়ল ইংল্যান্ড দলই। এক ডজন সম্ভাব্য নামের মধ্যে থেকে গুচকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ইংল্যান্ডের অধিনায়ক করা হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের দল গঠন করতে হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখনই গাওয়ার-বথামের অভাবে লন্ডনে পোস্টার দেখা গিয়েছে মোটামুটি ব্যাট ও বোলিং করতে পারলে এবং নিজের ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম থাকলে ইংল্যান্ড দলে সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। রসিকতা হলেও ব্যঙ্গটা তীক্ষ্ণ !

সমস্যায় চ্যাং

ফরাসি ওপেন বিজেতা মাইকেল চ্যাং এক দারুণ সমস্যায় পড়েছেন । খেলা, জেতা এবং টাকা সতেরো বছরের এই তরুণের কাছে এখন কোনও ব্যাপারই নয় । শুধু এ-বছরই টেনিস খেলে চ্যাংয়ের আয় হয়েছে ৪ লক্ষ ডলার । সমস্যাটা অন্যত্র । আয় করা এই বিপুল অর্থ কীভাবে খরচ করবেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি । তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, তাই নতুন-নতুন গাড়ি

কিনে খরচ করা যাচ্ছে না । তাঁর একমাত্র শখ, অ্যাকোরিয়াম কেনা । তাতে আর কত টাকাই বা খরচ করা যায় ! বাবার হাতেই সব টাকা তুলে দেন চ্যাং । এবং মাসিক হাতখরচ হিসেবে বাবার কাছ থেকেই চেয়ে নেন মাত্র একশো ডলার । ভাবা যায়, প্রায় কোটিপতি মার্কিন তরুণের হাতখরচ মাত্র একশো ডলার !

ল্যামবার্টির লক্ষ্য

শরীর খুব দুর্বল । তাই ডাক্তার ছ' বছর বয়সে পরামর্শ দিলেন সাঁতার কাটার । প্রথম দিকে ভাল লাগত না, পরে সাঁতারের সময় যখন উন্নত হতে লাগল, তখন থেকেই সাঁতারের প্রতি ঝোঁক বাড়তে শুরু করল ইতালির চার ল্যামবার্টির ।

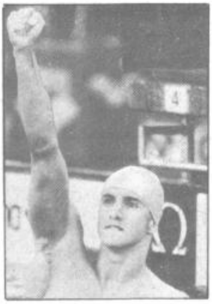

এই সেদিন, কুড়ি বছরের ল্যামবার্টি ইউরোপীয় মিটে তিনদিনে তিনটি ইভেন্টে সোনা জিতে নিলেন । ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ভাঙলেন সোল ওলিম্পিকে গড়া অস্ট্রেলিয়ার ডানকান আর্মস্টং-এর বিশ্ব রেকর্ড । কিডনির সমস্যা হওয়ায় সোলে একেবারেই ভাল ফল করতে পারেননি, ২০০ মিটারের হিটেই বাতিল হন । ল্যামবার্টির মতে, "ভালই হয়েছিল, জলে আমি আরও বেশি সময় দিই ।" ল্যামবার্টির এখন লক্ষ্য বার্সিলোনা ওলিম্পিক, তাই নিজের বিশ্ব রেকর্ডকেও প্রস্তুতি হিসেবেই মনে করেন তিনি ।

শুধু অর্থের জন্য

চল্লিশ বছরের জর্জ ফোরম্যান কি আবার বক্সিং-জগতে ফিরে আসছেন ? ফোরম্যান নামটি একসময় হেভিওয়েট বক্সিং-জগতে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত । শোনা যাচ্ছে, ফোরম্যান বর্তমান বিশ্ব-হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মাইক টাইসনের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবেন । যাঁরা এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্যোক্তা, তাঁরা নিশ্চয়ই অর্থের জন্য এই কাজ করছেন । ফোরম্যান হয়তো অনেক অর্থ পাবেন, কিন্তু টাইসনের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যে সম্মান খোয়াবেন সেটা কি বুঝতে পারছেন না ?

আবার তিনি

খেলার জগতকে তাঁর মতো আর কেউ এতখানি প্রভাবিত করেছেন বলে মনে হয় না । গত ন' বছর ধরে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট তিনি, ১৬৭ দেশের প্রায় সব ক'টিতেই গেছেন, যোগাযোগ রেখেছেন তাদের সঙ্গে । রাজনৈতিক চাপ সমেত অন্যান্য ঝক্কিঝামেলা সামলাতে হচ্ছে তাঁকে । তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব, গত ওলিম্পিকে ১৬০টি দেশকে তিনি সোলে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন । এইসব কৃতিত্বের জন্যই তিনি আবার ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন । ৬৯ বছরের সভাপতি, জুয়ান আন্তোনিয় সামারাঞ্চ সবচেয়ে খুশি, অবশ্য আগামী ওলিম্পিক তাঁর নিজের শহর বার্সিলোনাকে বরাদ্দ করে ।

সফল বুলা

শেষপর্যন্ত জেদ, নিষ্ঠা এবং ইচ্ছাশক্তিরই জয় হল । অনেক বাধা এসেছিল, এমনকী, লন্ডনের প্রকৃতিও বাধ সেধেছিল । সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, জল হিমশীতল । তবু সাঁতারু বুলা চৌধুরী ইংলিশ চ্যানেল পেরোলেন । বুলা লন্ডনের ডোভার থেকে ফ্রান্সের ক্যালে —এই দীর্ঘ পথ পেরোতে সময় নিয়েছেন ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট । বুলা লন্ডনে যাওয়ার আগে খেলাধুলো বিভাগের এই পৃষ্ঠায় জানিয়েছিলাম, চ্যানেল অতিক্রমের সময় মনে মনে আমরাও বুলার সঙ্গী হব । দেখা যাচ্ছে, আমাদের ইচ্ছা বিফলে যায়নি । অভিনন্দন বুলা ।

ব্যাট হাতে ফুটবলার

ছবিটা দেখে চেনা-চেনা মনে হলেও ক্রিকেটারের পোশাকে কেমন যেন সন্দেহ জাগছে, তাই না ? সন্দেহ

অমূলক—ছবিটা গত বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা, ইংল্যান্ডের এবারের বিশ্বকাপের সেরা অস্ত্র গ্যারি লিনেকারেরই । ক্রিকেট খেলতে ভালবাসেন লিনেকার, মেক্সিকো সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় ৪৫ রানও করে ফেললেন । তাও আবার নট আউট ! ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের যা অবস্থা, এখন দলকে উদ্ধার করতে কি বিশ্বখ্যাত ফুটবলারকে ব্যাট হাতে নামতে হবে ?

সেরা গ্রেগ

আড়াই বছর আগের গুরুতর দুর্ঘটনাও দমাতে পারেনি আমেরিকান গ্রেগ লিমন্ডকে । ফ্রান্সে পেশাদার সাইকেল চালকদের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় জয়ী হলেন আটাশ বছরের এই তরুণ । ১৬১ মাইলের এই রোড রেস যে কী কঠিন, তা একটি হিসেবেই পরিষ্কার হবে । ১৯০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ১৪৮ জনই প্রতিযোগিতা শেষ করতে পারেননি । তুমুল বৃষ্টি, পিছল রাস্তার বাধা অতিক্রম করে ঘণ্টা-প্রতি ২৪ মাইল সাইকেল চালান গ্রেগ । মোট সময় নেন ৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড । এর আগে ১৯৮৩তেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হন তিনি । আগের দিনই একটা পাহাড়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন তিনি ।

দর্শক

নতুন কৌশল রপ্ত করার আগে ক্ষিপ্রতার দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকটি সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের পাঞ্চ বা ঘুসি (শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে) মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যাতে আরও দুটি ঘুসি মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমটির নাম উরাকেন সায়োউচি এবং দ্বিতীয়টির নাম উরাকেন হিজোউচি।

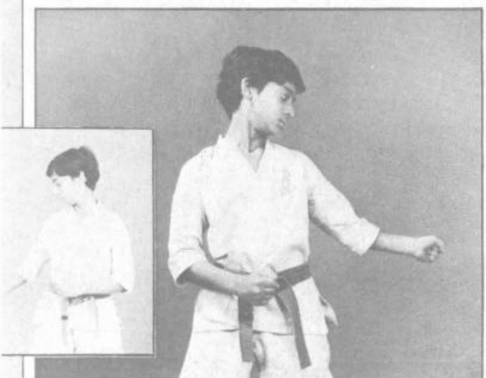

উরাকেন সায়োউচি : 'উরাকেন' কথার অর্থ আগেই বলেছি। 'সায়ো' কথার অর্থ উভয় দিকে এবং 'উচি' কথার অর্থ আঘাত। প্রথমে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে, তারপর ভঙ্গিমা বদল করে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে, হাতের কৌশলগুলো সানচিনদাচিতে দাঁড়িয়ে অনুশীলন করা দরকার। এবার সানচিনদাচিতে ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কনুই থেকে মুড়ে ভিতর দিকে রাখতে হবে। শরীরের মাঝ-বরাবর লাইনের সমতা রেখে ঠিক বুকের মাঝামাঝি মুঠো দুটো একে অপরের মুখোমুখি থাকবে। কনুই থেকে মুঠো পর্যন্ত হাত একেবারে সমান থাকবে। মুঠো দুটো শক্ত রাখতে হবে এবং মুঠো দুটো বুক স্পর্শ করবে না, তিন ইঞ্চির মতো ফাঁক থাকবে। এবার ঠিকভাবে দাঁড়ানো হলে, প্রথমে ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে হবে এবং সেই সঙ্গে ডান হাত ডান দিকে ছুঁড়তে হবে। মুঠোর পেছন দিক বাইরের দিকে আঘাত করার মতো অবস্থায় থাকবে। কনুই থেকে হাত বাইরের দিকে যাওয়ার সময় কনুই থেকে একেবারে সোজা হবে না। কনুই থেকে একটু মোড়া থাকবে এবং মোটামুটিভাবে হাত ১৩০ বা ১৪০ ডিগ্রি অবস্থায় থাকবে। এবার হাতের কবজি থেকে মুঠো বাইরের দিকে যতটা সম্ভব মুড়ে আঘাত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ডান হাত পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলে এবার একইভাবে বাঁ হাত ছুঁড়তে হবে। তর্জনী ও মধ্যমার প্রথম সন্ধিস্থলের গাঁটের পেছনের অংশ দিয়ে আঘাত করতে হবে।

উরাকেন হিজোউচি : 'উরাকেন' কথার অর্থ তো আগেই বলা হয়েছে। 'হিজো' কথার অর্থ ইসপ্লিন্, 'উচি' কথার অর্থ আঘাত। প্রথমে ইওইদাচি তারপর সানচিনদাচিতে ঠিকভাবে দাঁড়াতে হবে। এবার হাত দুটোকে মুড়ে পেটের কাছে শরীরের মাঝ-বরাবর লাইনের সমতা রেখে হাতের মুঠো দুটো একে অপরের ওপর রেখে দাঁড়াতে হবে। ডান হাতের মুঠো ওপরে বাঁ হাতের মুঠো নীচে রাখতে হবে। মুঠো দুটো পেট স্পর্শ করবে না। এবার প্রথমে ডান দিকে তাকিয়ে ডান হাত বাইরের দিকে ছুঁড়তে হবে। হাত সম্পূর্ণ ছোঁড়া অবস্থায় কনুই থেকে আগের পদ্ধতির মতো একটু মুড়ে থাকবে। তারপর সেই অবস্থায় কবজি থেকে বাইরের দিকে মুঠোটা যতটা সম্ভব জুড়ে গিয়ে আঘাত করবে। আঘাত করা হলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতকে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ডান হাত ফিরে আসবে। তখন বাঁ হাত ওপরে থাকবে। এবার একইভাবে বাঁ হাত ছুঁড়তে হবে। তারপর বাঁ হাত ফিরে এসে নীচে এবং ডান হাত ওপরে থাকবে। এই কৌশল দুটি প্রতি হাতে ২০ বার করে অনুশীলন করতে হবে।

এই দুটো কৌশল অনুশীলনের সময় শরীরের ওপর অংশ সোজা অবস্থায় থাকবে। ঘাড় থেকে মাথা ঘুরে যেখানে হাত আঘাত করবে সেখানে দেখতে হবে। প্রথম-প্রথম আস্তে-আস্তে করতে হবে, কিছুদিন ভালভাবে অভ্যাস করার পর তাড়াতাড়ি অভ্যাস করতে হবে। ক্যারাটের প্রতিটি কৌশল প্রয়োগে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। কিন্তু কোনও নতুন কৌশল ভালভাবে রপ্ত করার আগে ক্ষিপ্রতার দিকে নজর দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

ফোটো : উৎপল সরকার

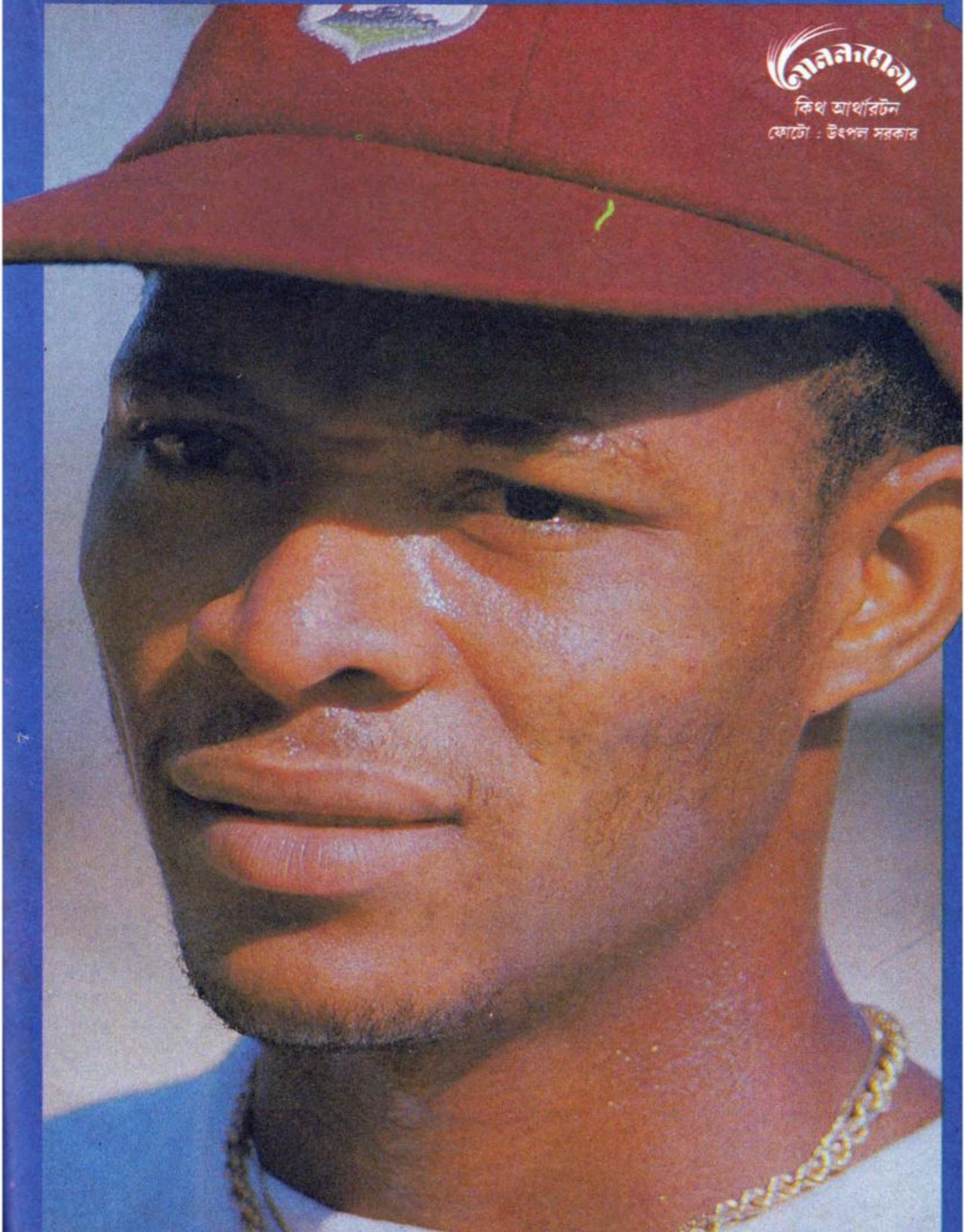
কিথ আর্থারটন
ফোটো : উৎপল সরকার

আন্দ্রে আগাসি

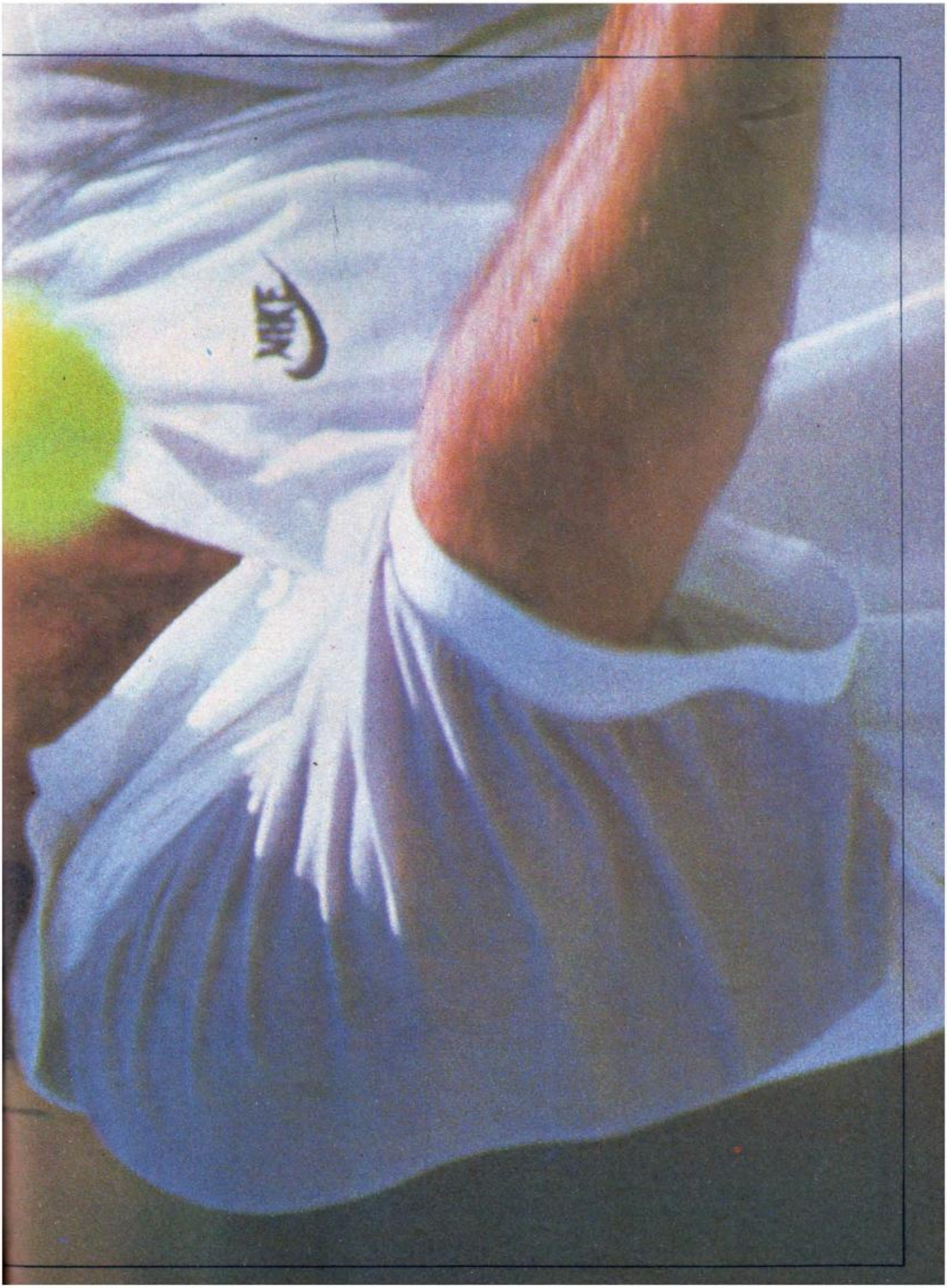
NIKE

(এর পরে আগামী সপ্তাহে)

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গণপতি 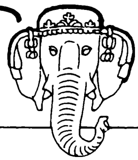 হিরের চোখ

শুভঙ্কর একা বসে রইল ঘরের ভেতর। ডায়েরিটা যদি না খোয়া যেত আর মাস্টারমশাই যদি মারা না যেতেন, তা হলে কী আনন্দ যে হত! শুভঙ্কর বসে-বসে ঘরের চারদিক লক্ষ করতে লাগল। গরিবের সংসার হলে কী হয়, বেশ পরিপাটি করে সাজানো ঘর। দেওয়ালে তারাপীঠ, তারকনাথ ও কালীঘাটের ছবি। তিন্নির ছোটবেলাকার ছবিও আছে কয়েকটি। কী সুন্দর দেখতে তিন্নিকে! মউকে নাকি আরও দেখতে ভাল। ফরসা রং আর সুন্দর মুখের মেয়েদের খুব ভাল লাগে শুভঙ্করের। এইরকম একটি টুকটুকে ফুটফুটে বোন যদি ওর থাকত, তা হলে কী ভালই না হত। ভাইফোঁটার সময় এইরকম কত মেয়ে তো তাদের ভাইদের ফোঁটা দেয়। অথচ শুভর কপালে ফোঁটা দিয়ে শুভ কামনা করবার কেউ নেই। এ দুঃখ কি কম?

এ-বাড়ির বাইরের দাওয়ায় একটা কোণ ঘিরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। কাকিমা সেইখানে রান্নার ব্যবস্থা করছেন। একগলা ঘোমটা দেওয়া একজন বউ এসে চাপা গলায় কী সব জিজ্ঞেস করছে কাকিমাকে। হয়তো মাস্টারমশাইয়ের খুন হওয়ার ব্যাপারটাই জানতে চাইছে বিশদভাবে। কাকিমাও ফিসফিস করে বলে চলেছেন।

শুভ যখন ঘরে বসে এইসব অনুভব করছে, তেমন সময় তিন্নি হাসিমুখে এক ডিশ হালুয়া ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর হাট থেকে কেনা বাজে কাঠের একটা পালিশ না-করা টেবিলের ওপর হালুয়ার প্লেট ও চায়ের কাপটা বসিয়ে রেখে বলল, "নিন। খেয়ে নিন।"

শুভঙ্করের বেজায় খিদে পেয়ে গিয়েছিল তখন। তাই চটপট হালুয়া খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "এ চা তুমি তৈরি করেছ?"

সলজ্জ হেসে ঘাড় নাড়ল তিন্নি, "হ্যাঁ।"

"কী মিষ্টি। খুব ভাল হয়েছে। এরকম চা আমি কখনও খাইনি।"

"মিথ্যে কথা। হালুয়া খেয়ে চা খেলে চা তো মিষ্টি লাগেই না, উপরন্তু স্বাদও পাওয়া যায় না চায়ের।"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিকই বলেছ তুমি। তবে কিনা ধলভূমগড়ের তিন্নির হাতে তৈরি চা খেলে তা থেকে সব সময় সবরকমের আস্বাদ পাওয়া যায়।"

তিন্নি এবার লজ্জা পেয়ে ঘরের বাইরে গেল।

কাকিমা বললেন, "কী রে! চলে এলি যে? ছেলেটা একা বসে রইল, যা গল্প কর।"

শুভঙ্কর ডাকল, "তিন্নি!"

"বলুন।"

কাকিমা বললেন, "যা, ভেতরে যা।"

তিন্নি তবু যায় না।

কাকিমা প্রতিবেশিনী বউটিকে বললেন, "বিল্টুর বন্ধু। ধলভূম বেড়াতে এসেছে। একা আছে বেচারি। একটু গল্পসল্প করতে তো হয়।"

বউটিও বলল, "যা না, মা।"

কাকিমা বললেন, "সমবয়সী ছেলেদের দেখলে ওর কী যে লজ্জা, তা ভগবান জানেন।"

শুভঙ্কর এবার নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ও, এই কথা? তুমি দুষ্টু মেয়ে, আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি? এসো, ঘরে এসো। না হলে আমি বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসব।"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি।"

"তোমার কথা বিল্টুর মুখে আমি অনেক শুনেছি। তোমার মতো মেয়ে হয় না। তুমি কি জানো, আমার কোনও বোন নেই বলে আমার কত দুঃখ। তাই তোমার মতো মেয়ে দেখলে কেবলই আমার মনে হয়, এদের ভেতর থেকে কেউ যদি আমার বোন হত তা হলে ভাইফোঁটার দিন কপালের মাঝখানে ফোঁটা একটা পেতাম।"

তিন্নি এবার হাসি-হাসি মুখে বলল, "বেশ তো। এবার ভাইফোঁটার দিন আসবেন। আমিই আপনাকে ফোঁটা দেব।"

"বয়ে গেছে। তোমার বাড়িতে এলে তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি আসব অতদূর থেকে তোমার কাছে ফোঁটা নিতে? কে রে আমার?"

তিন্নি এবার কাজল-কালো দুটি চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। যাচ্ছি।"

ওরা দু'জনেই ঘরে এল।

তক্তপোশের ওপরে পুরু করে পাতা বিছানার এক প্রান্তে শুভঙ্কর বসল। আর-এক প্রান্তে বেশ ভাল করে ছড়িয়ে বসল তিন্নি। তারপর সাপের মতো লম্বা বেণীটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বলল, "আপনার তো বোন নেই। ভাই নেই আর?"

"না। আমি আমার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।"

"আমিও। আপনার নাম?"

"আমার নাম শুভঙ্কর দত্ত। তোমার?"

"আমার নাম তো তিন্নি।"

"সে তো আমাদের আদরের নাম। ভাল নাম?"

"নীলাঞ্জনা।"

"বাঃ। কী অপূর্ব নাম। চেহারার সঙ্গে নামের এরকম মিল দেখা যায় না বড় একটা। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?"

"এইট-এ উঠেছি এবার। আপনি?"

"আমি সামনের বছর স্কুল ফাইনাল দেব।"

"আমার বন্ধু মউও আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। ও অবশ্য গত বছর ফেল করেছিল। না হলে এ-বছর নাইনে পড়ত ও।"

"সে কী! মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে ফেল করেছিল?"

"করবে না-ই বা কেন? ভীষণ চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে যে। সব সময় টো-টো করে ঘুরবে। কোথায় গাছে উঠবে, পাহাড়ে চড়বে, সাঁতার কাটবে, লাফাবে। সাইকেল পেলে তো কথা নেই, চষে বেড়াবে চারদিক। পড়াশোনায় মন নেই একদম। করবে না ফেল?"

"সাইকেল তো নতুন হয়েছে।"

"ও বাবা। তার আগে যখন যার সাইকেল পেয়েছে তারটা নিয়েই উধাও হয়েছে। অথচ কী সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। এ-গ্রামে কেন,

আশপাশের গ্রামেও ওরকম মেয়ে নেই।"

"বলো কী?"

"না দেখলে অনুমান করতে পারবেন না।"

"আমার এই বোনটির থেকেও কি ওকে আরও বেশি সুন্দর দেখতে?"

"ওর কাছে আমি একটা প্যাঁচা।"

আকাশে আবার মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ চমকাল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়।

বউটিও চলে গেল এক সময়।

কাকিমা বললেন, "আজকের দুর্যোগটা যেন ধলভূমগড়ের জন্যই এসেছিল। এ আকাশ ছেড়েও ছাড়ে না। বিল্টুটাও আবার বেরোল ওর সঙ্গে। কখন ফিরবে কে জানে।"

তিন্নি বলল, "আমি একবার যাব মা মউদের বাড়ি?"

"না, থাক। বাড়িসুদ্ধ সবাই গেলে কী করে হবে? চারদিকে খবরাখবর করতেই দেরি হচ্ছে হয়তো। বিল্টু আসুক। ততক্ষণে তুই এক কাজ কর দিকিনি। এখানে একটা আসন পেতে দে। ছেলেটাকে খাইয়ে দিই।"

শুভঙ্কর বলল, "বিল্টু আসুক না কাকিমা?"

"ও এখন কখন আসবে তার কি ঠিক আছে? রাতও হল অনেক। আকাশও ভেঙে আসছে। যা হোক দুটো খেয়ে নাও।"

অগত্যা বসতেই হল খেতে।

তিন্নি আসন পেতে জায়গা করে দিল। শুভঙ্কর আলুভাজা আর ডিমের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেল বেশ তৃপ্তি করে।

কাকিমা তিন্নিকে বললেন, "তুই ওকে নিয়ে ও-বাড়িতে চলে যা। ওপরের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে মশারিটা খাটিয়ে দিয়ে আয়।"

তিন্নি বলল, "বাবা বোধ হয় টর্চটা নিয়ে গেছে। যা অন্ধকার। তুমি তা হলে বাতি আর দেশলাইটা দাও।"

কাকিমা বাতি আর দেশলাই দিলেন। তিন্নি দেশলাই বাতি আর হুকে টাঙানো চাবিটা নিয়ে শুভঙ্করকে ডাকল, "আসুন।"

শুভঙ্করও টর্চ আনেনি। আসলে এখানে আসার জন্য কোনও প্রস্তুতিই তো ছিল না আগে থেকে। বিল্টুর টর্চ বিল্টু নিয়ে গেছে। তাই অন্ধকারেই পা টিপে-টিপে তিন্নির সঙ্গ নিল শুভঙ্কর।

ঘরের বাইরে আসতেই বড়-বড় দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ল ওদের।

তিন্নি বলল, "ছুটে আসুন।" তারপর বলল, "না থাক। ছোটবার দরকার নেই। এখানে তো পাথুরে মাটি। কোথায় আবার হোঁচট খাবেন শেষকালে। ধীরে-ধীরেই আসুন।"

মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। তাই এ-বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে ও-বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হল না। বেশ জোরে হাওয়া বইছে এখন।

অন্ধকারেই সদর দরজার তালা খুলে নীচের দালানে ঢুকল ওরা।

সে কী দারুণ অন্ধকার!

সেই অন্ধকারে বাড়ির আসল চেহারাটা যে কী তা বোঝা গেল না। এই বিশাল অট্টালিকার জঠরে কী করে যে একা থাকবে তা ভেবে পেল না শুভঙ্কর। ভয়ে ওর বুক টিপটিপ করতে লাগল। অথচ তিন্নির কাছে শহুরে ছেলে হয়ে ওর মনের দুর্বলতাটা প্রকাশও করা যায় না। শুভঙ্কর বলল, "এই এত বড় বাড়ি এইভাবে ফাঁকা পড়ে আছে?"

তিন্নি বলল, "হ্যাঁ।"

"চুরি-ডাকাতি হয় না

"একমাত্র খাট আলমারিগুলো ছাড়া নিয়ে যাবার মতো কিছুই তো নেই এ-বাড়িতে। চোর এসে পাবেটা কী?"

"কিচ্ছু নেই?"

"না। যা ছিল সব ডাকাতি হয়ে নষ্ট হয়েছে। আর বাদ-বাকিগুলো বিল্টুদারা নিয়ে গেছে কলকাতায়।"

কথা বলতে-বলতেই দালানের সিঁড়ির মুখে দেশলাই জ্বেলে বড় মোমবাতিটা ধরাল তিন্নি। সেই বাতির আলোয় এই গাঢ় অন্ধকারের তো কিছুই হল না বরং সেই অন্ধকার ক্ষণমুক্ত হয়ে আরও গভীর আতঙ্কময় হয়ে উঠল।

বাতিটা হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল তিন্নি। আর ওর পিছুপিছু ভয়ে-ভয়ে শুভঙ্কর। বাতির আলোয় তিন্নির ফরসা মুখখানা কী অপূর্ব লাগছে।

সিঁড়ির ওপরেও প্রশস্ত দালান। দালানের ওপর দালান আর কি। সাবেক কালের বাড়ি তো। মুখোমুখি ঘর। কী বড়-বড় দরজা। মোটা রডের জানালা। তিন্নি বাঁ দিকের একটি বড় ঘরের তালা খুলে শুভঙ্করকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল দেওয়ালের ওপর এক বীরপুরুষের মস্ত তৈলচিত্র।

শুভঙ্কর বলল, "ও-ছবিটা কার?"

তিন্নি বলল, "ঠাকুরদাদার।"

ঠাকুরদাদা অর্থাৎ বরদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর কী দীপ্ত চেহারা। দেখলে ভয় লাগে। আবার ভক্তিও হয়। সেই ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা যেন আপনা থেকেই নুয়ে আসে।

তিন্নি ঘরে ঢুকে চিমনি লণ্ঠনটা জ্বালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তেল তো নেই। অগত্যা বড় বাতিটাই বেশ কায়দা করে বসিয়ে রাখল বাতিদানের ওপর। বাতির আলোয় ঘরের ভেতরটা মোটামুটি উজ্জ্বল হল।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে ইলেকট্রিক নেই?"

"হ্যাঁ, আছে। তবে এ-বাড়িতে নেই। আমাদের ঘরেও নেই। আর সকলের ঘরে আছে। দুর্যোগের জন্য আলোর তার ছিঁড়ে গেছে হয়তো কোথাও। তাই আলো জ্বলছে না।"

শুভঙ্করকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তিন্নি বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিল। বিছানার তলা থেকে একটা মস্ত বেডকভার বার করে বিছিয়ে দিল বেশ পরিপাটি করে। কী চটপটে মেয়ে। যেন পাকা গিন্নি একটি। তারপর খাটের সঙ্গে গুছিয়ে রাখা মশারিটা খুলে বেশ ভাল করে গুঁজে দিল চারপাশ।

বাইরে তখন দমকা হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের কড়কড়ানি। মহাপ্রলয়ের আর দেরি নেই বুঝি।

দরজাটা খোলা থাকায় ঘরের ভেতর বাতিটা ঝোড়ো হাওয়ায় শিরশির করে কাঁপছে।

তিন্নি বলল, "নিন, শুয়ে পড়ুন। আমি নীচে যাই। বিল্টুদা এলে পাঠিয়ে দেব।"

শুভঙ্করের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তখন। অতিকষ্টে সে বলল, "আচ্ছা।"

তিন্নি বলল, "দরজায় খিল দেবেন না যেন, এমনি ভেজিয়ে রাখুন। না হলে বিল্টুদা এসে ডাকাডাকি করলে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠতে হবে আবার। আপনাদের খাবার জলটা আমি বিল্টুদাকে দিয়েই পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

শুভঙ্কর বলল, "তা তো দেবে। কিন্তু এত বৃষ্টিতে তুমি যাবে কী করে? বরং আমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করো।"

"বা রে, রাত হয়নি বুঝি? তা ছাড়া আমার কি ঘরের কাজ নেই?"

এইবার শুভঙ্করের মুখ দিয়ে আসল কথাটা ফুটে বেরোল, "এতবড় একটা পোড়ো বাড়ি। আমার একা থাকতে খুব ভয় করবে। সেইজন্যই বলছিলাম।"

"ভয় করবে! ভয় করবে কেন? তিন্নি বলে একটা ডাক দিলেই তো ছুটে আসব আমি।"

"আসলে আমার খুব ভূতের ভয়।"

তিন্নি হেসে বলল, বোকা ছেলে। ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বিল্টুদা যখন আসে, বিল্টুদা তো একাই শোয়। আগে আমিও শুতাম মাঝে-মাঝে।"

"আমার তবুও ভয় করছে তিন্নি।"

"চুপচাপ শুয়ে পড়ুন তো। চোখ মেলেই দেখবেন সকাল হয়ে গেছে। অথচ ভূত-প্রেত কিছুই আসেনি।" এই বলে ছোট্ট একটা মোমবাতি ধরিয়ে বাইরের হাওয়া থেকে সেটার শিখাটাকে বাঁচাবার জন্য হাতের চেটো দিয়ে সেটাকে আড়াল করে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল তিন্নি।

আর শুভঙ্কর? হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের বাতিটা নিভে যেতেই "মা গো" বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এল তিন্নির কাছে। ভয়ে যেন নীল হয়ে গেছে সে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কী ভয়! কী ভয়! কী ভয়!

তিন্নির হাত থেকে তখন ছিটকে পড়ে নিভে গেছে বাতিটা। এই আকস্মিক ব্যাপারে সে-ও ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলল, "কী হল? অমন চিৎকার করে পালিয়ে এলেন যে?"

শুভঙ্কর তখন ভয়ের চোটে প্রায় কেঁদে ফেলেছে। বলল, "তুমি আমাকে সঙ্গে করে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে চলো তিন্নি। এই প্রেতপুরীতে আমাকে একা রেখে কখনও যেও না। আমার খুব ভয় করছে। একা আমি এই বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারব না। বিল্টু না-আসা পর্যন্ত আমি তোমাদের ঘরেই থাকব।"

তিন্নি বলল, "আসুন।" বলে খুব সাবধানে অন্ধকারে পা টিপে টিপে নীচের দিকে নামতে লাগল ওরা।

আর শুভঙ্কর ভাবতে লাগল, এই তিন্নি কত ভাল। বাড়ি ফিরেই একবার সে মাকে নিয়ে চলে আসবে তিন্নির কাছে। আর ওর জন্য এমন সব ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে আসবে, যা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তিন্নি।

॥ চার ॥

খুব ভোরে তিন্নির ডাকে ঘুম ভাঙল শুভঙ্করের। ঘুম ভেঙেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, শাঁখ-সাদা মুখ নিয়ে মিষ্টি হাসির তিন্নি দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। বলল, "উঃ! কী ঘুম ঘুমোতে পারেন

আপনি।"

শুভঙ্কর লজ্জিত গলায় বলল, "আসলে কাল অতখানি ট্রেন জার্নির পর শুতে একটু রাত হয়েছে তো। তার ওপর বাদলা। তাই খুব ঘুমিয়ে পড়েছি। বিল্টু কোথায়?"

"বিল্টুদা এখনও ফেরেনি। কাল রাতেই ও বাবার সঙ্গে টেম্পো নিয়ে চাকুলিয়ায় চলে গেছে মাস্টারমশাইকে আনতে।"

"কখন আসবে?"

"তা তো জানি না।"

শুভঙ্কর বলল, "ভাগ্যে আমি তোমার সঙ্গে চলে এসেছিলুম কাল, না হলে সারারাত ওই দমবন্ধ করা বাড়িটার ভেতর পড়ে থাকতে হত আমাকে।"

তিন্নি হেসে বলল, "এমন ভিতু ছেলে আমি কখনও দেখিনি।"

শুভঙ্কর ভেংচি কাটল তিন্নিকে।

তিন্নি বলল, "যাক। আরামে ঘুমিয়েছিলেন তো?"

"খুব ঘুমিয়েছি।"

সত্যিই ঘুমিয়েছে শুভঙ্কর। পুণ্ডরীককাকার ঘরে তক্তপোশের বিছানায় গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শান্তির নিদ্রা গেছে। সে এমনই ঘুম যে, এক ঘুমেই সকাল।

তিন্নি বলল, "চলুন। শহরের ছেলে, গ্রাম তো দেখেননি কখনও, আমাদের গ্রামের রূপ আপনাকে দেখিয়ে আনি।"

শুভঙ্কর তো এইসবই চায়। তাই এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমেই বলল, "চলো। ভোরে ওঠা কখনও হয় না, তার ওপর ধলভূমগড়ের এই রাঙামাটির ভোর। চলো, ঘুরে আসি।"

তিন্নি একটা নিম-দাঁতন এগিয়ে দিল ওর দিকে। দিয়ে বলল, "এটা চিবোতে চিবোতে চলুন। পদ্মদিঘির জলে মুখ ধুয়ে শাল-মহুয়ার বন দেখিয়ে আনি আপনাকে।"

শুভঙ্কর চটি পায়ে দিচ্ছিল।

তিন্নি বলল, "থাক। দরকার নেই। খালি পায়েই চলুন। একটু মাটির ছোঁয়া শরীরে লাগানো ভাল।"

"তোমার মা কোথায় তিন্নি?"

"মা কাল রাতে মউদের বাড়িতে গেছেন।"

"তুমি তা হলে সারারাত একা ছিলে?"

"ছিলাম। আমার তো অত ভূতের ভয় নেই যে, একা থাকতে ভয় পাব। তা ছাড়া যা ভিতু ছেলে আপনি, রাত-দুপুরে ভূত এসে যদি আপনার ঘাড় মটকাত, তা হলে কে সামলাত আপনাকে?"

শুভঙ্কর লাজুক মুখে অভিমান করে বলল, "তুমি বারবার ভিতু-ভিতু কোরো না তিন্নি। আমার কিন্তু রাগ হয়ে যাচ্ছে খুব। আমি শহরের ছেলে। কখনও গ্রামে আসিনি। তার ওপর বর্ষার রাত। অন্ধকার। ওই মস্ত বাড়ি। ভয় করে না বুঝি? ভূত না হোক, চোর-ডাকাতই যদি আসত কাল?"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আর বলব না। আমি আপনাকে রাগাচ্ছিলাম।"

দরজায় শিকল তুলে দাঁত মাজতে-মাজতে বাইরে এল ওরা।

কাল রাতে ট্রেন থেকে নেমে অন্ধকারে আসার দরুন এখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারেনি শুভঙ্কর। এমনকী বিল্টুদের যে বাড়িটাকে দেখে ওর ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়েছিল, সেই বাড়িটাকে দিনের আলোয় দেখে এখন আর আতঙ্কময় বলে মনেই হল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কী ছেলেমানুষিই না করে ফেলেছিল কাল। তিন্নি নামের এই পুঁচকে মেয়েটির কাছে ওর দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। অথচ আজ? আজ এই ভোরের আবছায়ায় এই রঙিন প্রকৃতি যেন রূপে-রসে-গন্ধে ভরিয়ে তোলার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে ডাকছে ওকে।

ওরা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল, তখন ভোরের আবছায়া একটু-একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। চারদিকে কেমন এক স্নিগ্ধ সুন্দর ভাব ফুটে উঠছে। আকাশের মেঘ সরে গেছে কাল রাতেই। কালো মেঘের বদলে কী শুভ্র উজ্জ্বল মেঘ দলে-দলে চলেছে উত্তরে। ধলভূমগড়ের ভিজে লাল মাটি কাছিমের পিঠের মতো ফুলে উঠেছে। কোথাও কোনও কাদা নেই। পাথর, মাটি ও কাঁকরে ভরা পথ। ঘরের উঠোন থেকেই তো প্রায় শালবন শুরু। গাছগাছালির পাতা থেকে বাতাসের আন্দোলনে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জমে-থাকা বৃষ্টির জল। আকাশ পরিষ্কার হলেও বাতাসের বেগ খুব। নিম্নাঞ্চলগুলি জলে ভরে আছে। যেখানটা একটু ঢালু সেখান দিয়ে কলকল করে ঝরনার মতো জলের স্রোত গড়িয়ে চলেছে। গর্তের জলে গা ডুবিয়ে ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঁ-গোঁ করে। ব্যাঙ ডাকলে নাকি বৃষ্টি হয়। তবে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় আর বৃষ্টি হবে না। শাল-মহুয়ার গাছগুলো বড় বেশি সজীব ও সবুজ বলে মনে হচ্ছে। কচি-কচি শালপাতাগুলি দেখলে চোখ দুটো ভরে ওঠে। ভিজে মাটি আর গাছপালার ভেতর থেকে কী সুন্দর যে একটা গন্ধ ফুটে বেরোচ্ছে তা বলবার নয়। তার ওপর পাখিদের কলতানে যেন কান পাতা যাচ্ছে না।

ওরা পথের ধারে একজনের কুয়ো থেকে দড়ি-বালতিতে করে জল তুলে মুখ ধুয়ে নিল। জলটা মুখে দিয়েই তৃপ্তিতে ভরে উঠল শুভঙ্কর। কী অপূর্ব স্বাদ জলের।

শুভঙ্কর তিন্নিকে বলল, "তুমি যে আমাকে বললে পদ্মদিঘিতে নিয়ে যাবে, কই গেলে না তো?"

তিন্নি বলল, "মত পরিবর্তন করলাম। পদ্মদিঘি যেতে গেলে অনেকদূর যেতে হবে। আজ আর তা ভাল লাগছে না। মনটা মউয়ের জন্য কেমন-কেমন করছে। তাই ভাবছি, ওটা বরং কাল যাব। এখন আপনাকে কাছাকাছি এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে গেলে মন আপনার সত্যিই খুশিতে ভরে উঠবে।"

"আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি?"

"নরসিংগড়।"

"সে কোথায়?"

"কাছাকাছি। এখান থেকে খুবজোর এক-দেড় কিলোমিটার হবে। ওখানে একটা রাজবাড়ি আছে। আপনাকে দেখাব।"

"রাজারা আছেন?"

"এখন কি রাজা-জমিদার বলে কিছু আছে? দেখবেন, ভগ্ন প্রাসাদে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা।"

ওরা পায়ে-পায়ে রুপোলি ফিতের মতো পিচ রাস্তার ওপর উঠল।

তিন্নি বলল, "এটা হল বম্বে রোড। ঘাটশিলা, গালুডি, টাটানগর হয়ে চলে গেছে সুদূর বোম্বাই।"

শুভঙ্কর বলল, "কী সুন্দর।"

সত্যিই সুন্দর। দু'পাশে ঘন হয়ে ওঠা শালবন। তার বুক চিরে রুপোলি রাজপথ। সেই পথ বেয়ে ওরা হেঁটে-হেঁটে একটু এসেই শালবনের ভেতর দিয়ে যে রাঙামাটির পথ, সেই পথ ধরে চলতে লাগল। শুভঙ্কর মনে-মনে ভাবল, প্রকৃতির এই রূপ থেকে জীবনের কতগুলো বছর বঞ্চিত ছিল সে। ভাগ্যিস বিল্টু নাচাল ওকে। না হলে এ-দৃশ্য তো দেখা হত না। পেত না এই অরণ্যের স্বাদ।

(ক্রমশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রোভার্সের রয়
'ক্রিকেট' প্রশিক্ষণের অন্তর্গত ছিল মাথা দিয়ে টেনিস আর বল 'বাঁকানো' !
কারমোডিস ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে রোভার্সের একদিনের ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম খেলায় চার্লি কার্টার এবং মারভিন ওয়ালেস আহত ! রয়ের আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাভেলিয়ার্সের ফাস্ট বোলার র‍্যালফ মিকারের বিদ্রূপে ক্ষিপ্ত রোভার্সের সব ছেলেরা ফিরতি খেলায় খেলবে বলে জিদ ধরলে রয় তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ।
কিন্তু রয়, আমাদের তো ক্রিকেট খেলার জন্যে তৈরি হবার কথা !
এইসব সরঞ্জাম তো ফুটবলে দক্ষতা বাড়াবার জন্যে !
তা ঠিক, তবে বিশেষ ধরনের দক্ষতা···
···যা তোমাদের গতি বাড়াবে, ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে বল এলে তোমাদের প্রতিক্রিয়া করবে বিদ্যুতের মতো !
তোমাদের খেলা বন্ধ করতে না পারলেও যাতে আর কেউ জখম না হয় সেই চেষ্টা করছি !
ঠিক বলেছ, রেসি···
রোভার্স ফুটবল প্রশিক্ষণের পোশাকে তৈরি হয়ে নামল···
মাথা দিয়ে টেনিস খেলা ! গতি এবং সময়জ্ঞান পরীক্ষা ! একদিকে দু'জন খেলোয়াড় হলে আরও ভাল···
নোয়েল, বুঝলে কী বলতে চাই ? তোমার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত হয়নি !
কোর্টের চারদিকে সত্যিই ওদের খুব জোরে ছুটে বেড়াতে হবে !
উউউফ্ !
গোলরক্ষক ওয়ালটারের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা···
সত্যি, পাকো, তুমি বল সবার চেয়ে বেশি বাঁকাতে পারো !
তাই বলটাকে বাঁকিয়ে ওয়ালটারের নাগালের বাইরে পাঠাব, এই তো ?
হাঁ !
ননন্‌া !
ওয়ালি, তার মানে তুমি চারটে বাই দিলে !

কিন্তু ওয়ালটার লাভবান হতে লাগল···
বাঁচিয়েছে ! মানে, চমৎকার ক্যাচ, ওয়ালটার !
মনে করবে এটা হয়েছে কট বিহাইন্ড !
অন্য খেলোয়াড়রা পা দিয়ে জোরে ক্রিকেট খেলতে লাগল···
ভিক চমৎকার ঘুরিয়ে দিয়েছে !
ওটা মাঠের বাইরে গেল···
কিন্তু !
ভার্নন, তুমি !
চমৎকার, রেসি ! দারুণ আটকেছ !
হাউজ্জ্যাআাট ?
সুপারব্র্যাট, ধরে নাও তুমি রান-আউট !
ইয়ায়ায়া !
হা ! হা ! হা !
একঘণ্টা বাদে···
কিছু উপকার হয়েছে বলে মনে হয় ?
দারুণ, রয় ! বলে দিচ্ছি ক্যাভেলিয়ার্সকে টাকার জন্যে কঠিন লড়াই করতে হবে !
টাকার কথায় মনে পড়ল···প্রথম খেলায় কত টাকা তুলেছি, রয় ?
তিরিশ হাজার পাউন্ড··· আর ফিরতি খেলায় এটা দ্বিগুণ হতে পারে ।
লফটি পিকের মুখে হাসি ফুটতে পারে !
ওই যে, লফটি আসছে···
কিন্তু লফটি পিকের মুখে হাসি ছিল না···
রয়, স্ট্যানপর্প ইউনাইটেড দেউলিয়া হয়ে গেলেও ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে রোভার্সের খেলা তোমাকে বন্ধ রাখতে হবে !
কেন, লফটি ? কী হয়েছে ?
বিকেলের কাগজ পড়েছ ? র‍্যালফ মিকার আরও একজনকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে ! প্রথম শ্রেণীর এক কাউন্টি ক্রিকেটারকে !
মিকার আবার আঘাত হানল !
র‍্যালফ মিকারের একটা উঁচু বল মাথায় লেগে মিডশায়ারের টেরি জনসন পাঁচ মিনিট অজ্ঞান হয়ে ছিল ।
এক পেশাদারের এই হাল হলে রোভার্সের কোনও আশা নেই ! মিকারের বলের গতি যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে !
ক্রমশ
পরের সংখ্যায় : ফিরতি খেলা !

ফোটোগ্রাফির দেড়শো বছর

ফোটোগ্রাফির দৌলতে মানুষ আজ কী না করছে। অন্য গ্রহের ছবি, মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের ছবিও তুলে আনছে। আরও কত কী ? তবে ফোটোগ্রাফির সব থেকে বড় সাফল্য,মানুষের সংবেদনশীল মনকে সে নাড়া দিতে পেরেছে।

ফোটোগ্রাফির দেড়শো বছর পূর্ণ হল। তাই এবার একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। এমনিতে বিশ্বের প্রথম ফোটোগ্রাফ তোলার আগে নানা দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ফোটোগ্রাফি নিয়ে এইসব কর্মকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ক্যামেরা ও তার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক জ্ঞানের পরিধিকে করেছে বিস্তৃত। ফোটোগ্রাফ উদ্ভাবনের দিক থেকে দু'জন ফরাসির নাম স্মরণীয়। এঁরা হলেন যোসেফ নিস্ফোর নিপ্‌স্ ও লুইস মানডে জাক দাগেরের। আধুনিক ক্যামেরা হল ক্যামেরা অবসকিউরার পদ্ধতির সোজাসুজি প্রয়োগ। এই পদ্ধতিতে দূরবর্তী বস্তুর উলটো ছবি ফেলা হত দেওয়ালে অথবা পরদায়। ঘরে আলো আনা হত দেওয়ালের ফুটো দিয়ে। 'দাগেরে টাইপ' নামে বিখ্যাত এই পদ্ধতি জাক দাগেরের নামানুসারে। দাগেরে ১৮৩৯ সালের ১৯ অগস্ট প্যারিসের ফরাসি বিজ্ঞান অকাদেমির সদস্যদের কাছে তাঁর এই আবিষ্কারের স্বত্ব পেশ করেছিলেন। অকাদেমি এই স্বত্ব কিনে নেন ও এই পদ্ধতিতে ফোটো তোলার অনুমতি দেন। সেই থেকে ফোটোগ্রাফি ধাপে-ধাপে আজকের পর্যায়ে এসেছে। ফোটোগ্রাফির দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

সম্পাদক ডিক স্মিথ

চির তুষারের দেশ আন্টার্কটিকা সব সময় রহস্যময়। সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে অস্ট্রেলিয়ার পোস্টঅফিস ও সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছেন। আর সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ারই এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সঙ্গে আন্টার্কটিকার সম্পর্ক আরও নিবিড়। কারণ তিনিই পত্তন করেছিলেন 'অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক' নামে জনপ্রিয় এক পত্রিকা। এর জন্য তিনি খুবই ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি তিনি ছোট একটি বিমানে চড়ে সুমেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তবে প্রতিকূল আবাহাওয়ার জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সুমেরু, কুমেরু ও অন্যান্য জায়গার জানা-অজানার ঝুলি নিয়ে তিনি আজকাল হাজির হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার স্কুলে-স্কুলে। কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহ জোগাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে উসকে দিচ্ছেন তাদের অভিযাত্রী মনটিকে। তবে ডিক স্মিথের সব থেকে প্রিয় স্থান হল আন্টার্কটিকা। তাই

অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিকের পাতায়-পাতায় এর বর্ণনার ছড়াছড়ি। সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে স্মিথ বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ান জিওগ্রাফিক হল আমার হবি, আমার প্রাণ'।

ডাকটিকিটে রাজশিশু

১৯৮৮-র বিখ্যাত রাজশিশু রাজকুমারী বিট্রাইস সম্প্রতি আবার সংবাদের শিরোনামে। এই বয়সেই সে ডাকটিকিটে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নিউজিল্যান্ডের তিনটি 'হেলথ স্ট্যাম্প' সিরিজে রাজকুমারী বিট্রাইসকে একাকী ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে

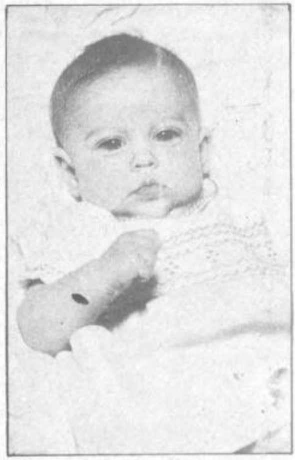

দেখা গেছে। নিউজিল্যান্ডের হেলথ স্ট্যাম্প প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। সেই থেকে রাজপরিবারের শিশুরা ডাকটিকিটে আবির্ভূত হয়ে আসছে। রাজকুমারী বিট্রাইসও সেই ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রথম হেলথ স্ট্যাম্পে রাজকুমারী এলিজাবেথ ও মার্গারেট রোজকে দেখা গিয়েছিল। সবুজ রঙের তিনকোনা সেই ডাকটিকিট দুটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই ১৯৪৪ সালের হেলথ স্ট্যাম্পে পুনরায় তাদের গার্ল-গাইড ইউনিফর্মে দেখা যায়। এর পর যথাক্রমে দেখা যায় রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের দুই সন্তান রাজকুমার চার্লস ও রাজকুমারী অ্যানকে। এর পরই আবির্ভাব রাজকুমারদ্বয় অ্যান্ড্রু ও এডওয়ার্ডের। ১৯৮৫ সালের ডাকটিকিটে দেখা যায় রাজকুমার চার্লস ও রাজবধূ ডায়নার পুত্রদ্বয় রাজকুমার উইলিয়ামস ও হেনরিকে। মাত্র সাড়ে তিন মাস বয়সে তোলা রাজকুমারী বিট্রাইসের এই ছবিটি এই ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে।

কবিতা রায়

তীর্থের কাক

তুলসী সেনগুপ্ত

সাঘাটা থেকে পাক্কা সাত মাইল হাঁটাপথে ভরতখালির জাগ্রত কালীমন্দিরের জন্য লোক সমাগম খুব। ফলে ফল-ফুলের, খাবারের দোকানের অভাব নেই। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে এখানে। ব্যবসায়ী-বুদ্ধির লোকেরা তার সুযোগ নিতে ছাড়ে না। মন্দির-কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি অতিথিশালা নির্মাণ করতে পেরেছে। তাও আবার দু'-তিন মাস আগাম টাকা পাঠিয়ে বুকিং করতে হয়। হুট করে চলে এলে বড়ই বিপদে পড়ে ভক্তবৃন্দ। তখন তাদের বাধ্য হয়েই ওইসব মাটির ঘর ভাড়া নিতে হয় ওই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। বড়-ছোট-মাঝারি ঘর সবই আছে। যার যেমন ক্ষমতা সে সেই রকম ঘর ভাড়া নিয়ে দিনকয়েক এখানে থেকে পুজো দিয়ে ভোগ নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঘরের মেঝেতে শোবার অভ্যেস যাদের নেই, তারা অবশ্য তক্তপোশ ভাড়া নেয় অধিকাংশ ভক্তই বড় দীন-দরিদ্র তাই ওরা বাধ্য হয়েই খড়-ছড়ানো বিছানায় চাদর পেতে রাত্তির কাটায়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে মন কষাকষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকে প্রতিদিন।

সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয় মুকুন্দ ঘোষ আর হরিচরণ দাসের মধ্যে।

জমি-জায়গা, লোক-লশকর দু'জনের প্রায় সমান-সমান।

লোকে বলে, ওরা হল সাপ আর নেউল।

তবে কে যে সাপ আর কে যে নেউল, সেটা পরিষ্কার করে কেউ-ই বলে না।

সদানন্দ এসব শুনে-দেখে, মুখ টিপে হাসে। গুনগুন করে

কীর্তনের সুরে কী-একটা গান গায়, তা কিন্তু কেউই বোঝে না। দু'পক্ষের ঝগড়া যখন তুঙ্গে ওঠে, তখনই সদানন্দের মুখ-চোখ চকচক করতে থাকে, প্রসন্ন দেখায় ওকে বড় বেশি।

ঝগড়া বাধে প্রায়-সময়ই খদ্দের নিয়ে।

মুকুন্দ ঘোষের লোক বলে, "আমাদের ওখানে চলুন, রাজার হালে থাকবেন।"

হরিচরণ দাসের লোক সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেয়, "রাজার হাল না ছাই। আমাদের ঘরে চলুন, সম্রাটের মতো থাকবেন। সর্বক্ষণ আপনাদের সেবায় আমাদের লোক দেখাশুনোর জন্য প্রস্তুত।"

সম্রাট আর রাজা নিয়ে যখন দু'পক্ষই গলা চড়ায়, পরে হাতের গুলি পাকিয়ে এ-ওকে তাড়া করার ভঙ্গি করে, আস্ফালনে মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শোনাই যায় না। আর নিরীহ মানুষজন হতভম্ব হয়ে ওদের দিকে যখন সোৎসাহে সব দেখতে থাকে ঠিক সেই ফাঁকে সদানন্দর লোক ভক্তজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, "আসুন আমাদের সঙ্গে। সদানন্দবাবুর ঘরদোর দেখুন। পছন্দ হলে থাকবেন, না হলে ওই সাপ-নেউলের খপ্পরে গিয়ে পড়বেন। দু'রাত্তিরেই পকেট সাফ, মালপত্তর উধাও হয়ে যাবে।"

কথাগুলো শোনামাত্রই লোকজন সুট-সুট করে সদানন্দর লোকের সঙ্গে সরে পড়ে।

উষালগ্নেই সদানন্দ ধোওয়া কাপড় পরে ছোট্ট মতন অফিসে বসে জানালার দিকে গভীর মনোযোগ সহকারে চেয়ে থাকে। যদি চোখে পড়ে ওদের লোকজনের সঙ্গে নতুন কোনও নর-নারী, তা হলে মুহূর্তেই চণ্ডীপাঠে মগ্ন হয়ে পড়ে। সেই মগ্নতা কাটানো বড় কঠিন কাজ। ওর লোকজন মুখে কুলুপ এঁটে ভক্তিরসে গদগদ হয়ে সঙ্গের লোকেদের ইশারায় বলে, "এ ঘোর কাটতে ওঁর আরও আধ ঘণ্টা লাগবে। আপনারা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। চলুন ঘরদোর আমরাই দেখাই।" সত্যি বলতে কি, সঙ্গের লোকজনের মন সেসময় বড় বেশি নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল। তাই কথা না বাড়িয়ে সদানন্দর লোকেদের

সঙ্গে ঘর দেখায় এগিয়ে যায়। দরদাম প্রায় মাথায় ওঠে। পাঁচ টাকার ঘর আর তক্তপোশ ভাড়া করে বলে, "বাঁচলুম, এখন যত শিগগির পারেন চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করুন।"

এ-কথা যে অতিথিরা বলবে, তা ওদের জানাই।

ছোট্ট একটি ছেলে গেঞ্জি গায়ে এগিয়ে এসে বলে, "কী দেব বলুন ?"

অর্ডার পেয়ে ছেলেটি চলে যাওয়ার সময় হাসি-হাসি মুখে বলে, "আমাকে '**নিধু**' বলে ডাকবেন। সারাক্ষণ আমি আপনাদের সেবাতেই আছি।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তারের বউয়ের ধর্মে মতি খুব। নতুন বছরের শুরুতেই নিভাননী দেবীর আর কিছু হোক আর না হোক, পঞ্জিকা চাই-ই। রংপুর টাউন লাইব্রেরিতে চিঠি যায় ব্যোমকেশ-ডাক্তারের। ওই লাইব্রেরির মালিক যামিনী সাহা ভালই চেনেন ব্যোমকেশ-ডাক্তারকে। পঞ্জিকা পাঠাতে এতটুকু গড়িমসি করেন না। ভি.পি. করে বই পাঠিয়ে দেন।

পঞ্জিকা এনে মুখে থইথই হাসি নিয়ে বলেন ব্যোমকেশ-ডাক্তার, "এই নাও তোমার সাধের পাঁজি।"

নিভাননী দেবী পান-টসটসে মুখে এগিয়ে এসে পঞ্জিকা হাতে নিয়ে কী বলতে গিয়েই পানের রসে কাপড় নষ্ট করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

ব্যোমকেশ-ডাক্তার "করছ কী, করছ কী" বলে পাঁজি সরিয়ে বলেন, "ডাবর রয়েছে কী করতে, অ্যাঁ ?"

নিভাননী মুখের রস পিচিক করে জানালা দিয়ে ফেলে বলেন, "বছর ফুরোতে এখনও দিন কুড়ি বাকি, এরই মধ্যে বই বেরিয়ে গেল ?"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, "তোমার হাতে এনেও দিলুম বলো !"

নিভাননী পঞ্জিকা হাতে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন। কবে কোন ব্রত কোন পুজো, সব দেখায় মন দিলেন। শুধু তাই নয়, আকর্ষণীয় সব বিজ্ঞাপনও কণ্ঠস্থ করে ফেললেন।

ভরতখালি কালীমন্দিরের বেশ বড় রকমের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল আর কবিতার আকারে মায়ের মহিমা দু'বার পড়তেই কণ্ঠস্থ হয়ে গেল।

মায়ের নামেতে দাও নৈবেদ্য ও ভোগ।
শোক তাপ দূর হইবে, মুক্ত হইবে রোগ ॥

আর যায় কোথায় ! ভরতখালি কালীমন্দিরে যাবার জন্য নিভাননী দেবী অস্থির হয়ে ঘর-বার করতে লাগলেন। কেননা, এ-সময় ব্যোমকেশ-ডাক্তার চিনির পটল গাঁয়ে গেছেন রোগী দেখতে। তাও আবার যে-সে লোকের বাড়ি নয়, খোদ পঞ্চায়েত-প্রধান **নীরোদ** চাকীর বাড়ি। ব্যোমকেশ-ডাক্তার ফিরে এসে বলেন, "**নীরোদবাবুর কী** যে হয় বুঝি না !"

ও-কথা কানেও গেল না নিভাননী দেবীর। বললেন, "ভরতখালিতে জাগ্রত কালীমন্দির আছে জানো ?"

"কার মুখে যেন ভরতখালি কালীমন্দিরের কথা শুনেছিলাম।"

নিভাননী দেবী প্রসন্ন মুখে বললেন, "শুনবে বইকী।" বলেই পাঁজিতে ছাপা বিজ্ঞাপনটা হুবহু আওড়ে শোনালেন।

ব্যোমকেশ-ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধে হল না নিভাননী দেবীকে। সোৎসাহে উত্তর দিলেন, "দিনকয়েকের জন্য ঘুরেই আসি ভরতখালি।"

মুহূর্তেই মুখ উপচে হাসি ঝরে পড়ল নিভাননী দেবীর। অমনি বললেন, "আগামী সোমবার যাত্রা শুভ বেলা দশটার পর। তা না হলে দিন-পনেরো পর ভাল দিন আছে।"

ব্যোমকেশ গুপ্ত এল এম এফ সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন, "কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম। কিন্তু গোল পাকিয়েছে **নীরোদ** চাকী। আমরা পুজো সেরে ফিরে এলে অসুখে পড়লেই পারতিস। তা না চিৎপটাং হলেন বাবু এখনই।"

নিভাননী দেবী সামান্য সময় চিন্তা করে বললেন, "তা আর কী করবে বলো ! রোগ কী কখনও কাউকে জানান দিয়ে আসে ? বরং এ-সময় **নীরোদবাবুর** অসুখ হওয়ায় আমাদেরই সুবিধে হল।"

কথা ক'টি কানে যেতেই ব্যোমকেশ-ডাক্তারের মাথাও পরিষ্কার হয়ে গেল। হোহো করে হেসে বললেন, "খাঁটি বুদ্ধি তোমার। এ-সবই মহামায়ার কৃপা।"

নিভাননী দেবী বললেন, "আজ বিকেলেই পঞ্চাননকে নিয়ে আমি **নীরোদবাবুর** বাড়ি যাব। ওঁর বউকে বলব, "মায়ের নামেতে দাও নৈবেদ্য ও ভোগ।/ শোক তাপ দূর হইবে, মুক্ত হইবে রোগ ॥"

রোদের তাপ কমতে-না-কমতেই পঞ্চাননকে সঙ্গে নিয়ে নিভাননী দেবী **নীরোদ** চাকীর বাড়িমুখো হলেন।

নীরোদ চাকীর বউ শেফালি ব্যোমকেশ-ডাক্তারের বউকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "কী সৌভাগ্য আমার। আপনার পায়ের ধুলোয় বাড়ি ধন্য ও পবিত্র হল।"

নিভাননী দেবী ও কথার বেশি গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, "**নীরোদবাবুর** খবরে মন খুব ব্যাকুল হয়ে আছে। অবশ্য উনি বলেছেন, দিন দশেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবু কী জানো ভাই, এই যে ঘনঘন অসুখ, এটা ভাল নয়। সকলের জন্যই পুজো দিতে যাব ভরতখালির মন্দিরে।" বলেই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনটা মুখস্থ বলে শেফালির দিকে চেয়ে রইলেন।

শেফালি কালবিলম্ব করলেন না। শ'খানেক টাকা নিভাননী দেবীর হাতে দিয়ে বললেন, "ওঁর অসুখ না থাকলে আমিও যেতাম। আর কী করব। ওঁর আরোগ্য কামনা করে পুজো দিন দিদি।"

টাকাগুলো আঁচলে বাঁধতে-বাঁধতে বললেন নিভাননী দেবী, "স্বামী-স্ত্রী না গেলে তো মনস্কামনা পূর্ণ হবে না ভাই। যদিও উনি বলেছেন, **নীরোদবাবুর** সামান্য সর্দিজ্বর। যা ওষুধ দিয়েছেন তাতেই ষোলো আনা ফল পাবেন।"

শেফালি দেবী বললেন, "বহুবার দেখেছি, ডাক্তারবাবুকে চোখে দেখলেই ওঁর রোগ সেরে যায়। চোখে দেখাই শুধু নয়, ওষুধ-পথ্যিও লিখে দিয়ে গেছেন উনি। আপনি যত শিগগির পারেন, ওই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসুন। এ ছাড়া আসছে বছরেই আবার ভোট। ওতেও যাতে আবার জয়ী হতে পারেন, তার জন্যও আলাদা পুজো দেবেন দিদি।"

নিভাননী দেবী বললেন, "বলে ভালই করেছ ভাই, নইলে ওটা এবার বাদ পড়ে যেত।"

কথা শেষ করে মহামায়া করতে-করতে **নীরোদ** চাকীর বাড়ি থেকে খুশি মনে বেরিয়ে এলেন।

ভরতখালিতে পা রাখতে-না-রাখতেই মুকুন্দ ঘোষ আর হরিচরণ দাসের লোকের খপ্পরে পড়ে গেলেন ব্যোমকেশ-ডাক্তার আর নিভাননী। দু'পক্ষের লোকের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি তুঙ্গে, ঠিক সেই ফাঁকে সদানন্দর লোক অস্ফুট গলায় বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে।"

দৈববাণী শুনতে পেলেন যেন ব্যোমকেশ গুপ্ত। নিভাননীকে ইশারা করে ওখান থেকে সরে পড়লেন।

দশ-বারো হাত দূর থেকেই সদানন্দর চণ্ডীপাঠ কানে গেল ওঁদের।

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন, "এমন সুন্দর চণ্ডীপাঠ করছে কে

শুনি ?"

লোকটা দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যই উনি আপনাদের সকলের এই বন্দোবস্ত করেছেন। বড় সাত্ত্বিক, পবিত্র আর ন্যায়নিষ্ঠ সদানন্দ পাল। উনিই আমাদের রক্ষক, উনিই আমাদের উপাস্য।" বলেই **জোড়হাতে** সদানন্দকে লক্ষ করে কপালে ঠেকায় লোকটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিধু, ব্যোমকেশ-**ডাক্তার** আর নিভাননী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "খিদে-তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছেন তো ! বলুন কী আনব আপনাদের জন্য ?"

নিভাননীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুহূর্তে। কী-কী পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে ছ'টা করে ফুলকো লুচি আর চায়ের কথা বলে নিশ্চিন্ত হন।

নিধু সুট করে ওখান থেকে সরে পড়তেই সদানন্দর লোকটি বলল, "আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না সার। এবার ঘরে গিয়ে জিরিয়ে নিন।" সদানন্দকে দেখিয়ে বলে, "আর আধঘণ্টা পর উনি নিজেই গিয়ে আপনাদের খোঁজ-খবর করে আসবেন।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার আর নিভাননী দেবী লোকটির সঙ্গে একটা ঘরের ভেতরে গেয়ে ঢোকেন।

জানালা খুলতেই রোদে ভরে যায় ঘর হাওয়াও ঢোকে হুহু করে।

বেশ খুশি হয়ে নিভাননী দেবী বলেন, "সবই ভাল তবে···

খপ করে ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লোকটি বলে, "আমি হচ্ছি শ্যামাচরণ দাস। বুঝতে পেরেছি জননী, তক্তপোশ চাই তো ?"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বলেন, "চটজলদি মনের কথা বোঝো কী করে হে ?"

"সবই মায়ের কৃপা !" বলেই শ্যামাচরণ জোড়হাত কপালে ঠেকায়। মিনিটখানেক চোখ বুজে বলে, "আপনাদের তো দুটো তক্তপোশ লাগবে, আপনারা চার টাকা দেবেন। ওদের ওখানে দুটো তক্তপোশের ভাড়া নেবে ছ' টাকা। মায়ের পুজো দিতে এসেছেন। মিছিমিছি ঠকাব কেন বলুন ?"

একেবারে জল হয়ে যান নিভাননী দেবী। বলেন, "আচ্ছা তাই হবে, শিগগির এর ব্যবস্থা করো শ্যামাচরণ।"

ও-কথা শেষ হতে-না-হতেই সদানন্দ "মহামায়া কী হয়," বলে ঘরে ঢোকে।

ব্যোমকেশ-ডাক্তার আর নিভাননী দেবীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, "না বললেও বুঝি কার কী দরকার। ওরে প্রফুল্ল, দেরি করিসনি বাবা, জগদীশ আর তুই তক্তপোশ ঘরে নিয়ে আয়।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন, "ওগুলো ঘরে রাখলেই তো পারেন ?"

সদানন্দ বিনীত গলায় বলে, "তা পারি। তবে কী জানেন, ভক্তরা সব ভিন্ন প্রকৃতির। কেউ ভাবেন, অধিক কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি দ্রুত হয়, আবার কেউ ভাবেন, কৃচ্ছ্রসাধন করতে যাব কেন, পবিত্র মনই তো সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পথ।"

সদানন্দের শুদ্ধভাষা শুনে নিভাননী দেবীর বিস্ময় যেমন হয়, তেমনি শ্রদ্ধাও জাগে মনে।

বলেন, "একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার ভুরু কুঁচকে সদানন্দের দিকে চেয়ে বলেন, "আপনার কণ্ঠস্বর আমার কেমন যেন পরিচিত ঠেকছে। আপনার নাম কী জানতে পারি ?"

সদানন্দ মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে কী ভাবে। পরে ধীরে-ধীরে চোখ মেলে বলে, "বড় দুঃখের জগৎ, তাই পিতৃদেব আমার নাম দিয়েছিলেন সদানন্দ।"

"বড় চমৎকার নাম।" ব্যোমকেশ-ডাক্তার টেনে-টেনে উচ্চারণ করেন, "স-দা-ন-ন্দ। বাহ্‌, বাহ্‌, চমৎকার।"

নিধু ঠিকসময় ফুলকো লুচি-তরকারি আর চা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

সদানন্দ তা দেখে বলে, "মূর্খ। আগে জলখাবার, তারপরে চা দিতে হয়। নইলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে না ?"

নিভাননী দেবী বলেন, "ছেলেমানুষ, সব ঠিকঠাক বোঝে না তো !"

"জয় মহামায়া। তোমার কী অপূর্ব মহিমা !" প্রায় স্বগতোক্তির মতো কথা ক'টি উচ্চারণ করে সদানন্দ।

ঠিক সে-সময় প্রফুল্ল আর জগদীশ ধরাধরি করে তক্তপোশ ঘরে ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সদানন্দ বিনীত **গলায় বলে,** "বিছানাপত্তর কিন্তু নিজেদেরই।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বলেন, "সেটাই স্বাস্থ্যসম্মত।"

"আপনি চিকিৎসক নিশ্চয়ই ?" সদানন্দ প্রশ্ন করে উৎসাহী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

"সবই ওঁরই কৃপা।" ব্যোমকেশ-ডাক্তার উত্তর দেন।

সদানন্দ সহাস্য-মুখে উত্তর দেয়, "আপনারা তা হ'লে বিশ্রাম নিন। আমি আর সকলের খোঁজখবর করিগে।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বলেন, "সুন্দর ব্যবস্থা আপনার। এমনটি আর কোথাও দেখিনি।"

ঘর ফাঁকা হতেই ব্যোমকেশ-ডাক্তার নিভাননী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বড় সুবিধের জাগয়া নয় গো। একটু সাবধানে থেকো।"

নিভাননী দেবীর গা-ছমছম করে ওঠে। মুখ **ফ্যাকাসে** হয়ে যায়।

ওঁকে ওরকম হতে দেখে ব্যোমকেশ-ডাক্তার বলেন, "মহামায়ার অপার করুণা। দেখি ভেলকিটা কে দেখায়।"

নিভাননী দেবী এবার সাহসী হয়ে যান কেমন যেন। বলেন, "ওটা সঙ্গে এনেছি।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন, "জানি। ও ভুল আর তুমি করবে না।"

বোনারপাড়ার বৈদ্যনাথ চাটুজ্যের খ্যাতি সকলের মুখে-মুখে। কেননা, ফাঁসির আসামিকেও সসম্মানে মুক্ত করে আনতে পারেন জেরার জোরে। জজ-ব্যারিস্টাররাও খাতির করেন খুব। যে-পক্ষের হয়ে বৈদ্যনাথ উকিল দাঁড়ান, তার দিকেই পাল্লা ভারী হয় এ-কথা সবাই জানে। বিশেষ করে অল্পবয়সী জজ-ম্যাজিস্ট্রেট যেই না দেখেন বৈদ্যনাথ-উকিলকে, অমনি ওদের পিলে চমকে যায়। "ইয়োর অনার," বলে কোর্টে যখন সওয়াল করতে শুরু করেন, তখন কোর্টরুমে নেমে আসে অভূতপূর্ব নিস্তব্ধতা। শুধু গমগম করতে থাকে বৈদ্যনাথ-উকিলের গলা। অনেকরকম গালগল্প আছে ওঁর সম্পর্কে। কেউ বলে **হাইকোর্টের,** কেউ-বা বলে সুপ্রিম কোর্টের জজ হওয়ার ডাক দু'-তিনবার উনি বাতিল করেছেন স্বেচ্ছায়। সুতরাং চুনোপুঁটি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তো ওঁকে খাতির করবেনই।

এ হেন জাঁদরেল উকিল বৈদ্যনাথ চাটুজ্যেকেও ঘোল খেতে হয়েছিল হরেরাম মণ্ডলের কাছে। শোনা যায় হরেরাম মণ্ডল দিনের বেলা ঘরামির কাজ করে, আর গভীর রাতে আশপাশের বাড়িতে সিঁধ কেটে দামি বাসন-কোসন, গয়নাগাটি, ঘড়ি-রেডিও, নগদ টাকা-পয়সা সবকিছু ফরসা করে দিয়ে সে-বাড়িতেই সকাল বেলা এসে হাজির

হয়ে সমবেদনা জানিয়ে আসে। মজা হল, ওর কথা সকলে বলে বটে, কিন্তু কেউই ওকে কোনওদিন চোখে দেখতে পায়নি। ওই ঠিক ভূত দেখার মতো ব্যাপার আর কি! যেমন সকলেই বলে ভূত আছে, কিন্তু শুধোলে বলে, না সে দেখেনি, দেখেছে পালেদের বাড়ির কাজের মেয়ে আন্নাকালী। আন্নাকালীকে বললে বলে, সে নয়, দেখেছে পুটুরানি। ওকে জিজ্ঞেস করলে বলে, সে নয় দেখেছে বনমালী। এমনিধারা অনেক গল্প হরেরাম মণ্ডলের নামে প্রচলিত আছে।

সুতরাং বাজখাঁই উকিল বৈদ্যনাথবাবুর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

হরেরামকে একদিন ডেকে বললেন, "তোর মতন দুটো মানুষ নেই রে হরেরাম।"

হরেরাম মাথা নাড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে **সম্মতি** জানায়, যার অর্থ কথাটা যথার্থই বটে।

অমনি বৈদ্যনাথ-উকিল বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন, "ঘুমের ঘোরে মানুষ একরকম মরাই বলতে গেলে, মরা ঠকাস তুই। লজ্জা বলতে কিছু নেই তোর।"

হরেরাম ফিকফিক করে হাসে উকিলবাবুর কথা শুনে।

গা-পিত্তি জ্বলে যায় বৈদ্যনাথের। বলেন, "একবার হাতেনাতে ধরি, তো পাঁচ বছরের জন্য জেলের হাওয়া না খাইয়ে আমি ছাড়ব না।"

হরেরাম বেকুব নয়। টানটান ভঙ্গিতে বৈদ্যনাথ-উকিলের দিকে চেয়ে বলে, "মিছিমিছি আমার ওপরে রাগ করছেন। কেউই দেখেনি, তবু আমাকে নিয়ে মশকরা। দূর ছাই, এ-দেশ ছেড়ে বিলেতে চলে যাব কোনওদিন।"

বৈদ্যনাথ চাটুজ্যে ওর কথা শুনে হোহো করে হেসে বলে, "ও দেশে গিয়ে সাহেবদের জব্দ করতে পারলে বুঝব, তুই যথার্থই মানুষের মতো মানুষ।"

অমনি হরেরাম উত্তর দেয়, "সাহেবরা কী মানুষ নয় না কি! আপনার আইনে এখানে কিছু করলেই অপরাধ, আর ওখানে করলে সেটাই পুরস্কার হবে কেন?"

মুখের ওপরে এমন প্রশ্ন বাঘা উকিল বৈদ্যনাথ চাটুজ্যে আশাই করেননি। হরেরামের আপাদমস্তক দেখে বেশ নরম গলায় বললেন, "নাহ্, তোর সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। দ্যাখ বাপু, আমার জমিজিরেত আছে, টাকা পয়সাও কম নেই। ডাকসাইটে লোক খুঁজছি একজন। তোকে বাজিয়ে দেখছিলাম, তুই ওসবের মধ্যে থাকতেই পারিস না। বলি **কি** তোকে কিছু টাকা দিচ্ছি, মুদিখানা খুলে বোস।"

হরেরাম চোখে সরষে ফুল দেখে বলে, "মুদিখানা আমার বুদ্ধিতে হবে না।"

"তা হলে কী হলে তোর চলে বল?"

"ওই একটাই তো কাজ শিখেছি বাবার কাছে। বাবাও শিখেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে।"

"কী কাজ জানিস তুই?"

হরেরাম ধাঁধায় পড়ে যায়। বলে, "সেটা বলি কী করে হুজুরের কাছে।"

"আহা, এ তো আর কোর্ট নয় যে তোর জেল বা ফাঁসি হবে।"

কথাটা শুনে দুলে-দুলে হাসে হরেরাম। বলে, "জেল বা ফাঁসির কাঠগড়া কোনওটাই আমার জন্য তৈরি হয়নি হুজুর।"

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাধন দত্তকে কথা দিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ-উকিল, যে করেই হোক হরেরামকে বাগে আনবেন। সব চালই যখন প্রায় ডুবুডুবু হঠাৎই বৈদ্যনাথবাবু কিস্তির চাল দিয়ে বললেন, "তোর সংসারের হাল সবই জানি। মাস-মাইনের একটা চাকরি চেয়ারম্যানকে বলে-কয়ে করে দিতে পারি। নাইট-গার্ড মানে চৌকিদার হতে পারবি তো?"

প্রস্তাবটা মনঃপূত হয়ে গেল হরেরামের। চোখের সামনে চৌকিদারের আকৃতি ফুটে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, কাজটা সম্মানের বটে।" সামান্য সময় চিন্তা করে ফের বলল, "নয়নচাঁদের কী হবে তা হলে?"

বৈদ্যনাথ-উকিল বললেন, "ওর সব ভাবনা আমাদের ভাবা হয়ে গেছে। আমরা যদ্দিন আছি, ও না খেয়ে মরবে না।"

চট করে হরেরাম গড় হয়ে প্রণাম করে বৈদ্যনাথ চাটুজ্যেকে। বলে, "তা হলে রাজি।"

কিন্তু দু'মাসের মাথায় হরেরাম খুন হল ঝিলের পাড়ে। লোকজনের ভিড় সামলে বৈদ্যনাথ-উকিল আর সাধন দত্ত, পুলিশ অফিসার অবনী জোয়াদারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

সাদা পোশাকে পুলিশের লোক এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করল দিনকয়েক। খুনের আসামি ধরা পড়ল না। বৈদ্যনাথ-উকিল ঘরে **দুশ্চিন্তাগ্রস্ত** ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। হরেরামের জন্য মনটা ওঁর ভীষণ বিষণ্ণ। ওর মৃত্যুর জন্য, খানিকটা নিজেকেই দায়ী করলেন উনি। চৌকিদারির কাজটা না জুটিয়ে দিলে, হরেরামের মৃত্যু যে ওভাবে হত না, এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। ওইসব ভাবনার ফাঁকে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো পবন বর্মণের নামটা মনে পড়ে গেল। হরেরাম কীসব যেন বলতে চাইত পবনের সম্পর্কে। ঠিক গুছিয়ে বলতে পারত না। শুধু দেখা হলেই পবনের কথা বলত।

কাউকে কিছু না বলে খুব উদাসীন ভঙ্গিতে পবন বর্মণের বাড়ি-মুখো হাঁটা শুরু করলেন বৈদ্যনাথ-উকিল। অনেকটা পথ হেঁটেছেন তাই ক্লান্ত এমন ভাব করে পবনের বাড়িতে ঢুকলেন।

পবন ওঁকে দেখে বললেন, "আজ্ঞে আপনি?"

"বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে পবন।"

মাদুর পেতে বসতে দেয় পবন উকিলবাবুকে, "বসুন আনছি।"

পবন চলে যেতেই পবনের বাড়ির চারপাশটা ভাল করে নজর করলেন বৈদ্যনাথবাবু। কাচের গ্লাসে জল এনে হাজির হল পবন। বলল, "নিন হুজুর।"

এমন সুন্দর শৌখিন কাচের গ্লাস আর কারও বাড়িতে আছে কি না ভেবে নিলেন বৈদ্যনাথ-উকিল। নিজের বাড়িতেও তো এরকম নেই। রুমাল দিয়ে জলের গ্লাসটা ধরে জল পান করে বললেন, "কোত্থেকে জোগাড় করেছিস রে এ গ্লাস? বড় সুন্দর দেখতে কিন্তু। যা দাম লাগে আমি দেব, এ-গ্লাসটা আমায় বেচে দে।"

পবন বলল, "ছিঃ হুজুর। এই সামান্য জিনিসটা দিয়ে আপনার মতো মানুষের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারি। ও আপনি এমনি নিয়ে নিন।"

রুমালে ধরা গ্লাসটা ঠিক তেমনি ধরে রইলেন বৈদ্যনাথ-উকিল। বললেন, "তোরা সত্যিই আমাকে খুব ভক্তি করিস দেখছি। আর দেরি করতে পারছি না **পবন**, এবার চলি। একদিন যাস।" কথা শেষ করে হনহন করে বৈদ্যনাথ-উকিল দ্রুত অদৃশ্য হয়ে সোজা এলেন অবনী জোয়ারদারের কাছে।

অবনী জোয়ারদার ভুরু কুঁচকে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! এখনই এটা ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ডাক্তারবাবুকে বলে রাখবেন সব।"

বৈদ্যনাথ-উকিল আর দাঁড়ালেন না। ব্যোমকেশ-ডাক্তারকে সবিস্তারে সব বলে বাড়ি ফিরলেন বেশ হালকা মনে।

গ্যাং-লিডার মহাদেব মিত্তির সব শুনে বেশ গম্ভীর মুখে বললেন, "সব গুবলেট করে দিলি পবনা।"

পবন কাঁচুমাচু মুখ করে চেয়ে রইল মহাদেবের দিকে।

মহাদেব সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন টান দিতে দিতে বলল, "এখন মাস কয়েকের জন্য এদের সক্কলকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়। নইলে ফ্যাসাদে পড়বি।" বলেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে বলল, "পারিস তো বৈদ্যনাথ-উকিলকে খতম করে যাবি। ওসব জঞ্জাল পৃথিবীতে না থাকাই ভাল।"

বুকের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেলেও পবন তা মুখে প্রকাশ করল না। রিভলভারটা হাতে নিয়ে বেশ সাহসী হয়ে উঠল মুহূর্তে।

মহাদেব চলে গেলেই পানু, লখাই, জহিরউদ্দিন কাঁদো-কাঁদো গলা করে বলল, "বগুরা না হয় নীলখামারি পালিয়ে যাই।"

"যাওয়ার আগে শেষ খেলাটা খেলে যাব না।" পবন চোয়াল শক্ত করে উত্তর দিল।

পানু, লখাই, জহির পরস্পরের মুখের দিকে চাইল।

ভয়ে জহির বমি করতে শুরু করল। মুখে-হাতে জল দিয়ে খানিকটা শান্ত হলেও বুকের ভেতরে কম্পন থেকেই গেল। "শিগগির ডাক্তার ডাক পবন, মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না।" কথা শেষ করতে-না-করতেই ফের ওয়াক পেড়ে বমি করল।

পবনের ইশারায় পানু দৌড়ে গিয়ে ব্যোমকেশ-ডাক্তারকে খবর দিল। একঘর রুগি, তা সত্ত্বেও পবনের নাম শুনে টানটান হয়ে সব শুনলেন। তারপর ঘরের রুগিদের বললেন, "সিরিয়াস কেস, এক্ষুনি না গেলে নয়। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।" উত্তরের অপেক্ষা না করে ব্যোমকেশ-ডাক্তার সাইকেল চালিয়ে পবনের বাড়ি এসে হাজির। রুগিকে ভালমতন পরীক্ষা করে বললেন, "এ তো যে-সে রোগ নয় পবন?" বলেই পবনের দিকে কঠিন চোখে চেয়ে রইলেন।

পবন বলল, "আপনি ডাক্তার, যা ভাল বুঝবেন করবেন!"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন, "ভয় পেলে সাধারণত মানুষের এরকম হয়।" ইচ্ছে করেই বললেন কথাটা। নজর কিন্তু পবনের দিকে রেখেই দিলেন।

পানু, লখাই করুণ মুখ করে চেয়ে আছে। পবনের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেমন যেন।

পবন যথেষ্ট সংযত হয়ে উত্তর দিল, "ও তো ভয় পাওয়ার পাত্তরই না।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার সে কথায় বললেন, "সবচেয়ে শক্তিমান মানুষও কখনও কখনও অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ে। যাকগে, যা ওষুধ দিলাম, এগুলো ঠিকমতো তিনবার খাওয়াস। খুব খিদে না পাওয়া পর্যন্ত ওকে কিচ্ছু দিস না।" ফিয়ের টাকা পকেটে গুঁজে ফের সাইকেল চেপে হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন। রুগিদের দেখে ঘরে গেলেন যখন, তখন বেলা দেড়টা। এমনটা প্রায়ই হয়, বেশি ভাবলেন না ব্যোমকেশ-ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু চলে যেতেই মহাদেব মিত্তির গম্ভীর মুখে বলল, "জহির এমন সময় যে ল্যাঠা বাধাবে, কে জানত?"

পবন বলল, "অসুখ করেছে তো রাগের কী আছে?"

"সে-বুদ্ধি যদি তোদের থাকতই তো মহাদেব মিত্তির তোর অধীনে কাজ করত। এবার যা বলি শোন। গেলাসটা ওভাবে নিয়ে যাওয়ার মাঝে উকিলবাবুর কোনও চাল আছে। আর ব্যোমকেশ-ডাক্তারকেও দেখলাম, যতটা না রুগি দেখল, তার থেকে বেশি পবনাকে লক্ষ করছিল। পবনা রে, তোর সামনে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

পবন রিভলভারটায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে বলল, "তোমার কী পরামর্শ শুনি?"

মহাদেব মিত্তির বলল, "হরেরামকে মারতে গেলি কেন?"

১৯০৬ : স্যান্টোস ডুমন্ট, ১৪ বিস

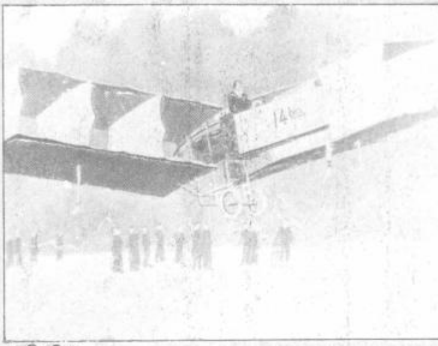

১৪ বিস বিমান

এই সময় ইউরোপেও বিমান চালনা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছিল। এক কিলোমিটার রেঞ্জে প্রথম সফল বাতাসের চেয়ে ভারী বিমান চালনার জন্য ৫০,০০০ ফ্রাংক পুরস্কার ঘোষণা করলেন অঁরি ডয়েশ ও অর্নেস্ট আর্কডিকন। ১৯০৫ সালে আন্তর্জাতিক এরোনটিকাল ফেডারেশন ও আমেরিকান ফেডারেশন গঠিত হল, তাঁরা বিমান চালনা-সংক্রান্ত রেকর্ড রাখতে লাগলেন। যদিও তখনও সফল বিমান হয়নি, কিন্তু ফ্রান্সে বিমানের উপযোগী হালকা এঞ্জিন তৈরি আরম্ভ হল, নাম দেওয়া হল আঁতোয়ানেত। মূলত গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা চালালেন এসনাউ পেলটেরি, ফার্বার ও ভয়সিন।

অবশেষে ইউরোপে প্রথম বিমান চালনায় সফল হলেন আকাশজাহাজ বা এয়ারশিপ-নির্মাতা অ্যালবার্তো স্যান্টোস ডুমন্ট। তিনি একটি অদ্ভুতদর্শন বিমান তৈরি করলেন। জুলাই মাসে এই বিমানটিকে প্রথম আকাশে ঘোরানো হয় ডুমন্টের ১৪ নম্বর এয়ারশিপের তলায় বেঁধে, তাই বিমানের নাম দেওয়া হল 'ফোরটিন বিস' বা চোদ্দর লেজুড়। ১৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ব্যাগাটেলিতে '১৪ বিস' আকাশে উড়ল মাত্র ৭ মিটার, তারপর সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। স্যান্টোস ডুমন্ট দমলেন না, বিমানে আরও শক্তিশালী ৫০ অশ্বশক্তির এঞ্জিন লাগানো হল। ২৩ অক্টোবর বিমান আবার আকাশে উড়ল, এবার ৬০ মিটার অবধি। ২০ মিটারের বেশি ওড়ার জন্য স্যান্টোস ডুমন্ট ৫০,০০০ ফ্রাংকের আর্কডিকন পুরস্কার পেলেন। ডুমন্ট মনে করেছিলেন তিনিই প্রথম বিশ্বের সফল বিমানচারী, কিন্তু যখন তিনি রাইট ভাইদের কথা জানতে পারেন, তাঁদের অভিনন্দন জানান। ডুমন্ট হলেন ইউরোপের প্রথম বিমানচালক। ১৪ বিস-এর নকশা মোটেই কার্যকরী ছিল না, সঙ্গের ছবিতে তার চেহারা দেখানো হল।

'১৪ বিস' বিমানের বিশদ পরিচয়
নির্মাতা : অ্যালবার্তো স্যান্টোস ডুমন্ট
ডানা : ৩৮ ফুট বা ১১·৫ মিটার।
খালি অবস্থায় ওজন : ৬৬০ পাউন্ড বা ৩০০ কেজি।
যাত্রীসংখ্যা : একজন বৈমানিক।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ২৫ মাইল বা ৪০ কিমি
এঞ্জিন : একটি ৫০ অশ্বশক্তির আঁতোয়ানেত।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

"ইচ্ছে করে মেরেছি নাকি, মরে গেল যে !"

"ও কী ভীষ্ম যে ইচ্ছামৃত্যু হবে ? অমন প্যাকলা হরেরামকে জুতসই খানকয়েক দিলেই চলত।"

পবন গাঢ় গলা করে উত্তর দিল," মেলা ফ্যাচাং কোরো না। সোজা কথার মানুষ আমি। দেড়-দু'হাজার টাকা দাও, পানু, লখাই, জহিরকে নিয়ে একদম বেপাত্তা হয়ে যাব। আমরা সরে পড়াতেই তোমাদের বাঁচা-মরা। দেরি কোরো না। ট্যাঁক খসাও, আমরাও সরে পড়ি।"

মহাদেব মিত্তির কৃপণের শিরোমণি। তবু এ-ক্ষেত্রে দেড় হাজার টাকা পবনের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এবং আর কাকে দলে ভেড়ানো যায়, সেসব কথা চিন্তা করছিল।

সে-রাত্তিরেই পবন ওর সঙ্গীদের নিয়ে বোনারপাড়া ছেড়েছিল, তারপর আর কখনও ফিরেও যায়নি ওখানে।

পুলিশও ওদের ধরার নানান চেষ্টা করেও বিফল হল। হরেরামের কথা ভুলেই গেল প্রায়।

এরই মাঝে তিনটে বছর কেটে গেছে। এরপরই ব্যোমকেশ-ডাক্তার ট্রান্সফার হয়ে সাঘাটা এলেন।

সন্ধেয় সস্ত্রীক আরতি দেখতে গেলেন ব্যোমকেশ-ডাক্তার। ভিড় দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন উনি। "কী ভিড় গো !"

নিভাননী ভক্তি-গদগদ গলায় উত্তর দিলেন, "হবে না জাগ্রত দেবীর থান এটা। তার ওপরে মঙ্গলবারের অমাবস্যা।"

কথা না বাড়িয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে গিয়েই জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন বৈদ্যনাথ-উকিলকে। কাঁসর-ঘণ্টার ঝমঝমানি আর জমায়েত ভক্তদের কণ্ঠ থেকে 'জয় কালী, জয় কালী' ধ্বনিতে পুজো-প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর। এরই ফাঁকে নিভাননীকে বললেন, "এখান থেকে কোথাও যেয়ো না, আমি আসছি।" বলেই সাধ্যি-সাধনার পর বৈদ্যনাথ-উকিলের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

বৈদ্যনাথ চাটুজ্যে আগেই ব্যোমকেশ-ডাক্তারকে দেখে ফেলেছিলেন। জোড়হাত-করা অবস্থাতেই শুধোলেন, "কেমন আছেন ডাক্তারবাবু ?"

ব্যোমকেশ-ডাক্তারও অস্ফুট গলায় উত্তর দিলেন, "ভালই। কবে এলেন এখানে ?"

"ঘণ্টা দুয়েক আগে।"

"বাইরে চলুন, কথা আছে।"

ভিড় ঠেলে ওঁরা বাইরে ছাতিম গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন।

বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "পৃথিবী যে গোল তার প্রমাণ এখানেই।"

"শুধু গোল নয়, গোলে ভরা।" উত্তর দিলেন ব্যোমকেশ-ডাক্তার।

শিহরিত হলেন বৈদ্যনাথ-উকিল। বললেন, "মায়ের থানে গোল, এ তো ভাল কথা নয়। মানসিক ছিল, স্ত্রীর তাড়নায় পুজো দিতে এলাম।"

"ভালই করেছেন। নইলে তো···

বেশি উৎসাহী হয়ে বললেন, "নইলে কী ?"

"এখানকার থানা-পুলিশে জানাশোনা আছে তো ?" ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন।

"কেন ? আবার কী হল ?"

"নতুন কিছু নয়, পুরনোই।"

প্রায় শব্দ করে হেসে ফেলেছিলেন বৈদ্যনাথ-উকিল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "অবনী জোয়ারদার তো এখন এখানেই পোস্টেড।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার চাপা গলায় বললেন, "হরেরামের মৃত্যুর কিনারা এবার হবে মনে হচ্ছে।"

বিমর্ষ হয়ে গেলেন হরেরামের জন্য প্রথমটায় বৈদ্যনাথ-উকিল। জিজ্ঞেস করলেন, "ক্লু পেয়েছেন বুঝি ? ব্যোমকেল-ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "উঠেছেন কোথায় ?"

"এক মক্কেলের বাড়ি। হলদিচড়ায়।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন, "ভালই করেছেন। এদিকে বেশি মাড়াবেন না। পারেন তো আজই অবনী জোয়ারদারকে সদানন্দর আখড়ায় নজর রাখতে বলবেন। হলদিচড়ায় কার বাড়ি ?"

"সত্যেন রায়ের বাড়ি।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বললেন, "এখন যান। আমিও যাই। পারি তো কাল-পরশু সত্যেন রায়ের বাড়ি যাব।" কথা শেষ করেই 'জয় কালী' 'জয় কালী' করতে করতে ভিড়ের মধ্যে চলে গেলেন।

বৈদ্যনাথ চাটুজ্যে ডাক্তারের কাণ্ড দেখে মুচকি হাসলেন শুধু।

সদানন্দ বলল, "ডাক্তারদের দেবদেবীতে ভক্তি দেখছি ইদানীং খুব।"

ওর শাগরেদদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, "হবে না কেন। রোগ কী ওরা সারায় ?"

আর-একজন বলল, "তুই ঠিক বলেছিস। সব-কিছুর মূলেই আছেন আমাদের মহামায়া।"

সদানন্দ ধমকে বলে, "মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না। আজ রাত্তিরের মধ্যেই ডাক্তারকে তাড়ানো চাই। নইলে···

সে-কথায় শাগরেদ দু'জন ফিকফিক করে হাসে। তা দেখে সদানন্দ হাসে।

একজন বলল, "মোক্ষম খেলটা আজই দেখিয়ে দিই।"

"হ্যাঁ। যে-করেই হোক, তাড়ানো চাই, বুঝলি। নইলে আমাদের ব্যবসা কিন্তু লাটে উঠবে, আর ওদিকে মুকুন্দ, হরিচরণ লুটেপুটে পেট মোটা করবে।"

নিধু দৌড়তে দৌড়তে ঠিক সে-সময় হাজির হল। বলল, "দেখে এলাম মুকুন্দ আর হরিচরণ গলা ধরাধরি করে হাঁটছে। সব্বাই বলছে, সাপে-নেউলে ভাব হয়ে গেছে।"

সদানন্দ বলল, "জানতাম এ-রকম কিছু একটা হবে। গুরুদেব বলেছিলেন, সব সময় মনে রাখিস, বিপদ যখন আসে হুড়মুড় করে আসে।" চোখ দুটি বুজে, "মহামায়া সবই তোমার মহিমা," বলে উঠোনে আপনমনে পায়চারি করতে থাকে।

নিঝুম অন্ধকার। এতটুকু আলোর চিহ্নমাত্র নেই। গরমে ভেপসে যাবার দশা।

নিভাননী দেবী সাত ব্যাটারির টর্চটা ব্যোমকেশবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "সেবার এটা না থাকায় বড় ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। এবার তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার আকাশ থেকে পড়লেন। শুকনো মুখে বললেন, "ওটা বলতে কী টর্চ বোঝায় ? নিজের সেফটির জন্য বন্দুক জোগাড় করলুম, আর সেটাই তুমি ভুলে ফেলে এলে ?"

বড়-বড় চোখ করে নিভাননী দেবী বললেন, "মা কালীর থানে পুজো দিতে এসে কেউ কী সঙ্গে বন্দুক আনে নাকি ? তোমার মাথাটা গেছে।"

ব্যোমকেশ-ডাক্তার কথা না বাড়িয়ে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। টর্চ হাতে নিয়ে ঘরেই আলো জ্বাললেন। বেশ চমৎকার আলো। মন হঠাৎই খুশিতে ভরে গেল।

নিভাননী দেবী গরম সহ্য করতে না পেরে দক্ষিণ দিকের জানালা খুলতেই চিৎকার করে উঠলেন।

টর্চ জ্বেলে ব্যোমকেশ-ডাক্তার **"কী হল, কী হল,"** করে এগিয়ে গিয়ে জানালায় ফোকাস ফেললেন। দেখলেন, একটা গোখরো সাপ জানলা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ব্যোমকেশ-ডাক্তার বেশি উদ্বিগ্ন হলেন না, ধীরে জানালা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভয় নেই। তবে আজ রাত্তিরটা বড় বেগতিক মনে হচ্ছে।"

নিভাননী দেবী ফ্যাকাসে মুখ করে বললেন, "মায়ের পুজো তো ভক্তিভরেই দিয়েছি।"

মনে-মনে ভাবলেন ব্যোমকেশ-ডাক্তার, বেশি ভক্তির পরিণাম এই হয়। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। ভাবলেন, নিভাননীকে যদি সামান্য সময়ের জন্যও ঘরে রেখে বাইরে বেরোতে পারতেন, তা হলে, খেলাটা জমাতে পারতেন ভালভাবেই। এখন কোনও উপায় নেই। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু চুপ করে থাকার **কি** উপায় আছে। হঠাৎই নজর করলেন ঘরের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে অসংখ্য লাল ডেঁয়ো পিপড়ে মার্চ করার ভঙ্গিতে ছেয়ে যাচ্ছে। তার ওপর শেয়াল আর কুকুরের ডাকে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম। নিভাননী দেবী ভয়ে চুপসে যাচ্ছিলেন। কেননা, এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি এর আগে আর কখনও। ব্যোমকেশ-ডাক্তারের ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হল না। ক্লোরোফরমের শিশি হাতের কাছে রেখে বললেন, "অজ পাড়াগাঁয়ে এরকম একটু-আধটু হয়ই।" বলতে বলতে স্পিরিটের শিশি বের করে পিপড়েগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে দেশলাই-এর কাঠি ছুঁড়ে দিতেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা বেশি উঁচুতে উঠতে পারছিল না। বুট জুতো দিয়ে পিপড়েগুলোকে মেরে ফেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর ঠিক তখনই শিলাবৃষ্টির মতো দরজায় ঠকঠক শব্দ হতে লাগল। মনে হল বাইরে থেকে দরজা ভেঙে কারা যেন ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

নিভাননী দেবীর সংজ্ঞাহীন হবার দশা।

বজ্রগম্ভীর গলায় ব্যোমকেশ-ডাক্তার বলে উঠলেন, "পবনচন্দ্র, এসব করে তুই পার পাবি ভাবছিস। তোর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে এল রে।"

কথা শেষ হতে-না-হতে দরজা ভেঙে মুখোশ পরা ক'জন ঘরে ঢুকে বলল, "এখনই এখান থেকে পালা ; নইলে প্রাণে বাঁচবি না।" লোকগুলোর হাতে ধারালো ছুরি চকচক করে উঠল।

ব্যোমকেশ-ডাক্তার বুঝলেন, ক্লোরোফরমে কাজ হবে না। বললেন, "কী চাস তোরা ?"

"টাকাপয়সা কিছু না। শুধু মা'র তীর্থ অপবিত্র করার অপরাধে···

কথা শেষ করতে পারল না। গুম্ গুম্ করে পিস্তলের আওয়াজে ওরা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

একজন বলল, "পুবের দরজা···"

আর একজন বলল, "উত্তরের···

ঠিক সেসময় ব্যোমকেশ-ডাক্তার শুনতে পেলেন, "সব দরজাই বন্ধ **পবন**। হাত থেকে ওসব না ফেললে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।"

লোক ক'জনার হাত থেকে টুপটুপ করে ধারালো ছুরি খসে পড়তেই হেড কনস্টেবল রামপিয়ারি ওদের হাতে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে এক-এক টানে মুখোশ **খুলে** ফেলতে লাগল। ওরা সকলেই অবাক চোখে দেখল, তার মধ্যে সদানন্দ ওরফে পবন, পানু, লখাই আর জহিরকে।

অবনী জোয়ারদার ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "আজ পর্যন্ত কেউ কখনও খুন করে পার পায়নি। বহাল তবিয়তে সদানন্দ সেজে বসেছিস। চল থানায়।"

বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "হরেরাম পবনের নাম প্রায়ই নিত বলে আমার কেমন সন্দেহ হয়। তারপর তো জানেন, পবনের উদ্দেশ্যে ও বাড়িতে যাই। খেয়া পারাপার করে ও দিন কাটাত। দেশ ভাগ হওয়ার পর, ও আর সে-কাজে মন দিত না। গভীর রাতে নৌকো চালিয়ে কোথায় যেত আবার গভীর রাতেই নিঃশব্দে ফিরে আসত। হরেরাম দু-চার দিন তক্কে-তক্কে ছিল। একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলল পবনকে। বুঝতে অসুবিধে হল না, চোরাই মাল লেনদেনে পবন এখন বেশ সড়গড়। দু-চারটে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। পবন ওকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে। যখন পারেনি, তখনই হরেরামকে মরতে হল। সুন্দর কাজ করা কাচের গ্লাসে পবন আমাকে জল দেয়, ফিংগার প্রিন্ট রয়েছে বুঝতে পেরে সতর্কতার সঙ্গে ওই গ্লাস পবনের কাছ থেকে নিয়ে নিই। এরপর ওই ফিংগার প্রিন্টের সঙ্গে হরেরামের গলায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তার হুবহু মিল পেয়ে যাই। কিন্তু ফ্যাসাদ হল, পবন তখন বোনারপাড়া ছেড়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, পুলিশ তা খুঁজে বের করতে পারল না। এরই আগে পবনের দলের একজন অসুস্থ হয়ে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবুরও সন্দেহ হয়, রোগটা মানসিক। তারপর তীর্থ করতে এসে সদানন্দ ওরফে পবনের গলার মিল খুঁজে পান। আমি এসেছিলাম নেহাতই পুজো দেবার উদ্দেশ্যে। ভিড়ের মধ্যে ব্যোমকেশবাবু আমাকে দেখে সংক্ষেপে সব কথা জানান। আরও আশ্চর্য, এ-সময় অবনীবাবুও ভরতখালিতে পোস্টেড। নিধু পুলিশেরই লোক। **ও-ই** খবর দিয়েছিল অবনীবাবুকে। আজকের রাতটা গণ্ডগোলে বুঝে অবনীবাবু কালক্ষেপ করেননি। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলে নিভাননী দেবীর দিকে চেয়ে বললেন, "এর জন্য আপনার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। পুজো না দিতে এলে **কি** হরেরামের খুনের কিনারা হত ?"

সকলেই হোহো করে হাসল সে-কথায়।

ছবি দেবাশিস দেব

কাগজ কেটে নকশা- ২

এর আগে তোমরা কাগজ কেটে নকশা বানানো শিখেছ। এটাও আর-এক ধরনের নকশা বানানোর খেলা। প্রথমে একটা চারচৌকো কাগজ নাও। সেটাকে অর্ধেক করে ভাঁজ করো। উপরের পাতাটা আবার অর্ধেক করে ভাঁজ করো। কাগজটা উলটে নীচের পাতাটাও একই ভাবে ভাঁজ করো।

এবার ২ নম্বর ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে ঠিক সেইভাবে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে কাগজটা ভাঁজ করো।

৩ নম্বর ছবির মতো উপরের অংশটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ভাঁজ করে নাও। এবং নীচের অংশটা ঠিক একইরকম ভাবে ভাঁজ করো। এবার দ্যাখো বড় চারচৌকো কাগজটা ভাঁজ হয়ে ষোলো পাতার একটা চারচৌকো আকার নিয়েছে।

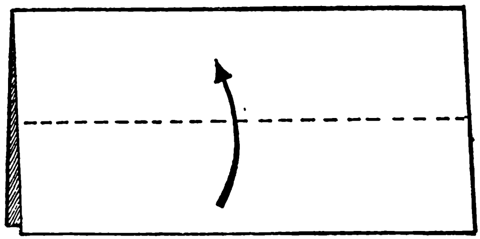

১ নং ছবি

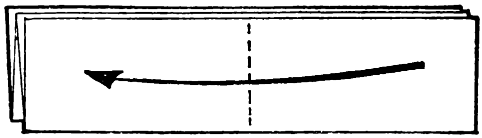

২ নং ছবি

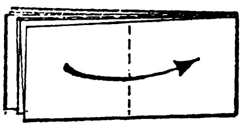

৩ নং ছবি

এখন ৪ নম্বর ছবির মতো পেনসিল দিয়ে রেডক্রসের মতো এঁকে নাও। এবার সাদা অংশটুকু রেখে বাকি লাইনটানা অংশটা কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দাও। কাগজটার সব ভাঁজ আস্তে-আস্তে খুলে ফেলো। দ্যাখো কী সুন্দর একটা গ্রিল প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল।

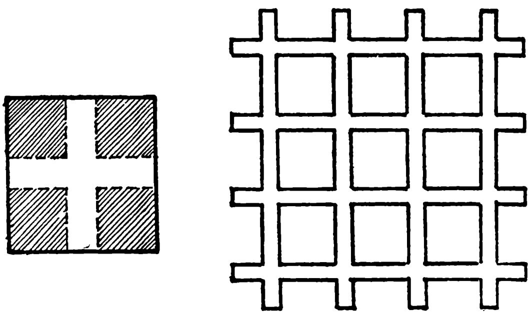

৪ নং ছবি

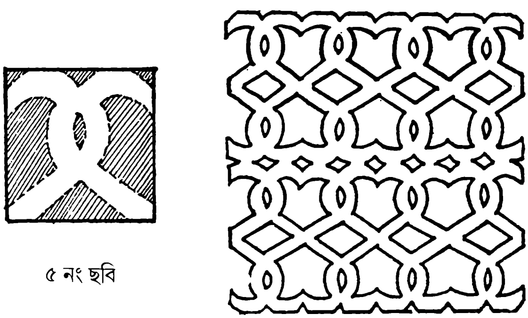

৫ নং ছবি

এইভাবে ৫ নম্বর ছবির মতো খুব সহজেই একই পদ্ধতিতে এরকম একটা নকশা বানিয়ে ফেলতে পারো। ইংরেজিতে একে Cut-out repeat patterns বলে। মন থেকে এরকম আরও অনেক নকশা পেনসিল দিয়ে এঁকে নিয়ে কেটে দ্যাখো কী সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি হয়ে যাবে।

কবির

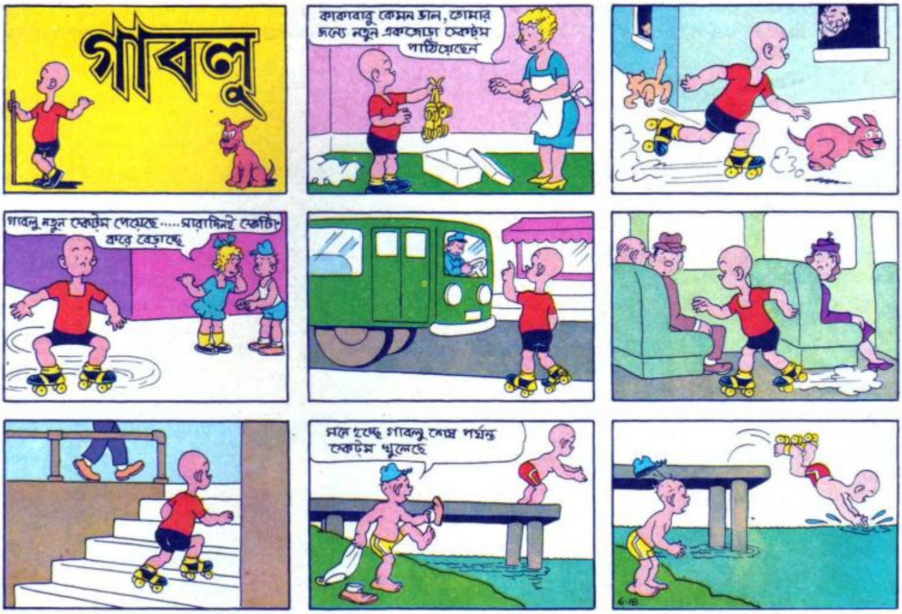
গাবলু
কাকাবাবু কেমন ভাল, তোমার জন্যে নতুন একজোড়া স্কেট্স পাঠিয়েছেন
গাবলু নতুন স্কেট্স পেয়েছে.....সারাদিনই স্কেটিং করে বেড়াচ্ছে
মনে হচ্ছে গাবলু শেষ পর্যন্ত স্কেট্স খুলেছে
6-18

গাবলু
4-16

আলোর চমক

শৈলেন ঘোষ

মঞ্চ :

নাটকে তিনটি দৃশ্য। দৃশ্যগুলি যাতে সহজেই পরিবর্তন করা যায় তার জন্য নীচের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথম এবং তৃতীয় দৃশ্যটি একই রাস্তার। দ্বিতীয় দৃশ্যটি সুলতানের দরবারের। রাস্তার দৃশ্যে একটি দাওয়া এবং একটি আলোকস্তম্ভ থাকবে। সুলতানের দরবারের দৃশ্যে দাওয়াটি যথাস্থানে থাকবে। শুধু দাওয়ার ওপর একটি রাজসিংহাসন বসাতে হবে। সিংহাসনের দু' পাশে ভাল কাপড় ঢাকা দিয়ে দুটি বেঞ্চ বসিয়ে দিলেই চলবে। এই বেঞ্চে পাত্র-মিত্র, সভাসদ বসবে। আলোকস্তম্ভটি সরিয়ে ফেলতে হবে। ইচ্ছে করলে রাজসিংহাসনের পেছনে জাফরিও বসানো যায়। তৃতীয় দৃশ্য এলে রাজসিংহাসন, বেঞ্চ ও জাফরি সরিয়ে আবার আলোকস্তম্ভটি আগে যেখানে ছিল সেখানে বসাতে হবে।

এগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে।

পোশাক :

কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে পোশাক পরিবর্তনের ঝক্কি আছে। সে-পরিবর্তন নাজিরের। দ্বিতীয় দৃশ্যের পর তৃতীয় দৃশ্যে নাজির যখন প্রবেশ করছে, তখন তার ছদ্মবেশ। তখন সময়ের ব্যবধান অল্প থাকায় তাকে গালে একটি দাড়ি বেঁধে নিয়ে একটি কালো কাপড়ের আলখাল্লা পরে নিতে হবে। অবশ্য যারা আরও ভালভাবে করতে চায়, তাদের সে-স্বাধীনতা তো আছেই।

চরিত্র :

একটি ছেলে [আলোর দাদা]
জমাদার
ওস্তাগর
জহুরি
সওদাগর
প্রথম কোতোয়াল
দ্বিতীয় কোতোয়াল
নাজির
সুলতান
ছত্রধারী
সোরাব
ইয়াসিন
পাত্র-মিত্র
সিপাই-সামন্ত
আলো [ছেলেটির ছোট বোন]

প্রথম দৃশ্য ॥ রাস্তা

রাতের অন্ধকার কাটছে। ধীরে-ধীরে সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। দেখা গেল অনেকদিন আগের এক সুলতানের রাজধানী-শহরের একফালি রাস্তা। রাস্তার একপাশে একটি ছোট্ট দাওয়া। একটি আলোকস্তম্ভ। রাস্তার ওই ছোট্ট দাওয়াটির ওপর গুড়িসুড়ি মেরে একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। তার মাথায় একটি কাপড়ের পুঁটলি। খুব বেশি হলে তার বয়েস এগারো-বারো বছর। রাস্তায় লোকজন নেই। এদিকের রাস্তাটা একটু নির্জনই বলা যায়। দেখা গেল, একজন জমাদার একটা লাঠির ডগায় ঝাড়ু বেঁধে রাস্তা সাফ করতে-করতে এগিয়ে আসছে। আনমনেই লোকটি রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছিল, আর নিজের মনে গুনগুন করে গান করছিল। হঠাৎ সে দাওয়ায় ঘুমন্ত ছেলেটিকে দেখতে পেল। সে মুহূর্ত থামল। ছেলেটিকে ভাল করে দেখল।

জমাদার ॥ *[ছেলেটিকে দেখে, বিদ্রুপ করে]* ঘুমোচ্ছেন! ঘুমোও বাপধন, আরও ঘুমোও! নাক ডাকিয়ে ঘুমোও! সারারাত ধিঙ্গিপনা করেছ, এখন ঘুমোবে বইকী! *[হঠাৎ কড়কে উঠে]* ওহে নবাবপুত্তুর!

ছেলেটি চমকে ধড়ফড় করে উঠে বসে পড়ল। বসেই সে মাথার পুঁটলিটা দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরল। ঘুম-চোখে হতভম্বের মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তারপর জমাদারের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

জমাদার ॥ *[তেমনই তিরিক্ষি মেজাজে]* নবাবপুত্তুরের ঘুম ভেঙেছে! *[ধমক দিয়ে]* এই হতচ্ছাড়া, এইটা কি ঘুমোবার জায়গা! উটকো ঝঞ্ঝাট কি যত এখানেই জোটে!

ছেলেটি ভয়ে-ভয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

জমাদার ॥ চোখ দুটো দ্যাখো, যেন পটকা-ফাটা পটলভাজা! মনে হচ্ছে, নবাবপুত্তুরের কাঁচা ঘুমটা চটকে গেল! *[আবার কড়কে উঠে]* ওঠ্!

ছেলেটি পুঁটলিটা বুকের সঙ্গে হাত দিয়ে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জমাদার ॥ *[ধমক দিয়ে]* হাট্ এখান থেকে।

ছেলেটি সন্ত্রস্ত-চোখে স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

জমাদার ॥ *[আবার ঝাড়ু দিতে-দিতে]* খুব মজা না! এখানে শুয়ে থাকলে তো আর ভাড়া দিতে হচ্ছে না। কেউ বারণও করছে না। সবটাই ফোকট্সে!

ছেলেটি নিশ্চুপ।

জমাদার ॥ *[ঝাড়ু দিতে-দিতে হঠাৎ যেন ছেলেটির হাতের ওই পুঁটলিটির দিকে নজর পড়ে গেল]* ওইটি বুঝি কাল রাতে হাতিয়েছ? কী আছে ওটির ভেতরে বাপধন? টাকাকড়ি, না, সোনাচাঁদি?

ছেলেটি চুপটি করে দাঁড়িয়ে একবার পুঁটলিটা আর-একবার লোকটার মুখ দেখতে লাগল।

জমাদার ॥ কেমন ঘোড়েল দেখেছ! পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই একটি ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পুঁটলিটি বেঁধে রেখেছে। ভাবছে, আমাকে ধোঁকা দেবে। অতই সোজা! তুই তো কালকের ছেলে রে। *[হঠাৎ তেড়ে উঠে]* কথা বলছিস না কেন? কোতোয়ালকে ডাকব দেখবি!

ছেলেটির চোখ দুটি ভয়ে বিস্ফারিত হল।

জমাদার ॥ মনে করেছিস মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি ছেড়ে দেব! *[ছেলেটির মুখের সামনে এগিয়ে এসে]* কী আছে তোর পুঁটলির ভেতর?

ছেলেটি ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়ল, যার মানে, কিছু না।

জমাদার ॥ *[তীক্ষ্ণস্বরে]* বলবি না! দাঁড়া! *[হঠাৎ চেঁচিয়ে]* চোর! চোর!

ছেলেটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এখন সে যে কী করবে কিছু ঠিক করতে না-পেরে ছুটে পালাতে গেল। পালাতে গিয়ে তার হাতের পুঁটলিটা হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল। সেদিকে ছেলেটি আর দেখল না। পালাল। অমন করে ছেলেটিকে পালাতে দেখে জমাদার প্রথমটা হকচকিয়ে গেছল। তারপর হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে পুঁটলির কাছে এসে যেই পুঁটলিটা তুলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে মঞ্চের এদিক-ওদিক থেকে 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করে, জমাদারের দিকে আঙুল তুলে তিনজন লোক উপস্থিত হল। তারা তখনও 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করছে। এই তিনজনের একজন ওস্তাগর, একজন সওদাগর, আর একজন জহুরি।

জমাদার ॥ *[প্রথমটা থতমত খেয়ে]* কই চোর? কই চোর?

তিনজনে ॥ *[একসঙ্গে]* তুই চোর! তুই চোর! *[জমাদারের দিকে তখনও তাদের আঙুল স্থির।]*

জমাদার ॥ *[প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেও, পরে যখন বুঝল তিনজনে তাকেই চোর ঠাউরেছে, তখন রেগে]* মুখ সামলে কথা বলবে!

ওস্তাগর ॥ অ্যাঁ! ব্যাটা চুরিও করবে, আবার চোখও রাঙাবে!

সওদাগর ॥ *[ঘুসি দেখিয়ে]* এমন দেব একখানি যে বুকের কাঁপকাটি ছেতরে যাবে।

জহুরি ॥ আরে বাবা ঘুসো দিতে হবে কেন। আমার একখানি ঠুঁসো খেলেই বাছাধনের কম্ম শেষ!

জমাদার ॥ *[ঝাড়ু তুলে ওদের দেখিয়ে]* দেখি তোদের মুরোদ কত! মার!

ওস্তাগর ॥ *[তর্জন-গর্জন করে]* কী! ভদ্রলোকের মুখের ওপর ঝাড়ু তোলা! তুইও মার! দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা!

সওদাগর ॥ *[ক্ষিপ্ত স্বরে]* ওই ঝাড়ু তোর মুখে ঘসে দেব ব্যাটা!

জমাদার ॥ *[ঝাড়ু নামিয়ে]* ব্যাটা–ব্যাটা করবে না বলে দিচ্ছি!

ওস্তাগর ॥ *[রুখে]* কেন, কী করবি তুই?

জহুরি ॥ এমন ধড়িবাজ, রাত্তিরে আমার চোখে যখন ঘুমটি সবে এসেছে, ঠিক তখনই পাঁচিল টপকে আমার ঘরে ঢুকে বাক্স ভেঙেছে।

সওদাগর ॥ *[জহুরির কথা শুনে, জহুরির দিকে চেয়ে, ফোঁস করে উঠল]* এখানে আবার তোমার বাক্স আসে কোত্থেকে? বাক্স তো ভেঙেছে আমার।

ওস্তাগর ॥ *[খেঁকিয়ে উঠে]* বাঃ! বাঃ! চোরটাকে ধরলুম আমি, আর বাক্স ভাঙল তোমাদের!

জহুরি ॥ তুমি আবার কখন চোর ধরলে, ধরলুম তো…

সওদাগর ॥ *[জহুরির মুখ থেকে কথাটা লুফে নিয়ে]* আমি। আমি সবচেয়ে আগে দেখতে পেয়েছি। আমি সবচেয়ে আগে ছুটে এসেছি।

জহুরি ॥ *[ঝগড়ার গলায়]* তুমি দেখতে পারো, কিন্তু চুরি গেছে আমার!

জমাদার ॥ ওহে বাবুরা, তোমরা যত পারো ঝগড়া করো। আমায় যেতে দাও! আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। *[যাবার জন্য পা বাড়াল।]*

ওস্তাগর ॥ *[জমাদারের পথ আগলে]* তুই কোথায় যাবি! এত মেহনত করে আমার জিনিস সমেত চোর ধরলুম, এখন ছেড়ে দেব!

জমাদার ॥ *[রুখে]* এ-জিনিস তোমার কে বলেছে?

জহুরি ॥ *ঠিক কথা,* এ-জিনিস তোমার নয়, আমার।

সওদাগর ॥ বাঃ ! মধ্যিখান থেকে আমি ফক্কা !

জমাদার ॥ *[নির্ভয়ে]* তোমরা সাফ-সাফ শুনে রাখো, এ-জিনিস আমি কাউকে দেব না ! *[ওস্তাগরকে হটিয়ে দিয়ে]* সরো ! *[বেরিয়ে যাবার জন্য আবার পা বাড়াল ।]*

ওস্তাগর ॥ *[জমাদারের পথ আবার আগলে দাঁড়াল]* এই জোচ্চোর, আমার গায়ে ঠেলা দিলি কেন ! চুরিও করবি, আবার ঠেলাও মারবি ! *[ঝট করে জমাদারের গলাটা ধরে]* দেখি তোর কত কলজের জোর ।

জহুরি ॥ ঠিক হ্যায় ! হয়ে যাক এস্‌পার-ওস্‌পার ।

জমাদার ॥ *[হাত থেকে ঝাড়ু আর পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওস্তাগরের হাতে একটা ঝাপটা মারল । ওস্তাগরের হাত ওর গলা থেকে ছিটকে গেলে]* তুমি আমার গলা টিপলে কেন ? *[খেপে গেল]*

ওস্তাগর ॥ *[রুখে]* বেশ করেছি !

সঙ্গে-সঙ্গে জমাদার ওস্তাগরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । তারপর মঞ্চের একদিকে পড়ে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি লেগে গেল । দু'জনেরই মুখে আস্ফালন আর গলায় চোটপাটের শব্দ ।

ওদিকে ওস্তাগর আর জমাদার মারামারি করছে, আর এদিকে জহুরি আর সওদাগর জমাদারের হাত থেকে ছিটকে পড়া সেই পুঁটলিটার দিকে লোলুপ-দৃষ্টি হানছে । হঠাৎ তাল বুঝে সওদাগর পুঁটলিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পালাতে গেল । সঙ্গে-সঙ্গে জহুরি তাকে জাপটে ধরেছে ।

জহুরি ॥ *[চেঁচিয়ে]* পালাচ্ছে ! পালাচ্ছে !

লেগে গেল জহুরির সঙ্গে সওদাগরের টানাটানি । তারপর কোস্তাকুস্তি ।

একদিকে জমাদার আর ওস্তাগরের মধ্যে হাতাহাতি চলছে, আর একদিকে জহুরি আর সওদাগরের মধ্যে কোস্তাকুস্তি চলছে । এমন সময় একফাঁকে জহুরির হাত ছাড়িয়ে সওদাগর পুঁটলিটা নিয়ে ছুটতে গেল । জহুরি নাছোড়বান্দা । সওদাগরকে তাড়া করল । সওদাগর কোন দিকে যাবে ঠিক করতে না-পেরে মঞ্চের ওপরেই জহুরির তাড়া খেয়ে ছুটতে লাগল ।

একদিকে জমাদার আর ওস্তাগরের মধ্যে লড়াই, আর-একদিকে সওদাগর আর জহুরির মধ্যে ছোটাছুটি । চেঁচামেচি । এমন সময় হঠাৎ ওস্তাগর সওদাগরের হাতে পুঁটলিটা দেখে জমাদারের সঙ্গে মারামারি থামিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল । সওদাগরের দিকে ধেয়ে গেল । সওদাগরকে তারা ধরে ফেলল । কিন্তু টাল সামলাতে পারল না । চারজনে একসঙ্গে হুড়মুড় করে এ-ওর ঘাড়ে পড়ল । সওদাগরের হাত থেকে পুঁটলিটা ছিটকে পড়ল সামনে । চারজনই ভীষণ হাঁফাতে লাগল । তাদের নিশ্বাসের শব্দটা জোরে-জোরে শোনা গেল ।

জমাদার ॥ *[হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে দাঁড়িয়ে]* আমরা চারজনই আহাম্মক । যে চোর সে চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়ল, আর মধ্যিখান থেকে চোরাই জিনিস নিয়ে আমরা মরছি মারামারি করে ।

সওদাগর, ওস্তাগর আর জহুরি ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে ।

সওদাগর ॥ মানে ! তুই কী বলতে চাস ! তুই চুরি করিসনি ?

জমাদার ॥ *[বিদ্রূপ করে]* হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না, সকালবেলা ঝাড়ু হাতে নিয়ে আমি চুরি করতে বেরিয়েছি ।

ওস্তাগর ॥ তবে কে চুরি করল ?

জমাদার ॥ একটা ছেলে । সে এই পুঁটলিটা এই রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে ।

সওদাগর ॥ তার মানে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝুটমুট মারামারি করলুম ?

জহুরি ॥ আসলে আমরা সকলেই আকাট মূর্খ । পুঁটলিটা যে খুললেই যার জিনিস সে পেয়ে যায়, এটা আর আমাদের মাথায় ঢুকল না । সুতরাং পুঁটলিটা খুলে দেখা হোক ।

ওস্তাগর ॥ খুললে, ওর মধ্যে যদি আমার জিনিস না থাকে ?

জহুরি ॥ তুমি পাবে না ।

সওদাগর ॥ আমারও তো জিনিস না-থাকতে পারে ?

জহুরি ॥ না-থাকলে তুমিও পাবে না ।

ওস্তাগর ॥ এটা কিন্তু ঠিক ব্যবস্থা হল না । ব্যবস্থাটা এমন হওয়া উচিত, এতে যদি আমাদের কারও জিনিস না-থাকে, তখন ধরতে হবে এ-জিনিসগুলি আমাদের সকলের । আমরা চারজনে সমান চারটি ভাগে ভাগ করে নেব ।

ওস্তাগর ॥ *[তারিফ করে]* এই অ্যাঃ ! এই যে বুদ্ধিটা বাতলেছ তুমি, এ একদম পাকা মাথার বুদ্ধি । তুমি কী করো ভাই ?

জহুরি ॥ আমি জহুরি । আমার সোনা-চাঁদির কাজ ।

ওস্তাগর ॥ *[সওদাগরকে]* আর তুমি ?

সওদাগর ॥ আমি সওদাগর । এই কেনাবেচার ব্যবসা আর কি ! এই ধরো, কখনও করছি জাহাজের ব্যবসা আবার কখনও ব্যাঙের ঠ্যাং ।

ওস্তাগর ॥ তার মানে, আমার মতো আর কি । আমি ওস্তাগর । সাদা কথায় দর্জি । এই কখনও ছোট্ট ছেলের নিকারবোকার সেলাই করছি, আবার কখনও চোগা-চাপকানও বানাচ্ছি ।

সকলে হেসে উঠল । শুধু জমাদার ছাড়া ।

জমাদার ॥ ঠিক আছে বাবুরা । আমাকে তো তোমরা সকলেই চেনো । আমার হাতে যখন ঝাড়ু, তখন বুঝতেই পারছ আমি জমাদার । তোমাদের ওই ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই । *[রাস্তায় পড়ে থাকা পুঁটলিটি দেখিয়ে]* এখন ওইটির কী ব্যবস্থা তোমরা করবে করো । নইলে আমি ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেব ।

জহুরি ॥ সে তুমি ভাগ না-নিতে চাও, আমাদের কিছু বলার নেই ।

জহুরি, ওস্তাগর আর সওদাগরের দিকে চোখ মটকে ইশারা করল । ওস্তাগর আর জমাদার ইশারায় সায় দিল ।

জহুরি ॥ তবে, ওটি তোমাকে ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিতে হবে না । ওটি আমরাই তুলে নিচ্ছি ।

জহুরি পুঁটলিটি রাস্তা থেকে তুলে নেবার জন্য দ্রুত এগিয়ে যাবার মুখেই সওদাগর তার জামাটা টেনে ধরল ।

জহুরি ॥ *[থমকে দাঁড়িয়ে]* কী হল ?

সওদাগর ॥ তুমি একলা তুলবে কেন ? জমাদার যখন রাজি নয়, তখন এতে আমাদের তিনজনের দাবি । আমরা তিনজনে একসঙ্গে তুলব ।

ওস্তাগর ॥ ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা । তা হলে কথা বাড়িয়ে আর কাজ নেই । এসো, আমরা তিনজনে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে ওটি তুলে নিই ।

তিনজনে এগিয়ে গেল । তিনজনে একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটা ধরতে গেল । ঠিক সেইসময় দু'দিক থেকে দু'জন কোতোয়াল মঞ্চে ঢুকে পড়ে, তারা হাতের লাঠি দিয়ে পুঁটলিটা চেপে ধরল । এতক্ষণ জহুরি, ওস্তাগর আর সওদাগরের চোখের দৃষ্টি ছিল পুঁটলিটার ওপর স্থির । লাঠি দেখে তারা চমকে উঠল । তাদের হাত ছুঁতে পারল না পুঁটলিটা । চোখ তুলে কোতোয়ালের মুখের দিকে চেয়ে তারা ভড়কে গেল । চোখের নিমেষে তিনজনে যে-যেদিক দিয়ে পারল, মারল ছুট । পালাল জমাদারও ।

তাদের পালাতে দেখে কোতোয়াল দু'জন প্রথমে 'পালাচ্ছে, পালাচ্ছে' বলে চিৎকার করে তারপর নিজেরাই হো-হো করে হেসে উঠল ।

১ম কোতোয়াল ॥ *[হাসতে-হাসতে]* ভিতু, একদম ভিতু।

২য় কোতোয়াল ॥ *[হাসতে-হাসতে]* জমাদারটা পর্যন্ত চম্পট দিয়েছে।

দু'জনেই বেদম হেসে উঠল।

১ম কোতোয়াল ॥ আসলে আমরা যে লুকিয়ে-লুকিয়ে ওদের সব কথা শুনে ফেলেছি, ওরা সেটা টেরই পায়নি।

২য় কোতোয়াল ॥ *[হেসে]* টের পেলে কি আর এতক্ষণ ধরে কচকচানি হত, কখন পালাত। *[চড়া সুরে হেসে উঠল।]*

১ম কোতোয়াল ॥ *[পুঁটলিটা দেখিয়ে]* তবে এটাকে আর বেশিক্ষণ রাস্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

২য় কোতোয়াল ॥ তা ঠিক। তোমার কী মনে হয়? পুঁটলির ভেতর কী আছে?

১ম কোতোয়াল ॥ আরে ভাই, জহুরির যখন অত উৎসাহ, তখন আর সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই সোনা-দানা আছে।

দু'জন কোতোয়াল এগিয়ে গেল। দু'জনেই হাতের লাঠি দিয়ে পুঁটলিটা ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

২য় কোতোয়াল ॥ *[ঠেলা দিয়ে]* ওপর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

১ম কোতোয়াল ॥ পুঁটলিটা খুলে না ফেললে বোঝা যাবেও না।

২য় কোতোয়াল ॥ তা হলে খুলে ফেললেই হয়।

১ম কোতোয়াল ॥ এই রাস্তার মধ্যিখানে?

২য় কোতোয়াল ॥ রাস্তার মধ্যিখানে কেন? ওই আড়ালে গেলেই তো হয়। *[আড়ালটা হাত দিয়ে দেখাল।]*

১ম কোতোয়াল ॥ ঠিক বলেছিস!

পুঁটলিটা রাস্তা থেকে তোলার জন্য হাত বাড়াল।

২য় কোতোয়াল ॥ *[হঠাৎ যেন কিছু দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে]* এই দাঁড়া!

১ম কোতোয়াল ॥ *[চাপাস্বরে]* কী হল?

দাঁড়িয়ে পড়ল।

২য় কোতোয়াল ॥ একটা লোক।

দু'জন কোতোয়ালই প্রায় একদৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

১ম কোতোয়াল ॥ *[দেখতে-দেখতে]* না, এদিকে এল না। *[স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।]*

ঠিক এই তক্কে কোতোয়াল দু'জন যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার উলটো দিক থেকে সওদাগর সাবধানে পা টিপে মঞ্চে এসে নিঃসাড়ে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে পালাতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন কোতোয়ালই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আচমকা সওদাগরকে দেখতেও পেয়েছে। দু'জনেই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে সওদাগরকে ধরে ফেলল।

১ম কোতোয়াল ॥ *[সওদাগরের বুকের জামাটা খামচে ধরে]* হাসি দেখেছ কান্না দ্যাখোনি!

২য় কোতোয়াল ॥ *[লাঠি দিয়ে পেটে খোঁচা মেরে]* দেব জন্মের মতো ফুটো করে!

সওদাগর ॥ *[গলায় জোর দিয়ে]* এটা আমার।

এই কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য আর-একদিক থেকে হুড়মুড় করে ওস্তাগর ঢুকে পড়ল।

ওস্তাগর ॥ *[চিৎকার করে]* না হুজুর, ওটা আমার।

সওদাগর ॥ *[ওস্তাগরকে দেখে থতমত খেয়ে]* অ্যাই, তখন কী কথা হয়েছিল? এর ভেতরে যা আছে আমরা সবাই ভাগ করে নেব না! এখন আবার উলটো কথা বলছ কেন?

ওস্তাগর ॥ তবে, তুমিই বা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পুঁটলিটা নিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?

সওদাগর ॥ আমি কেন পালাতে যাব? জহুরি বলল তো!

ঠিক এইসময়ে জহুরিও ঢুকে পড়ল।

জহুরি ॥ *[রেগে টং]* সওদাগর আমার নামে মিথ্যে বলছে। নিজে অপকম্ম করে এখন অন্যের নামে কেমন চালিয়ে দিচ্ছে!

সওদাগর ॥ *[ন্যাকামি করে]* কী অসভ্য লোক বাবা! আমাকে মিথ্যেবাদী বলছে। তখন তুই আমাকে বললি না?

জহুরি ॥ *[ঠিক সওদাগরের মতো ন্যাকামি করে, ভেংচি কেটে গালে হাত দিয়ে]* ও মা, কী গুলপট্টি দিচ্ছে! *[তারপর কোতোয়ালদের উদ্দেশ্যে]* সত্যি বলছি কোতোয়াল সাহেবরা, তোমাদের গোঁফের দিব্যি বলছি, ওকে আমি একদম বলিনি। নিজে ধরা পড়ে এখন আমাকে জড়াচ্ছে।

১ম কোতোয়াল ॥ *[ঝাঁঝিয়ে উঠে]* সব ক'টা ধান্দাবাজ! সব ক'টাকে দেব চালান করে!

২য় কোতোয়াল ॥ আমরা কোথায় ভুল করে পুঁটলিটা এখানে ফেলে গেলুম, *[দুই কোতোয়ালের চোখে-চোখে দৃষ্টি বিনিময় হল]* অমনি তোদের হয়ে গেল!

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ জমাদারও ঢুকে পড়ল।

জমাদার ॥ *[মজা ও আদরের সুরে ঠাট্টা করে]* কোতোয়াল বাবারা?

দু'জন কোতোয়াল ॥ *[চমকে একসঙ্গে]* কে? কে?

জমাদার ॥ কতদিন চাকরি করছ এই শহরে?

১ম কোতোয়াল ॥ যতদিন চাকরি, ততদিন করছি।

জমাদার ॥ শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ক'টি ছেলে-মেয়ে তোমাদের?

২য় কোতোয়াল ॥ য'টি ছেলে, ত'টি মেয়ে।

জমাদার ॥ মাইনেপত্তর?

১ম কোতোয়াল ॥ যত টাকায় হয়নে, তত টাকা মাইনে।

জমাদার ॥ তা হলে ওই পুঁটলিটা তোমাদেরই।

কোতোয়াল ॥ *[দু'জনে একসঙ্গে]* কেন? কেন?

জমাদার ॥ *[ঠাট্টা করে]* যত টাকায় হয়নে, তত টাকা মাইনে পেলে দু'-চারটে অন্যের পুঁটলি হাতাবে বইকী। তা না-হলে সংসারটা চলবে কী করে!

১ম কোতোয়াল ॥ *[হুঙ্কার ছেড়ে]* ফুক্কুড়ি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে!

২য় কোতোয়াল ॥ *[শাসিয়ে]* ঘুরিয়ে নাক দ্যাখানো! আমরা চোর!

জমাদার ॥ ছিঃ, ছিঃ! আপনারা চোর হবেন কোন্ দুঃখে! আপনারা কোতোয়াল। আপনারা তো চোর ধরেন! তা হলে যদি সাহস দেন তো সত্যি কথাটা বলে ফেলি।

কোতোয়াল ॥ *[দু'জনে একসঙ্গে]* কী? কী?

জমাদার ॥ আজ্ঞে কোতোয়ালবাবারা, ওই পুঁটলিটা আপনারা এখানে ফেলে যাননি।

১ম কোতোয়াল ॥ *[রেগে]* আর-একবার বল!

জমাদার ॥ বলছি তো, ফেলে যাননি।

২য় কোতোয়াল ॥ *[রেগে ঝট করে জমাদারের ঘাড়টা ধরে]* আর-একবার বললে মুখ সেলাই করে দেব।

জমাদার ॥ আমার মুখ সেলাই করলেও সত্যি কথাটাকে তো সেলাই করতে পারবে না।

১ম কোতোয়াল ॥ কোনটা সত্যি কথা?

জমাদার ॥ পুঁটলিটা তোমাদের নয়, এই কথাটা।

জহুরি ॥ *[হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল]* পুঁটলিটা আমার।

ওস্তাগর ॥ না, না, আমার।

সওদাগর ॥ মিথ্যে কথা, আমার।

তিনজনেই তারপর একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল, 'আমার আমার' বলে। হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। তারপর জহুরি, ওস্তাগর আর সওদাগর পরস্পর পরস্পরকে তেড়ে যাবে আর চিৎকার করবে। কোতোয়ালরা ধমক দিয়ে হট্টগোল থামাবার চেষ্টা করল। হট্টগোল যখন থামল না, তখন লাঠি চালাতে লাগল। লাঠি চালিয়ে সবক'টাকে মঞ্চে ধরাশায়ী করে আবার টেনে-টেনে তুলল। তারপর কোতোয়াল দু'জন জহুরি, সওদাগর, ওস্তাগর আর জমাদারকে একসঙ্গে গ্রেফতার করল।

১ম কোতোয়াল ॥ *[যেমন করে হুকুম জারি করে তেমনিই সুরে]* বেআইনিভাবে রাস্তার মধ্যিখানে চোরাই জিনিসের বখরা নিয়ে মারামারি করার জন্য এই চারটে আসামিকে আমরা গ্রেফতার করছি।

২য় কোতোয়াল ॥ *[হুকুমজারির সুরে]* এই চার আসামির বিচার হবে দীনদুনিয়ার মালিকের দূত আমাদের প্রিয় সুলতান ইয়াসিন মনসুরের দরবারে। এই পুঁটলি কার, সেটা জানা যাবে তাঁর কাছেই। চল্‌!

দু'জন কোতোয়াল চারজনকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেল যেদিক দিয়ে ঠিক তার উলটো পথ দিয়ে যার হাতে পুঁটলি ছিল সেই ছেলেটি ঢুকল। সে হতবাকের মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে তার পুঁটলিটা খুঁজতে লাগল। খুঁজে না-পেয়ে অসহায়ের মতো সেই দাওয়াটার ওপর বসে পড়ল।
ধীরে-ধীরে মঞ্চের আলো নিভে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ সুলতানের দরবার

সুলতানের দরবার-গৃহ। সুলতান এখনও আসেননি। সিংহাসন শূন্য। দরবারের দু'পাশে সুলতানের দর্শন-প্রার্থী রাজ্যের কিছু প্রজা উপস্থিত। প্রজাদের মধ্যে এলোমেলো কথাবার্তার চাপা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা বলার সময় মাঝে-মাঝে দু'-একটি শব্দ বোঝা যায়। আবার মাঝে-মাঝে তাদেরই কথা বলার হট্টগোলে কিছুই বোঝা যায় না। এমনই সময়ে বাইরে ভেরি বেজে উঠল। দরবারের সামনের দিকে, একপাশে, একটি মঞ্চে ঘোষক দাঁড়িয়ে ছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করল:

ঘোষক ॥ প্রিয় প্রজাগণ, আমাদের মহামান্য সুলতান দরবারের প্রবেশ-দরওয়াজা অতিক্রম করে দরবারের দিকে এগিয়ে আসছেন।

ঘোষকের ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দামামা বেজে উঠল। উপস্থিত প্রজারা সুলতানকে অভিবাদন জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াল। দামামার তালে-তালে সুলতানের দেহ-রক্ষী সিপাইরা এগিয়ে এল। তাদের পেছনে সুলতান। সুলতানের পেছনে একজন ছত্রধারী রাজছত্র ধরে আছে। একেবারে পেছনে নাজির, উজির, পাত্রমিত্র। তারা সুশৃঙ্খলভাবে নিজের-নিজের জায়গা গ্রহণ করল। সুলতান সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসে তিনি উপস্থিত প্রজাদের নিজের-নিজের আসনে বসবার জন্য ইশারা করলেন। ছত্রধারী ছাতাটি যথারীতি তাঁর মাথায় ধরে রইল। সঙ্গে-সঙ্গে একজন ব্যজনদার একটি মস্ত কারুকার্যকরা পাখা হাতে নিয়ে সুলতানকে বাতাস করতে লাগল। সুলতানের নাজির সুলতানের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিছু বলল। সুলতান ঘাড় নাড়লেন। নাজির তখন স্বস্থান থেকে ঘোষণা করল:

নাজির ॥ মহামান্য সুলতান আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের কার্যসূচি শুরু করার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। সেই কারণে আপনাদের জানাই, আপনারা এক-এক করে আপনাদের বক্তব্য তাঁর সামনে পেশ করুন।

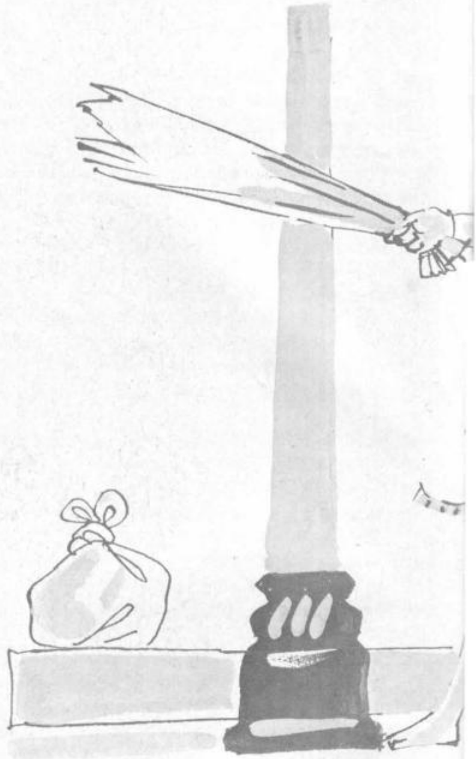

হঠাৎ একজন প্রজা উঠে দাঁড়াল। সে একজন বাচাল গোছের। সে যখন কথা বলে তার মধ্যে একটা রগুড়ে ভাব দেখা যায়।

নাজির ॥ বলুন, আপনার কী বলার আছে?

প্রজা ॥ *[কথা বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার গলা কাঁপতে লাগল। তার কথা আটকাতে লাগল।]* জাহাঁপনা, আমার নাম ইয়াসিন। আমি হুজুরের একজন নগণ্য প্রজা। আমি হুজুর, ছেলেপুলে নিয়ে এই শহরেই বাস করি। শহরে আমার আসবাব তৈরির একটি ছোট্ট কারখানাও আছে। *[কাঁদো-কাঁদো স্বরে]* হুজুর কী বলব, *[একটু কেঁদে নিয়ে]* বলতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। *[থরথর করে কাঁপছে।]* আমি বলতে পারছি না। আমার গলা শুকিয়ে আসছে। *[ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে]* হুজুর আমাকে মাপ করে দিন। আমি বসব!

সুলতান ॥ বসবেনই যদি, তবে উঠলেন কেন?

দরবারে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল

ইয়াসিন ॥ অন্যায় হয়ে গেছে হুজুর। গোস্তাকি মাফ করুন।
[কাঁদতে-কাঁদতে বসে পড়ল।]
সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

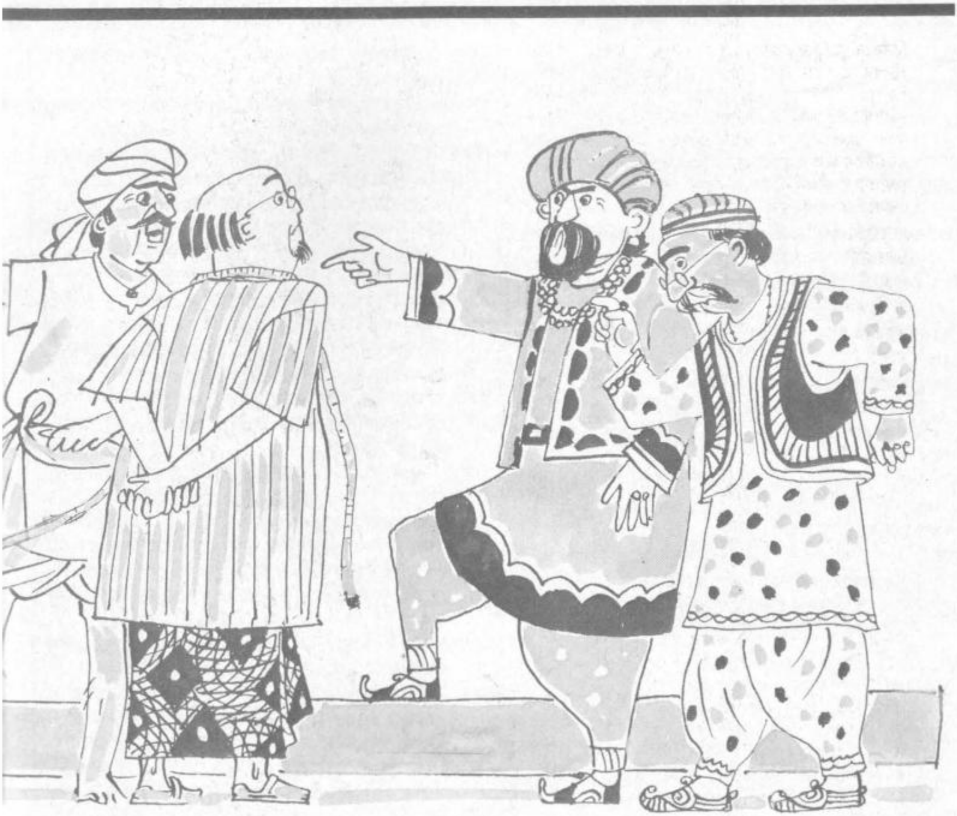

সুলতান ॥ খামোশ ! খামোশ !

সবাই হাসি থামাল।

সুলতান ॥ এ-আবার কী-রকম ! আপনি অমন একজন তাগড়াই লোক, কিছু বলার আগেই কেঁদে ফেললেন !

২য় প্রজা ॥ *[এর মধ্যেও একটা রগুড়ে-ভাব আছে, তবে কথা কম বলে। ইয়াসিনের বন্ধু। সুতরাং ইয়াসিনের কথায় এমনভাবে সায় দেয় দেখলেই মনে হয়, বোকা-বোকা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে ইয়াসিনের মতো কান্না-জড়ানো গলায় নাকি সুরে]* হুজুর, আমার নাম সোরাব। *[ইয়াসিনকে দেখিয়ে]* আমি ইয়াসিনের বন্ধু। আজ্ঞে আমি জানি, কেন ইয়াসিনের না-কেঁদে উপায় নেই। হুজুর, কাল সারারাত ধরে *[বলতে-বলতে তোতলাতে লাগল, তারপর যাতে হাউ-হাউ করে কেঁদে না-ফেলে, তাই কান্নাটাকে জোর করে চাপার জন্য চিৎকার করে উঠল]* কাল সারারাত আমার ওই বন্ধু ঘুমোতে পারেননি।

সুলতান ॥ আপনার বন্ধু ঘুমোতে পেরেছেন-কি-পারেননি সেটা আপনার বন্ধুই বলবেন। আপনার ঘুম হয়েছে কি না সেটাই আপনি বলুন।

সোরাব ॥ *[একটু থতমত খেয়ে]* আজ্ঞে হুজুর, সেকথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে মিথ্যে কথা বলব না, জাহাঁপনা, আমি যতবার ঘুমোব মনে করেছি, ততবারই ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু একবার কিছুতে চোখে ঘুম এল না।

সুলতান ॥ সেটা কত রাত্তির ?

সোরাব ॥ হুজুর, রাত্রি নয়, সেটা সকাল।

সুলতান ॥ সকালে তো মশাই কুঁড়ের বাদশা ছাড়া আর কেউ ঘুমোয় না।

সোরাব ॥ না হুজুর, সে এমন সকাল যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি, সূর্য উঠে পড়ে।

সুলতান ॥ ও ! তার মানে, রোদ উঠে গেলেও আপনার ঘুম ভাঙে না ! *[একটু মুচকি হেসে]* অত ধানাইপানাই না করে ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলুন দিকি !

সোরাব ॥ আজ্ঞে, বলতে পারলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। কিন্তু যতবারই বলব-বলব মনে করছি, ততবারই বুকের ভেতরটা ধকধক, ধকধক করে কেঁপে উঠছে। তার চেয়ে আমি বসে পড়ি হুজুর।

সুলতান ॥ *[ধমক দিয়ে]* না, আপনি বসবেন না।
সোরাব ॥ *[ধমক খেয়ে বসতে গিয়েও বসা হল না। আচমকা নিজের মনে বলে ফেলল]* এই খেয়েছে! এ যে উলটো বিপত্তি হয়ে গেল!
সুলতান ॥ *[সবটা শুনতে না পেয়ে গর্জে উঠলেন]* কী হয়ে গেল?
সোরাব ॥ *[চমকে উঠে]* কিছু নয় হুজুর। বিশ্বাস করুন, বলতে আমার ভয় করছে! *[ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।]*
সুলতান ॥ *[সোরাবকে ঠকঠক করে কাঁপতে দেখে মনে হল লোকটা তামাশা করছে। তাই ইয়াসিন আর সোরাবের দিকে আঙুল তুলে]* আপনারা দু'জন কি আমার সঙ্গে তামাশা করতে এসেছেন! এটা রাজদরবার। আপনাদের তামাশার জায়গা নয়। আপনারা যদি না-বলেন দু'জনকেই আমি কয়েদে পুরে ঘানি টানাব।
সোরাব ও ইয়াসিন ॥ *[একসঙ্গে চিৎকার করে]* ওরে বাবা রে, বাবা রে! *[চোখের পলকে সুলতানের পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে]* হুজুর আমাদের মা-বাপ।
সুলতান ॥ তবে বলুন!
ইয়াসিন ॥ *[মড়া-কান্নার মতো চিৎকার করে]* হুজুর, আমাদের এই সুখের রাজ্যে চোর ঢুকেছে!
সুলতান ॥ *[অবাক হয়ে]* চোর!
সোরাব ও ইয়াসিন ॥ *[একসঙ্গে]* হ্যাঁ হুজুর, চোর!

ঠিক এইসময়ে, অর্থাৎ চোর বলার সঙ্গে-সঙ্গে রাজদরবারের বাইরে জুতোর গটমট শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল, কারা যেন রাজদরবারেই আসছে। দরবারসুদ্ধ লোকের উদ্‌গ্রীব চোখ সেইদিকেই।

সুলতান ॥ কারা আসছে?

সুলতানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই দু'জন কোতোয়াল, ওস্তাগর, জহুরি, সওদাগর ও জমাদারকে পাকড়াও করে সুলতানের সামনে হাজির করল। একজন কোতোয়ালের হাতে দেখা গেল সেই পুঁটলিটা। সুলতানের পায়ের কাছে এতক্ষণ পড়ে ছিল ইয়াসিন আর সোরাব। তারা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল। কোতোয়াল কুর্নিশ করল সুলতানকে।

সুলতান ॥ *[তাদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে]* কী ব্যাপার!
১ম কোতোয়াল ॥ হুজুর, এই যে চারজন লোককে দেখছেন, এদের একজন ওস্তাগর *[ওস্তাগর মাথা হেঁট করল]*, একজন জহুরি *[জহুরি যথারীতি মাথা হেঁট করল]*, একজন সওদাগর *[সওদাগর মাথা হেঁট করল]*, আর এ হচ্ছে জমাদার *[জমাদারও মাথা নোয়াল]*, এই চারজনে হুজুর, শহরের শান্তি ভঙ্গ করেছে।
সুলতান ॥ কীরকম?
২য় কোতোয়াল ॥ *[পুঁটলিটা সুলতানকে দেখিয়ে]* এই পুঁটলিটার মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে এরা রাস্তায় মারামারি করছিল।
সুলতান ॥ *[অবাক হয়ে]* পুঁটলি নিয়ে মারামারি!
১ম কোতোয়াল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। এটি একটি চোরাই জিনিস।
সুলতান ॥ *[আরও অবাক হয়ে]* চোরাই জিনিস! আমার রাজ্যে চোর কোত্থেকে এল?
ইয়াসিন ॥ *[হঠাৎ চেঁচিয়ে]* আমরা ঠিক কথা বলেছি কি না দেখলেন তো হুজুর!
সুলতান ॥ *[ইয়াসিনকে থামিয়ে]* আপনি চুপ করুন!
২য় কোতোয়াল ॥ আজ্ঞে হুজুর, চোর কোত্থেকে এল, সেটা তদন্তসাপেক্ষ। কেননা, আসল চোর এখনও ধরা পড়েনি। সে পালিয়েছে। কিন্তু এই চোরাই জিনিসটা এরা সকলেই দাবি করছে নিজের বলে।
জমাদার ॥ *[কটাক্ষ করে]* আপনাদের কথাটা চেপে গেলেন কেন কোতোয়ালবাবারা?
ওস্তাগর ॥ ঠিক কথা! আপনারাও তো ওই পুঁটলিটা হাতিয়ে নেওয়ার তাল করেছিলেন। পারলেন না বলেই তো...

একজন কোতোয়াল সুলতানের সামনে চিৎকার করতে না-পেরে দাঁতে-দাঁত চেপে চোখ পাকাল। অন্য কেউ দেখতে পেল না। কিন্তু ওস্তাগর ভয় পেয়ে সব কথা শেষ করতে পারল না।

সওদাগর ॥ চোখ রাঙালে কী হবে! ও তো নির্যস কথাই বলেছে।
১ম কোতোয়াল ॥ *[সওদাগরের কথাটা চাপা দেবার জন্য চিৎকার করে]* চোরাই জিনিসটা নিয়ে এই চারজনে যখন কার জিনিস ঠিক করতে পারল না, তখন এর ভেতরের মাল এরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার ফন্দি আঁটল।
জহুরি ॥ আপনারাও যে জিনিসটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দু'জনে ভাগ করে নেবার মতলব এঁটেছিলেন, সেই কথাটা বলছেন না তো!
সওদাগর ॥ আমরা বাধা দিলুম বলেই তো আপনারা আমাদের গ্রেফতার করে আনলেন। বলুন সত্যি কি না!
২য় কোতোয়াল ॥ *[থতমত খেয়ে আরও জোরে]* হুজুর, এই পুঁটলিটা এদের কোনও একজনের যদি হত, তবে কখনওই সে ভাগাভাগি করতে রাজি হত না। এদের কারও নয় বলেই, এই চোরাই জিনিসটা এরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে রাজি হয়ে যায়।
ওস্তাগর ॥ *[হঠাৎ চিৎকার করে]* আপনাদের কথাটা বেমালুম হজম করে ফেলছেন যে!
সুলতান ॥ *[ওস্তাগরের চিৎকার শুনে, ধমক দিয়ে]* খামোশ! খামোশ! *[দরবারের গুঞ্জন স্তব্ধ হলে]* আমি জানতে চাই, পুঁটলিটা কোত্থেকে পাওয়া গেছে? কে পেয়েছে প্রথম?
জমাদার ॥ আজ্ঞে আমি। সকালবেলা আমি যখন রাস্তা সাফা করছি তখন দেখি, একটা কমবয়সী চোর, পুঁটলিটা চুরি করে, রাস্তায় ঘুম দিচ্ছে। আমি ধমক দিতেই চোরটা ওই পুঁটলি ফেলে পালাল।
ইয়াসিন ॥ *[হঠাৎ উৎসাহে চেঁচিয়ে]* হুজুর, এতক্ষণ আমি সেই চোরটার কথাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলুম।
সুলতান ॥ আপনার কি চুরি গেছে কিছু?
ইয়াসিন ॥ আজ্ঞে যায়নি। কিন্তু যাব-যাব করছিল।
সুলতান ॥ *[বিরক্ত হয়ে]* আপনি তো আচ্ছা ভোঁতা লোক মশাই। যাব-যাব করছিল, আর তাতেই আপনি কেঁদে-ককিয়ে পাড়া মাত করে দিলেন!
সোরাব ॥ আজ্ঞে হুজুর, ইয়াসিনের কাঁদাটা অন্যায্য কিছু নয়। কেননা, আপনার আব্বাজান যখন সুলতান ছিলেন, তখন আমাদের এই শহরে চোরের উপদ্রব একেবারেই ছিল না, কিন্তু এখন যদি উপদ্রব শুরু হয়, তবে তো কান্না পাবেই। *[নিজেই ফুঁপিয়ে উঠল।]*
সুলতান ॥ *[সোরাবকে ধমক দিয়ে]* আপনি থামুন! *[জমাদারকে]* এখন দেখছি, তুমিই একটি অকম্মা। তুমি চোরটাকে দেখতে পেলে, অথচ ধরতে পারলে না!
জমাদার ॥ আজ্ঞে ধরব কী! যেই ধরতে গেছি, সে ওই পুঁটলিটা ফেলে এমন ছুট দিল, কার সাধ্যি তাকে ধরে!
সুলতান ॥ তুমিও ছুটলে না কেন?

ইয়াসিন ॥ অ্যাই ! ঠিক কথা। এবার বলো, তুমিও তার পেছনে ছুটলে না কেন ?

সুলতান ॥ আঃ। আপনারা দু'জনে তো জ্বালিয়ে খেলেন।

ইয়াসিন থতমত খেয়ে বসে পড়ল।

জহুরি ॥ হুজুর, ও ছুটবে কী। ও তো মিথ্যে কথা বলছে। ও নিজেই তো চুরি করে যখন পালাচ্ছিল, তখন আমরা তিনজনে *[ওস্তাগর ও সওদাগরকে দেখিয়ে]* ওকে ধরে ফেলি।

ইয়াসিন ॥ *[আবার তিড়িং করে দাঁড়িয়ে]* এই, এসো পথে !

সুলতান ॥ *[ইয়াসিনকে কড়কে]* আপনি আবার কথা বলছেন !

ইয়াসিন মিইয়ে বসে পড়েন।

সুলতান ॥ *[জমাদারকে]* এরা যা বলছে সত্যি ?

জমাদার ॥ *[দৃঢ়গলায়]* না হুজুর, ঝুটা বাত। বলুক, কে আমাকে চুরি করতে দেখেছে !

ওস্তাগর ॥ তোমাকে চুরি করতে দেখলে তো তুমি হাতে-নাতে ধরা পড়তে। তখন তো আর এত তর্ক-বিতর্ক হত না।

জমাদার ॥ হুজুর, যেহেতু আমি চোরাই জিনিসটা উদ্ধার করেছি, সেই কারণেই কি আমি চোর হয়ে গেলুম ?

সুলতান ॥ এখন, এটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না যে, চোরাই জিনিসটা তোমার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। চোর তুমি, না অন্য কেউ, সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তোমরা, মানে ওস্তাগর, জহুরি আর সওদাগর ভাগ করে নেবার ফন্দি এঁটেছিলে।

ইয়াসিন ॥ *[আবার দাঁড়িয়ে]* হুজুর, কোতোয়াল দু'জন বাদ পড়ে গেল !

সুলতান ॥ আঃ ! *[বিরক্ত]* আবার আপনি ! *[ইয়াসিনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আবার ওস্তাগর, জহুরি ও সওদাগরের দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে]* চোরাই জিনিস উদ্ধার করে কোতোয়ালিতে জমা না-দিয়ে যারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার মতলব আঁটে, তারাও চোর। সুতরাং চোরের মতো তারাও শাস্তি পাবার যোগ্য।

ইয়াসিন ॥ হেঁঃ হেঁঃ বাবা ! আমাদের সুলতানের সঙ্গে চালাকি নয়। শাবাশ বটে বুদ্ধি !

সুলতান এবার মুখে কোনও কথা উচ্চারণ না করে ইয়াসিনের দিকে কটমট করে তাকালেন।

ইয়াসিন সেই চাউনি দেখে ধড়ফড়িয়ে বসে পড়ল।

সুলতান ॥ তবে শাস্তি দেবার আগে, আমি এই পুঁটলিটা খুলে দেখতে চাই, এর ভেতর কী-কী জিনিস আছে ! তারপর জিনিসের মালিককে খুঁজে বার করার চেষ্টা হবে। তাকে যদি পাওয়া যায় ভাল, নইলে, এই মালটা আমার তোশাখানায় জমা পড়বে।

ইয়াসিন ॥ এর নাম বিচার, বুঝলে ! তার মানে মালটি হবে সুলতানের।

সুলতান ॥ *[ক্ষিপ্তস্বরে]* আবার ! আপনি যদি ফের কথা বলেন, আমি আপনাকে দরবার থেকে বার করে দেবার হুকুম জারি করব।

ইয়াসিন মুখটি চুন করে বসে পড়ল।

সুলতান ॥ *[কোতোয়ালের কাছে পুঁটলিটি চেয়ে]* দেখি, পুঁটলিটা !

কোতোয়াল সুলতানের হাতে পুঁটলিটা তুলে দিল। সুলতান পুঁটলিটা ওপর থেকে টিপে-টিপে দেখতে লাগলেন। দরবারসুদ্ধু সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সুলতান পুঁটলির গিটটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে একটি ছোট্ট মেয়ের পায়ের একজোড়া নতুন চপ্পল আর একটি নতুন সাদামাটা শাড়ি বেরিয়ে পড়ল। দেখতে-দেখতে দরবারের লোকেরা সবাই প্রথমটা কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপরে মুহূর্তের মধ্যে ইয়াসিনই প্রথম হেসে উঠল হো-হো করে। তাকে হাসতে দেখে দরবারসুদ্ধু সমস্ত লোক চিৎকার করে হাসতে লাগল। শুধু হাসলেন না রাজা। তিনি গম্ভীর।

সুলতান ॥ *[হঠাৎ আদেশের সুরে]* খামোশ ! খামোশ ! এটা কি আপনাদের বৈঠকখানা ! আমি আপনাদের সুলতান। আমার সামনে হ্যা-হ্যা করে হাসছেন ?

ইয়াসিন ॥ আজ্ঞে হুজুর, হাসি তো পাবেই। এত কাণ্ড করে শেষে, এ যেন সেই বিয়ের ভোজে কাঁঠালবিচির তরকারি।

সুলতান ॥ *[ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে]* আপনি আর একবার কথা বলুন ! আপনাকে আমি কাঁঠালবিচিই গেলাব। বুঝলেন !

ইয়াসিন পড়ি-মরি করে বসে পড়ল।

সুলতান ॥ *[ধমকের সুরে]* শুনে রাখুন, আপনাদের হাসি পেতে পারে, কিন্তু আমার পাচ্ছে না। কেননা, আমি বুঝতে পারছি না এটা চুরির জিনিস কি না। কিন্তু সেই ছেলেটা এই পুঁটলিটা ফেলে রেখে, পালিয়ে গিয়ে একটা মস্ত কাজ করে গেছে। মানে, কার কার মনে চুরি করার বাসনা আছে, সেটি সে দেখিয়ে দিয়েছে।

সকলে ভয়ে-ভয়ে একে-অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

সুলতান ॥ সুতরাং সেই চোরেদের *[ওস্তাগর, জহুরি ও সওদাগরের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন]* শাস্তি দিতেই হবে।

ওস্তাগর ॥ *[নিমেষের মধ্যে লুটিয়ে]* হুজুর, আমাদের মা-বাপ…

সওদাগর ॥ *[একইভাবে লুটিয়ে]* আমায় শাস্তি দিলে আমার ছেলে-মেয়েগুলো না-খেতে পেয়ে মরে যাবে হুজুর !

জহুরি ॥ *[একইভাবে]* আমায় শাস্তি দিলে আমার ব্যবসাটা লাটে উঠবে হুজুর।

জমাদার ॥ দেখুন হুজুর, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকেও শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলছি, আমি চুরিও করিনি, এমনকী ওদের ভাগাভাগিতে সায়ও দিইনি।

সওদাগর ॥ *[ন্যাকামির সুরে]* ও মা, কী মিথ্যেবাদী। তুই তখন বললি না, পুঁটলিটা পড়ে আছে, ওটার ব্যবস্থা করতে !

জমাদার ॥ ব্যবস্থা করতে বলা মানে কি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে জিনিসগুলো নিয়ে নেওয়া !

জহুরি ॥ আচ্ছা, ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু ওই কোতোয়াল দু'জন ? বল্, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে চায়নি ?

জমাদার ॥ হুজুর, জহুরির কথা শুনে রাখুন, ও মেনে নিচ্ছে আমি ভাগ করার কথা বলিনি। তবে হ্যাঁ, আমি ওদের এই কথাটা স্বীকার করছি, ওই কোতোয়াল দু'জন পুঁটলিটা হাতাবার চেষ্টা করেছিল।

ইয়াসিন ॥ *[হঠাৎ আবার]* কত দূরের জল কোথায় গড়াচ্ছে দ্যাখো !

সুলতান ॥ *[কড়কে]* আবার কথা !

ইয়াসিন আবার বসে পড়ল।

সুলতান ॥ হ্যাঁ, এখন দু'পক্ষের কথা শুনে এটা প্রমাণ হচ্ছে তুমি ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা বলোনি। কিন্তু জিনিসটি তোমার হেফাজত থেকে পাওয়া গেছে।

জমাদার ॥ কিন্তু হুজুর, এটা যে চোরাই জিনিস, সেটা তো এখনও প্রমাণ হল না। ছেলেটাকে আমি 'চোর' বলতেই সে ভয়ে পালাবার সময় পুঁটলিটা রাস্তায় ফেলে গেল। এখন হুজুর, আমি জমাদার। রাস্তার মধ্যিখানে একটা পুঁটলি পড়ে থাকলে সেটা রাস্তা ঝাড়ু দেবার সময় তুলে সরিয়ে না-রাখলে হুজুর, তখনও তো আমায় দোষী হতে হবে।

সুলতান ॥ তোমার অত কথা বলার দরকার নেই। আমার বিচার আমি করে ফেলেছি। এটা প্রমাণ হয়েছে, এই তিনজন, জহুরি, ওস্তাগর আর সওদাগর অন্যের জিনিস হাতিয়ে নিয়ে

নিজেরা ভাগ করে নিতে চেয়েছিল। সুতরাং এদের প্রত্যেককে আমি একমাস করে সশ্রম কারাবাসের হুকুম দিলুম।

তিনজনে ॥ *[একসঙ্গে মড়া-কান্না কেঁদে]* হুজুর। *[সুলতানের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।]*

সুলতানের দেহরক্ষীরা তিনজনকে টেনে তুলে গ্রেফতার করল।

সুলতান ॥ *[জমাদারকে]* কিন্তু তুমি যে চোর নও, সেটা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে আমি সময় দিলুম। তোমার কথা অনুযায়ী এই পুঁটলিটা যে-ছেলেটা রাস্তায় ফেলে পালায়, তার সঙ্গে তোমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। মানে তুমি তাকে দেখেছ। সুতরাং আমার হুকুম, তোমাকে সাতদিনের মধ্যে তাকে খুঁজে বার করে, আমার কাছে ধরে আনতে হবে। সে যদি বলে, তার কাছ থেকে তুমি পুঁটলিটা কেড়ে নাওনি, তবে তুমি ছাড়া পাবে। আর সেইসঙ্গে এও জানা যাবে, এই পুঁটলি সে পেল কোত্থেকে। চুরি করেছে, না তার নিজের। এখন এই পুঁটলিটা আমার জিম্মায় থাকবে। যার জিনিস প্রমাণ হবে, তাকে আমি নিজে ফেরত দেব। *[দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়ে, জহুরি, ওস্তাগর ও সওদাগরকে দেখিয়ে]* যাও, এদের নিয়ে যাও! এদের কয়েদ করে রাখো।

দেহরক্ষীরা জহুরি, ওস্তাগর ও সওদাগরকে গ্রেফতার করে বাইরে নিয়ে চলল। তাদের পেছনে-পেছনে কোতোয়াল দু'জনও বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতান ॥ *[ধমক দিয়ে কোতোয়াল দু'জনকে]* তোমরা কোথা যাচ্ছ? দাঁড়াও! *[তাঁর অন্য দু'জন দেহরক্ষীকে নির্দেশ করে]* হ্যাঁ শোনো! তোমরা এখনই আমার সাক্ষাতে এই কোতোয়াল দু'জনের মাথার পাগড়ি কেড়ে নাও! জামা খুলে নাও!

দেহরক্ষী দু'জন তাদের মাথার পাগড়ি খুলে, গায়ের জামা কেড়ে নিল। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে দেখছে।

সুলতান ॥ *[পাগড়ি-জামা খোলা হলে দু'জন কোতোয়ালকে হুকুম করেন]* এবার এখানে কান ধরে ওঠ-বোস করো।

কোতোয়াল দু'জন ইতস্তত করতে লাগল।

সুলতান ॥ *[ধমক দিয়ে]* করো!

কোতোয়াল দু'জন কান-ধরে ওঠ-বোস করতে লাগল।

সুলতান ॥ *[সিংহাসন থেকে নামতে-নামতে]* হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলুক। এমনই করে চলবে, যতদিন না সেই ছেলেটা ধরা পড়ে ততদিন। থামলেই পিঠে চাবুক পড়বে। *[বলেই সুলতান বেরিয়ে গেলেন।]*

ইয়াসিন ও সোরাব ॥ *[একসঙ্গে]* এবার বোঝো ঠেলা!

মঞ্চ অন্ধকার হল।

তৃতীয় দৃশ্য ॥ প্রথম দৃশ্যের সেই রাস্তা

রাস্তাটা নিরিবিলি। এখন বিকেল। সেই ছেলেটিকে দেখা গেল। দাওয়ার ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে ছেলেটি বসে আছে। ঠিক সেইসময়ে ইয়াসিন আর সোরাব ঢুকল।

ইয়াসিন ॥ *[ঢুকতে ঢুকতে, পেছনে সোরাব]* যাক বাবা, আল্লার কৃপায় মোটামুটি শান্তিতে সব বিচার-টিচার হয়ে গেল!

সোরাব ॥ *[উচ্ছ্বাসে]* দারুণ! দারুণ! কী দারুণ বুদ্ধি বল সুলতানের। খপ করে ধরে ফেললেন তিনটে লোককে। চলো ঘানি টানতে।

ইয়াসিন ॥ *[হাসতে-হাসতে]* দুটো কোতোয়ালের কী অবস্থা, চালাও ওঠ-বোস! *নিজে ওঠ-বোস করতে গেল, কোমরে লাগল]* উ-হু-উ-হু!

সোরাব ॥ *[ধরে]* এই বয়সে যেমন বাহাদুরি দেখানো!

ইয়াসিন ॥ *[ব্যথায় বিকৃত মুখে]* ভাগ্যিস আমাদের ওঠ-বোস করতে বলেননি সুলতান।

সোরাব ॥ আমরা ওঠ-বোস করব কেন? আমরা তো চুরি করিনি!

ইয়াসিন ॥ দ্যাখ, বোকার মতো কথা বলিসনি। জানিস, সুলতানের কত ক্ষমতা! ইচ্ছে করলে, যাকে খুশি তিনি যখন-তখন চোর বানিয়ে ফেলতে পারেন।

সোরাব ॥ চুরি না করলেও?

ইয়াসিন ॥ তবে আর বলছি কী! শুধু কি তাই, তুমি যদি চোর না-হতে চাও, বেশি বেগড়বাঁই করো মারো ওঠ-বোস। *[আবার ওঠ-বোস করতে গেল। আবার কোমর ব্যথায় টনটন করে উঠল]* উ-হু-উ-হু!

সোরাব ॥ *[ইয়াসিনকে আবার ধরে ফেলল। ধরতে গিয়ে দু' জনের মাথা ঠুকে গেল। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে]* চুরি না করলেও যদি সুলতান আমাদের চোর বানান, তবে তো চুরি করেই চোর হওয়া ভাল!

ইয়াসিন ॥ ভালই তো!

সোরাব ॥ *[চাপাস্বরে]* তুই কখনও চুরি করেছিস?

ইয়াসিন ॥ তুই?

সোরাব ॥ *স্বীকার করে]* হেঁ-হেঁ! *[মুখটিপে হাসল।]*

ইয়াসিন ॥ *[দাঁতের ফাঁকে হাসি এনে]* আমিও হেঁ-হেঁ!

সোরাব ॥ *[উৎসাহে এগিয়ে এসে]* তুই ক' বার চুরি করেছিস?

ইয়াসিন ॥ আমি? একবার।

সোরাব ॥ আমিও একবার। তুই কী জিনিস চুরি করেছিস?

ইয়াসিন ॥ দুধ।

সোরাব ॥ *[আলতো করে একগাল হেসে]* দুধ?

ইয়াসিন ॥ *[সোরাবের মতো চাপাস্বরে হাসতে-হাসতে]* হ্যাঁ। সেদিন আমার খিদেটা সকাল থেকে খালি, দুধ খাই, দুধ খাই করছিল। থাকতে পারলুম না। দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিও তখন তাল পেয়ে, ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে চোঁ-চোঁ করে মেরে দিলুম একবাটি! কেউ ধরতে পারল না। *[চাপা-হাসিতে দু' জনে গড়িয়ে পড়ল।]*

সোরাব ॥ *[হাসির জের টেনে]* আমিও ঠিক তাই।

ইয়াসিন ॥ *[হাসতে-হাসতে থেমে]* তুইও *দুধ।*

সোরাব ॥ *[মুখ টিপে হেসে]* না, ঘুগনি। সেদিন বাড়িতে হয়েছিল। ঘুগনির কী খোশবাই! নোলা একেবারে টসটস করছে। আমিও থাকতে পারলুম না। কেউ যখন ছিল না, সেই ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে এই এতটা মেরে দিলুম।

দু' জনেই হেসে উঠল।

সোরাব ॥ *[হাসি থামাতে-থামাতে]* যাই বল, এইসব আলতু-ফালতু জিনিস চুরি করে সুখ নেই।

ইয়াসিন ॥ তবে কি সেই চোর-ছেলেটার মতো চপ্পল আর শাড়ি চুরি করতে চাস?

ছেলেটা এতক্ষণ বসেছিল দাওয়ায়, কানে কথাটা পৌঁছে গেল। ঝট করে সে মুখ তুলে তাকাল।

সোরাব ॥ দূর! ও তো সেই ছিঁচকে চোরে করে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

দেখা গেল, ঠিক এই সময়ে ছেলেটি ধীরে-ধীরে উঠে এগিয়ে আসছে ইয়াসিন আর সোরাবের দিকে। ইয়াসিন অথবা সোরাব ছেলেটিকে দেখতে পায়নি। কাজেই তারা নিজের খেয়ালে কথাই বলে চলেছে।

ইয়াসিন ॥ আচ্ছা, মনে কর, সেই চোর-ছেলেটাকে ধরা গেল না।

তারপর ধর, যাদের জিনিস চুরি গেছে তাদেরও খোঁজ মিলল না। তখন কী হবে ?

সোরাব ॥ শুনলি না, তখন সুলতান বললেন, তাঁর তোশাখানায় জমা পড়বে।

ছেলেটি এগিয়ে এসে ইয়াসিন আর সোরাবের পেছনে দাঁড়াল।

ইয়াসিন ॥ তার মানে, জিনিসটা সুলতানের হয়ে গেল। এও তো একরকমের চুরি রে!

সোরাব ॥ তা হলে, তোর কথা মতো এই দাঁড়াচ্ছে, সুলতান যদি চুরি করতে পারেন, আমরাও পারি।

ইয়াসিন ॥ আলবত !

সোরাব ॥ *[ইয়াসিনের চোখের দিকে নিজের চোখ স্থির রেখে]* চুরি করবি ?

ইয়াসিন ॥ সুযোগ পেলে একশোবার করব।

সোরাব ॥ তবে চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

ইয়াসিন ॥ কোথায় ?

সোরাব ॥ সুলতানের ঘরে।

ইয়াসিন ॥ কেন ?

সোরাব ॥ সেই চপ্পল আর কাপড়টা সুলতানের কাছে আছে। আমরা সুলতানের ঘরে ঢুকে চুরি করে ভাগাভাগি করে নেব।

এমন সময় ছেলেটি তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আচমকা খুক করে কেশে ফেলল।

ইয়াসিন আর সোরাব ভয়ে চমকে উঠল। ভয়ে আঁতকে ধীরে-ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে সোরাব ইয়াসিনকে, ইয়াসিন সোরাবকে চোখ বড়-বড় করে দেখতে লাগল। দু' জনে একটু তফাতেই ছিল। হঠাৎ পেছনে ফিরে দু' জনেই একসঙ্গে ছেলেটিকে দেখে দু' জনে পালাতে গেল। কিন্তু দু' জনে দু' মুখে পালাতে গিয়ে, অর্থাৎ ইয়াসিন সোরাবের দিকে আর সোরাব ইয়াসিনের দিকে পালাতে গিয়ে ধাক্কা খেল। পড়ে গেল। চোখের নিমেষে উঠে পড়ে, দু' জনে দু' দিক দিয়ে পালাতে-পালাতে চেঁচিয়ে উঠল

দু'জনে ॥ *[একসঙ্গে]* ওরে বাবা রে!

ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল।

ঠিক সেইসময়ে একজন বুড়ো ঢুকল। ছেলেটিকে দেখল। বুড়োর পিঠে একটা রেশমি কাপড়ের পুঁটলি। বুড়োর যেন পুঁটলিটা বইতে কষ্ট হচ্ছে। পুঁটলির ভারে নুয়ে পড়েছে। সে হাঁফাচ্ছে। পুঁটলিটা পিঠ থেকে নামিয়ে বুড়ো বসে পড়ল। ছেলেটিও ঠিক এই মুহূর্তে তাকে দেখে ফেলল। ছেলেটি থতমত খেয়ে থমকে গিয়ে বুড়োকে দেখতে লাগল। বুড়োর কষ্ট দেখে, তারও করুণা হল। তারপর ধীরে-ধীরে একপা-একপা করে পিছিয়ে ছেলেটি আগে যেখানে বসে ছিল, রাস্তার সেই দাওয়াটার ওপর গিয়ে বসল। তার দৃষ্টি কিন্তু ভারী অবাক হয়ে সেই বুড়োকে দেখতে লাগল। বুড়োও তাকে দেখছে। হঠাৎ বুড়ো যেন তার ক্লান্তি মুছে ফেলে নিজের মনে কথা বলতে শুরু করল।

বুড়ো ॥ এই শহরটি আমাদের ভারী সুখের শহর। *[যেন আকাশ আর মাটির ওপর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল।]*

ছেলেটির দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হল।

বুড়ো ॥ আমাদের এখন যিনি সুলতান তাঁর বাবা কত যত্ন করে নিজে দাঁড়িয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এই শহর। কী নেই এই শহরে। সুলতানের ফুলবাগিচায় গোলাপের সুবাস থেকে প্রাসাদের অন্দর মহলে রাজকন্যার হাসি। *[একটু থামল।]*

ছেলেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমশ নরম হচ্ছে।

বুড়ো কথা বলতে-বলতে কখনও-কখনও থামছে। তাকে আড়চোখে দেখছে। আবার কথা বলছে। কিন্তু অধিকাংশ সময় বুড়ো আপনমনেই বকবক করে যাচ্ছে।

বুড়ো ॥ চাঁদনি রাতে চাঁদের রোশনাই থেকে প্রাসাদের খুশমহলে নূপুরের রিনঝিন। এমনকী মেওয়ার মিঠে-মিঠে গন্ধ, সবই পাওয়া যাবে এই শহরে।

ছেলেটির নরম দৃষ্টি তার মুখের ওপর স্থির হয়ে থমকে রইল।

বুড়ো ॥ তবে ইদানীং একটি ছিঁচকে চোর আমাদের এই সুখের শহরে বড় উৎপাত শুরু করেছে। *[একটু থামল।]*

ছেলেটির মুখের চেহারা পালটাল।

বুড়ো ॥ শোনা যাচ্ছে, চোরের বয়েসটা খুব একটা বেশি নয়। যে-বয়সে তার লেখাপড়া আর খেলাধুলো করা উচিত, সেই বয়সে ছেলেটি চুরিতে হাত পাকিয়েছে। *[আবার একটু থামল।]*

মনে হল, ছেলেটি রাগছে।

বুড়ো ॥ সম্প্রতি তার কাছ থেকে উদ্ধার করা একজোড়া নতুন চপ্পল, আর-একটি আনকোরা নতুন শাড়ি পাওয়া গেছে। সেগুলি সুলতানের জিম্মায় আটকা পড়েছে।

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো ॥ *[তার দিকে দৃষ্টি ফেলে]* তুই কে বাবা ?

ছেলে ॥ *[রাগে, উত্তেজনায়]* তোমরা যাকে চোর বলছ, আমি সেই চোর।

বুড়ো ॥ *[আঁতকে উঠে]* অ্যাঁ!

ছেলে ॥ *[রাগে গর্জে উঠে]* ওই শাড়ি আর চপ্পল আমার।

বুড়ো ॥ তুই চুরি করেছিস ? *[অবাক।]*

ছেলে ॥ *[চিৎকার করে]* মিথ্যে কথা!

বুড়ো ॥ মিথ্যে ?

ছেলে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমরা সবাই মিথ্যে-মিথ্যে আমায় চোর বলছ। ওগুলো আমার। আমার বোনের জন্য আমি চপ্পলটা কিনেছি। আর মায়ের জন্য শাড়িটা।

বুড়ো ॥ *[এতক্ষণ বসে ছিল। উঠে দাঁড়াল।]* দাঁড়া, দাঁড়া আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বলছিস, তুই কিনেছিস তোর মা আর বোনের জন্য ?

ছেলে ॥ *[গলায় জোর দিয়ে]* হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি কিনেছি নিজের পয়সা দিয়ে। এই শহরেই আমি কিনতে এসেছিলুম। কিনে রাত্তির হয়ে গেছল বলে কাল আমি আমার গাঁয়ের ঘরে ফিরতে পারিনি। আমি সারারাত ওই দাওয়াটার ওপর শুয়ে ছিলুম। একজন জমাদার আমাকে দেখে চোর ভেবে চেঁচিয়ে উঠল। আমি ভয়ে পালাতে গেলুম। আর ঠিক সেই সময় আমার হাত থেকে শাড়িটা আর চপ্পলটা পড়ে গেল। *[চোখ ছলছল করতে লাগল।]*

বুড়ো থতমত খেয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে। তার মাথায় হাত রাখল।

ছেলে ॥ আমার বাবা নেই। আমি রাখাল। আমি রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মাঠে যাই মেষ চরাতে। বেলা দুপুর হলে আমার বোনের হাতে মা খাবার পাঠায় আমার জন্য। ঘর থেকে বেরিয়ে, অনেকখানি পথ পেরিয়ে সে খুশিতে গান গাইতে-গাইতে আমার কাছে আসে। সেদিনও সে আসছিল এমনই করে গান গাইতে-গাইতে।

'এখান থেকে শুরু হবে অতীত ঘটনার একটি দৃশ্য। ফ্ল্যাশ ব্যাক।

শোনা যাচ্ছে দূর থেকে একটি ছোট্ট মেয়ের গলায় গান।

ধীরে-ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

মঞ্চ অন্ধকার হলে সেখান থেকে পুঁটলি নিয়ে বুড়ো বেরিয়ে যাবে।

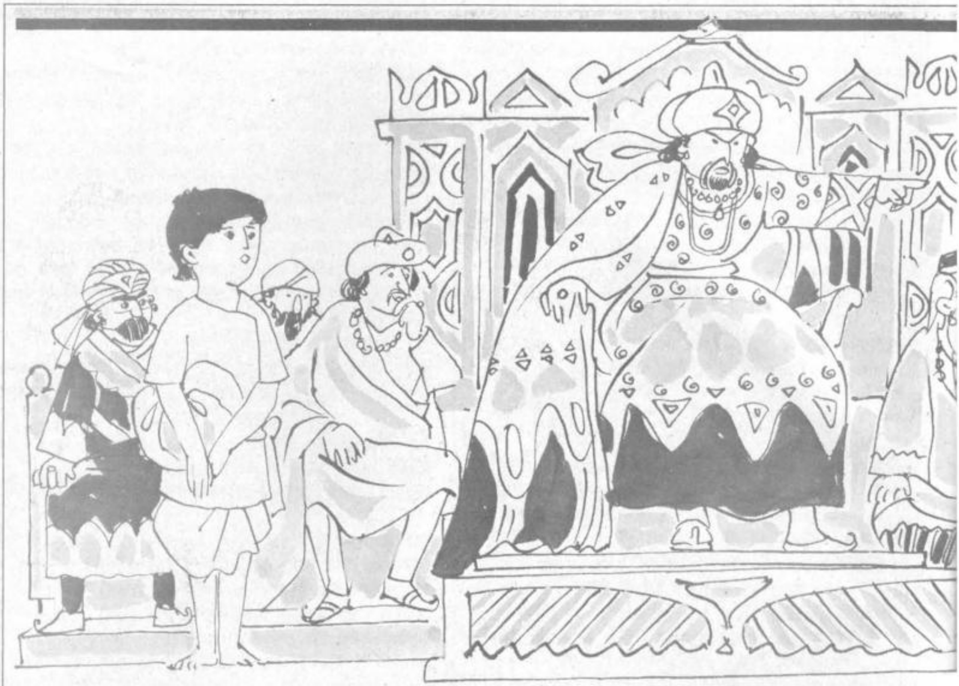

অন্য পরিবেশে দেখা যাবে শুধু ছেলেটিকে। তার মুখে হাসি। সে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বোনের জন্য। খুশির আবেশে তার মুখখানি ঝলমল করছে। বোন গান গাইতে-গাইতে ঢুকছে।

[বোনের গান]

আমার গানের নাও ভেসে যায়
বাতাসে ঢেউ তুলে,
দাদার মুখের মিষ্টি হাসি
তাই তো ওঠে দুলে।
দেখতে যে পাই মুখখানি সেই
আকাশ-মুকুর ছায়ে,
উছল নদীর স্রোতের ধারায়,
মেঘের গায়ে-গায়ে।
(ওরে) বন-সবুজের পাখি,
তাই যে তোকে ডাকি,
দে না রে তুই মন ভরিয়ে
সুরের স্বপ্ন আঁকি।

ছেলেটি হঠাৎ চিৎকার করে মেয়েটির নাম ধরে ডাক দিল :

ছেলে ॥ আলো-ও-ও !

আলো ॥ *[চিৎকার করে সাড়া দিল]* দাদা-আ-আ !

শোনা যাচ্ছে মেয়েটির পায়ের মলের আওয়াজ। যতই দূর থেকে কাছে সেই মলের আওয়াজ এগিয়ে আসছে, ততই যেন চারিদিক আনন্দে উছলে উঠছে। উছলে উঠছে আলো, জলতরঙ্গের টুংটাং। পরেই দেখা গেল একটি সাত-আট বছরের ছোট্ট মেয়েকে। একটি ডুরে শাড়ি পরেছে সে। গাছ-কোমর করে বাঁধা। পায়ের ওপর একটু তোলা। কানে রুপোর গয়না। তার মাথায় খাবারের পাত্র। হাতে জলের ঘটি।

আলোর দাদা ॥ *[খুশিতে-হাসিতে মুখখানি ভরে আছে, বোনের মাথা থেকে খাবারের পাত্র নামাতে-নামাতে]* আমার জন্য যত কষ্ট তোর।

আলো ॥ না, আমাদের জন্য যত কষ্ট তোর ? সেই সকাল থেকে কোন্ সন্ধে অবধি তোকে এখানে থাকতে হয় বল তো !

আলোর দাদা ॥ *[একদিকে বসে, খাবারের ঢাকা খুলতে-খুলতে]* আমার আবার কী কষ্ট। ভেড়াগুলোকে দ্যাখ, কেমন শান্ত। *[বাইরে দূরে হাত তুলে দ্যাখাল।]* কেমন নিজেদের মনে ঘাস খাচ্ছে আর চরে বেড়াচ্ছে। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। *[হঠাৎ খাবারের পাত্র দেখে]* এতসব কী রে ?

আলো ॥ মা দিয়েছে। *[আলো পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসল।]*

আলোর দাদা ॥ এটা কী ?

আলো ॥ পায়েস। খেতে হয়। আজ তোর জন্মদিন না !

আলোর দাদা ॥ আজ বুঝি ? আমার একদম মনে নেই।

আলো ॥ তোর মনে না থাকলে কী হয়েছে ! মা কখনও ভোলে নাকি !

আলোর দাদা ॥ *[পায়েসটা দেখিয়ে]* তুইও একটু খা !

আলো ॥ *[উঠে পড়ে]* আমি খেয়েছি। তুই খেয়ে নে ! আমি বরঞ্চ ভেড়াগুলোকে দেখি।

আলো ছুটে বেরিয়ে গেল। তার ছোটার ছন্দে বাজনা ঝঙ্কার

তুলল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।

মঞ্চ অন্ধকার হলে খাবারের পাত্রগুলি সরিয়ে নিতে হবে। বুড়ো, পুঁটলি নিয়ে আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়বে। আলোর দাদা, সেই ছেলেটিও যথাস্থানে দাঁড়াবে। অর্থাৎ বাজনার তালে-তালে আলো জ্বললে যেন মনে হয়, অতীত থেকে আমরা আগের অবস্থাতে এসেছি।

বুড়ো ॥ *[আলো জ্বললে]* থামলি কেন?

আলোর দাদা ॥ তুমি শুনে কী করবে?

বুড়ো ॥ শুনে হয়তো কিছুই করতে পারব না। তবে, শুনতে আমার ভাল লাগছে।

আলোর দাদা ॥ তোমার ভাল লাগলেই বা কী, আর না-লাগলেই বা কী। আমার তো কোনও লাভ নেই।

বুড়ো ॥ বলা যায়, কোথা থেকে কার কী লাভ হয়। বল্ শুনি। *[আদরে]*

আলোর দাদা ॥ আমি অনেক কষ্ট করে, পয়সা জমিয়ে আমার বোনের জন্য ওই চপ্পল আর মায়ের জন্য ওই শাড়ি কিনেছিলুম। তুমি কি পারবে আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যেতে। তাঁকে আমি বলব, ওগুলো আমি নিজের পয়সা দিয়ে কিনেছি। চুরি করিনি। ওগুলো আমি ফেরত চাই।

বুড়ো ॥ চেষ্টা তো করতে পারি। মনে কর্ না, আমি তোর হঠাৎ-পাওয়া বন্ধু।

ছেলেটি বুড়োর মুখে এই কথা শুনে অভিভূতের মতো তার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার ক্লান্ত মুখখানা ক্ষণিকের জন্য উছলে উঠল। সেই সঙ্গে আবার জলতরঙ্গের টুংটাং শব্দ শোনা গেল। আবার নিভে গেল মঞ্চের আলো। আবার অতীতের দৃশ্য। [ফ্ল্যাশ ব্যাক।]

আলো জ্বললে দেখা যাবে একটি মিষ্টি সুরের তালে হাসতে-হাসতে, নাচতে-নাচতে আলো নামে মেয়েটি একটি ছড়া গাইছে। তার দাদা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। আলোকে দেখছে।

[আলোর ছড়া]

আমার কানে গুনগুনিয়ে
বলছে ভ্রমর রানি,
মা যদি হয় সাত রাজ্যের
সুন্দরী রাজরানি
রাতের বেলা চাঁদের আলো
ভোরের আলোয় ফুল
মায়ের গলায় মুক্তো-মানিক
দুলত যে দুল-দুল।

সঙ্গে-সঙ্গে দাদাও ছড়া ধরল।

[দাদার ছড়া]

বোনটি আমার হত যদি
রাজকন্যে আরও,
ঝুম-ঝুম-ঝুম বাজত নূপুর
পায়ে তখন তারও।
নাচতে-নাচতে চলে যেত
শিউলিবনের বাঁকে,
সেই যেখানে অচিন রাজার
রাজপুত্তুর থাকে।

[আলোর ছড়া]

তাই বইকী, একলা আমি
যেতাম কেন সেথা ?
আমার যে এক দাদা আছে
জানে নাকো কে তা ?
সঙ্গে যেত আমার দাদা
রাজকন্যের তরে,
সাতনরিহার গলায় দিয়ে
আনত তাকে ঘরে।

শেষ করেই আলো হেসে উঠল।

আলোর দাদা ॥ *[ছুটে, ধরতে গিয়ে]* তবে রে...

আলো দাদাকে ধরা না দিয়ে মঞ্চে হাসতে-হাসতে ছুটতে লাগল।

আলোর দাদা ॥ *[হাসতে-হাসতে আলোর পেছনে ছুটতে-ছুটতে]* একবার ধরতে পারলে...

আলো ॥ *[ছুটে]* ধরতেই পারবে না।

ছুটতে-ছুটতে আলোর পায়ে একটা কাঁটা ফুটে গেল।

আলো ॥ *[আর্তনাদ করে বসে পড়ল]* আঃ ! *[নিজের পায়ে হাত দিয়ে ছটফট করতে লাগল।]*

আলোর দাদা ॥ *[থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ছুটে এল আলোর কাছে]* কী হয়েছে ? *[মুখে আতঙ্কের ছাপ।]*

আলো ॥ *[যন্ত্রণায় কাঁদো-কাঁদো]* কাঁটা।

আলোর দাদা ॥ *[ভয়ে]* রক্ত ! *[আলোর পায়ে হাত দিয়ে কাঁটা বার করার চেষ্টা করল।]*

আলো ॥ *[যন্ত্রণায়]* উঃ ! আমার লাগছে !

দাদা কাঁটাটা আলোর পা থেকে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আলোর পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। আলো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাদা তার নিজের কোমরে জড়ানো কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলে আলোর পায়ে বেঁধে দিল। তারপর তাকে সাবধানে ধরে ধীরে-ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

জলতরঙ্গ আবার বেজে উঠল। মঞ্চ অন্ধকার হল। আবার আলো জ্বলতে দেখা গেল, আগে, যেখানে সেই বুড়ো আর আলোর দাদা দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেইখানেই তারা দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো ॥ *[আলোয় তার মুখ ভেসে ওঠার পর মুহূর্ত চুপ থেকে]* এবার বুঝতে পেরেছি।

আলোর দাদা ॥ কী বুঝেছ ?

বুড়ো ॥ তোর বোনের জন্য কেন তুই চপ্পল কিনেছিস ! তার নরম পায়ে আর যেন কাঁটা না-ফোটে।

আলোর দাদা ॥ কিন্তু এখনও সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। *[গলায় ব্যাকুলতা।]*

বুড়ো ॥ এখনও ?

আলোর দাদা ॥ তুমি আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যেতে পারো ?

বুড়ো ॥ *[গম্ভীর স্বরে]* পারি। *[বুড়ো ঘুরে দাঁড়াল]* একটু অপেক্ষা কর। আমি একটা কাজ সেরে এক্ষুনি আসছি। তারপর তোর সামনে রাজাকে না রাজার সামনে তোকে নিয়ে যাব সেটা ভাবব। আমার পুঁটলিটা এখানে রইল। তুই দ্যাখ। আমি যাব আর আসব।

বুড়ো বেরিয়ে গেল।

আলোর দাদা ॥ *[চেঁচিয়ে]* দেরি কোরো না, আমি বাড়ি যাব।

বুড়ো ॥ *[চেঁচিয়ে]* না......।

বুড়ো বেরিয়ে যাবার পর তার পথের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল আলোর দাদা। তারপর মুখ ফেরাল।

আলোর দাদা ॥ *[আপন মনে]* কখন আমার ঘরে ফেরার কথা। মা না-জানি কত ভাবছে। আর আলো ? সে নিশ্চয়ই ভাবছে, দাদা কোনও বিপদে পড়েছে। কী হবে এখন ? *[বুড়োর পুঁটলিটার কাছে বসে তারপর শুয়ে সেই পুঁটলিটা মাথায় দিল। এমনভাবে শুয়ে থাকল দর্শকরা তার মুখটি দেখতে পাচ্ছে। তারপর আলোর সেই 'আমার কানে গুনগুনিয়ে' গানটি গুনগুন করে গাইতে লাগল। তারপর আচমকা স্বপ্নের মতো আলোর হাসির শব্দটা তার কানে বেজে উঠল।]*

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দেখা গেল সেই জমাদারকে, মঞ্চে প্রবেশ করল। সে প্রথমে আলোর দাদাকে দেখতে পায়নি। আলোর দাদাও তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু যে মুহূর্তে জমাদার কথা বলতে শুরু করল, ঠিক সেই মুহূর্তে আলোর দাদা অবাক হয়ে তাকে দেখতে-দেখতে উঠে বসল।

জমাদার ॥ *[নিজের মনে]* একে বলে, কাজ নেই তো টিকটিকি তাড়াও। আমার কী দরকার ছিল ওই চোরাই জিনিস নিয়ে অত বাহাদুরি দেখানোর ! *[স্তব্ধ গলায় ভয়ে]* এখন, সাতদিনের মধ্যে যদি চোরটাকে ধরতে না-পারি, আমাকেও কয়েদে পাঠিয়ে দেবে। শুনেছি কয়েদখানায় কাঠপিঁপড়ের রাজত্ব। রাতে ঘুমোতে গেলে কামড়ায়, দিনে সুড়সুড়ি দেয় ! ওরে বাবা রে, এখন আমি... *[কথা শেষ হবার আগেই সে দেখতে পেয়েছে আলোর দাদা সেই ছেলেটিকে। সে থমকে অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। তারপর চিৎকার করে উঠল আচমকা।]* ধরেছি, চোর ! চোর !

আলোর দাদা চুপচাপ বসে রইল। তাকে দেখতে লাগল।

জমাদার ॥ *[যেমন করে চু-কিতকিত খেলার সময় হাত বাড়িয়ে অন্যকে মোর করার চেষ্টা করা হয়, তেমনই দু'হাত বাড়িয়ে এদিক-ওদিক করে]* এবার কোথা যাবি তুই ! *[উত্তেজনায়]* এবার পালা দেখি ! তখন পালিয়ে গিয়ে আমায় ঘোল খাইয়ে ছেড়েছ। এখন আর ছাড়ি !

আলোর দাদা অবিচলিত। কিন্তু মুখে তার রাগের চিহ্ন। জমাদার ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে আসছে। শিকার হাতে পাওয়ার আহ্লাদে তার চোখ দুটো চকচক করছে। মুখে অস্পষ্ট আওয়াজ করে সে একপা-একপা করে এগোতে লাগল।

জমাদার ॥ *[আলোর দাদার কাছে বুড়োর পুঁটলিটা দেখে]* ওই, আজও চুরি করেছে ওই পুঁটলিটা। আর পালাবি কোথায় ? এবার তোর মুণ্ডুপাত করব।

জমাদার যখন আলোর দাদার কাছাকাছি এসেছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেছে, ঠিক তার আগের মুহূর্তেই আলোর দাদা দাঁড়িয়ে জমাদারের বুকের জামাটা খামচে ধরেছে।

আলোর দাদা ॥ *[জামা খামচে ধরে]* আমার পুঁটলি কোথায় ?

জমাদার ॥ *[থতমত খেয়ে, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে]* পাজি, হতভাগা চুরি করে আবার আমার গলাধরা। গুন্ডামি করার জায়গা পাওনি !

আলোর দাদা ॥ *[রুখে]* আমি চোর ! *[জমাদারকে হঠাৎ মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে ঠেলতে লাগল।]* কোথায় আমার পুঁটলি ?

জমাদার ॥ *[গুঁতো খেয়ে পিছু হটতে-হটতে]* ওরে খুদে শয়তান, আমার সঙ্গে মারামারি করতে চাস ! *[ঝাঁকুনি দিল। আলোর দাদা পড়ে গেল।]*

সঙ্গে-সঙ্গে আলোর দাদা উঠে পড়েই জমাদারের সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিলে। কখনও সে জমাদারকে জাপটে ধরে। গড়িয়ে-গড়িয়ে তার বুকের ওপর বসে। আবার কখনও জমাদার উলটে তাকে জাপটে ধরে। দু'জনের লড়াই-এ ছেলেটা যখন কাবু হয়ে গেছে, তখন শোনা গেল অনেক ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঘোড়ার

খুরের শব্দ থামলে, দু'জন সেপাই প্রবেশ করল।

সেপাই ॥ *[ধমক দিয়ে]* এই ! রাস্তার মাঝখানে কারা মারামারি করছে। মহামান্য সুলতান আসছেন। *[চাবুক তুলে]* হটো এখান থেকে।

জমাদার ঝটপট উঠে পড়ল। ভয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটিও উঠে পড়ল।

দু'জনেই হাঁফাচ্ছে।

ছেলেটি রেগে ফুঁসছে।

জমাদার ভয়ে কুঁচকে আছে।

এমন সময় ভেরি বেজে উঠল। নিমেষের মধ্যে সেই রাস্তায় সুলতানের অনুচরেরা ঝলমলে পোশাক পরে উপস্থিত হয়ে রাস্তার এই নির্জন জায়গাটা রঙে-রঙে ভরিয়ে দিল। ঝলমল করে উঠল চারিদিক।

তারপরেই প্রবেশ করল সেই বুড়ো মানুষটি। তার মুখে হাসি। ঠিক তার পেছনেই সুলতান। তিনি রাস্তার সেই উঁচু দাওয়াটার ওপর দাঁড়ালেন। রেশমি কাপড়ে জড়ানো সেই পুঁটলিটা এতক্ষণ পড়েই ছিল।

জমাদার ॥ *[সুলতান দাওয়ায় দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটির হাত খপ করে ধরে, টানতে-টানতে সুলতানের কাছে নিয়ে গিয়ে]* আজ্ঞে হুজুর, এই সেই চোর !

আলোর দাদা ॥ *[প্রতিবাদ করে চিৎকার]* মিথ্যে কথা !

জমাদার ॥ *[সেই রেশমি কাপড় বাঁধা পুঁটলিটা হাত তুলে দেখিয়ে]* দেখুন হুজুর, এই চোরটা আজ আবার ওই পুঁটলিটা চুরি করেছে।

সুলতান ॥ *[জমাদারের কথা শুনে মুচকি-মুচকি হাসলেন, তারপর ছেলেটিকে দেখতে-দেখতে]* হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।

বুড়ো ॥ *[পুঁটলিটার কাছে এগিয়ে এসে]* হ্যাঁ হুজুর, এই সেই পুঁটলি ! এইটাই আমার !

আলোর দাদা ॥ *[তীব্র প্রতিবাদ করে]* না, আমি চুরি করিনি।

জমাদার ॥ *[চেঁচিয়ে]* আলবত ! তুই চোর !

আলোর দাদা ॥ *[জমাদারের হাত ছাড়িয়ে বুড়োর কাছে ছুটে গিয়ে]* তুমিও আমাকে চোর বলছ ?

বুড়োর মুখে রহস্যের হাসি।

আলোর দাদা ॥ *[সুলতানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে]* ঠিক আছে ! তবে আমাকে দিন শাস্তি। আমি জানব, সুলতানের রাজ্যে সবাই সাধু, শুধু আমি চোর।

সুলতান ॥ *[দৃঢ় অথচ সহৃদয় কণ্ঠে]* না, তুমি চোর নও। তুমি ওঠো ! আমার কাছে এসো !

ছেলেটি উঠল। সুলতানের কাছে গেল।

বুড়ো মানুষটি পুঁটলিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতে রাখল।

ইতিমধ্যে আরও কিছু শহরবাসী সেখানে জমায়েত হয়েছে।

সুলতান ॥ *[উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে]* আমার প্রিয় প্রজাগণ, আপনারা শুনুন, সেদিন হঠাৎ আমার কানে এল, আমার রাজ্যে একটা কমবয়সী চোর এখানে-সেখানে চুরি করে বেড়াচ্ছে। তার কাছ থেকে একটি পুঁটলি উদ্ধার করে আমাকে বলা হল, সেটি চোরাই জিনিস। পুঁটলির ভেতরে ছিল একজোড়া ছোট্ট চপ্পল আর একটি শাড়ি। এ-দুটি দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি তখন সত্য ঘটনা খুঁজে বার করার জন্য আমার নাজিরকে আদেশ করলুম। আমার নাজির চোরের সন্ধানে ছদ্মবেশে তল্লাশি শুরু করল।

সুলতান ॥ *[সেই বুড়ো মানুষটিকে দেখিয়ে]* এই আমার সেই নাজির।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে বুড়ো মানুষটির দিকে তাকাল।

সুলতান সঙ্গে-সঙ্গে সেই বুড়ো মানুষটির মুখ থেকে নকল দাড়িগোঁফ আর মাথা থেকে নকল চুল টেনে খুলে ফেললেন। এতক্ষণ যাকে একজন থুত্থুড়ে কুঁজো বুড়ো মনে হচ্ছিল, এখন দেখা গেল সে একজন যুবক।

সমবেত সকলের মুখে বিস্ময়ের কলস্বর শোনা গেল।

ইতিমধ্যে সেই ইয়াসিন আর সোরাবও এখানে উপস্থিত হয়েছে।

ইয়াসিন ॥ *[নাজিরকে দেখে, অবাক হয়ে]* একী রে !

সোরাব ॥ *[দৃষ্টি নাজিরের দিকে স্থির রেখে]* এ যে ভোজবাজি

ইয়াসিন ॥ এ যে দেখি, ভ্যাবাচ্যাকা হাম্বা।

সুলতান ॥ *তাদের দেখে]* এ কী ! আপনারা এখানেও জুটেছেন !

ইয়াসিন ॥ এখানে আসতে চাইনি হুজুর। আমরাও চোরটাকে ধরব বলে এদিক-ওদিক যখন ঘুরপাক দিচ্ছি, তখন শুনলুম আপনি এখানে এসেছেন।

সোরাব ॥ তাই ছুটে এলুম।

ইয়াসিন ॥ আজ্ঞে, তা হলে কি চোর ধরা পড়ল না ?

সুলতান ॥ পড়েছে। তারা কয়েদে। সে চোরের নাম জহুরি, ওস্তাগর, সওদাগর আর কোতোয়াল।

সোরাব ॥ তারা এখনও ওঠ-বোস করছে হুজুর ?

সুলতান ॥ *[মৃদু বিরক্ত হয়ে]* আঃ ! আপনারা আবার কথার মাঝখানে কথা বলছেন ? আমি কী বলছি, একটু স্থির হয়ে শুনুন।

সোরাব ও সুলতান ॥ *[একসঙ্গে]* বলুন হুজুর। আমরা এই স্থির হলুম। *[দু'জনে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।]*

সুলতান ॥ হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আমার নাজির অনেক তত্ত্বতালাশ করে জানতে পেরেছে, যাকে আমরা সবাই চোর ঠাউরে ছিলুম, সে চোর নয়। সে তার বোনকে উপহার দেবার জন্য *[চপ্পল জোড়া একজন দেহরক্ষীর হাত থেকে নিয়ে]* এই চপ্পল জোড়া কিনতে শহরে এসেছিল। *[দেহরক্ষীর হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে]* আর এই শাড়িটা সে কিনেছে তার মার জন্য। *[জমাদারকে ইঙ্গিত করে]* তুমি ভুল করে এই নির্দোষ ছেলেটিকে চোর ঠাউরে বিপত্তি বাধিয়েছ। সুতরাং এই ছেলেটিকে আমি তার চপ্পল আর শাড়ি ফেরত দিচ্ছি। *[ছেলেটির হাতে তুলে দিল। তারপর নাজিরের হাত থেকে রেশমি-কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে]* সেইসঙ্গে মা আর বোনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার জন্য আমার তরফ থেকে তাকে দিলুম মায়ের জন্য রুপোর বাসনপত্তর, আর বোনের জন্য রেশমি পোশাক। *[রেশমি-কাপড়ের পুঁটলিটা ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন।]* আর এই দরাজ মন তসরিফ ছেলেটির জন্য আমার ইনাম *[দেহরক্ষীর হাত থেকে মুদ্রার থলি নিয়ে]* এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আর একটি টাট্টু ঘোড়া। *[ছেলেটি সুলতানকে সালাম করল মাথা হেঁট করে।] [জমাদারকে]* আর তুমি যে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলি চুরি করোনি, আর চোরকে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছ···

ইয়াসিন ॥ *[হঠাৎ]* তার জন্য তুমি কান পাকড়ে এমনি করে ওঠ-বোস করো !

ইয়াসিন আর সোরাব নিজেরাই এ-ওর কান ধরে মঞ্চের মধ্যিখানে কাঠের পুতুলের মতো টুকটুক করে এগিয়ে এসে ওঠ-বোস করতে লাগল। সুলতান হেসে উঠলেন। সুলতানের দেখাদেখি সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠল। আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। সঙ্গে শোনা গেল ছেলেটির ছোট্ট বোন আলোর সেই গান

"আমার গানের নাও ভেসে যায়"

ধীরে-ধীরে পরদা নেমে এল।

[সমাপ্ত]

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ফিশারিজ পড়তে হলে

দেবব্রত মল্লিক

জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে পৃথিবীতে, সমান হারে কিন্তু খাদ্য-উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তাই খাদ্যাভাব দিন-দিন বেড়েই চলেছে। এ ছাড়া প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব তো রয়েছেই। সেদিক থেকে মাছ আমাদের খাদ্য তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য। ভালভাবে এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাই মাছ চাষের চেষ্টা চলছে। প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ সমুদ্র, নদী, খাল, বিল বা হ্রদ থেকে মানুষের প্রয়োজনমতো মাছ সংগ্রহ করলেই হবে না, দরকার মাছ সংগ্রহের সঙ্গে-সঙ্গে মাছের বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ ও প্রজনন বৃদ্ধির প্রয়াস। তা না হলে প্রকৃতি থেকে শুধুই মাছ সংগ্রহ করলে একদিন তো মাছের সঞ্চয় শেষ হয়ে যাবে।

মাছ চাষের মূল লক্ষ্য দুটি। এক, মাছ ধরা ও মাছের সংরক্ষণ। দুই, মাছের লালন। এ ছাড়া ফিশারিজ নিয়ে পড়াশোনা করলে চাকরির সুযোগও পাওয়া যায়। তাই এখন ফিশারিজ পড়ার চাহিদাও দিন-দিন বাড়ছে।

মাছ ধরার প্রাথমিক প্রস্তুতি *ফোটো : সোমনাথ ঘোষ*

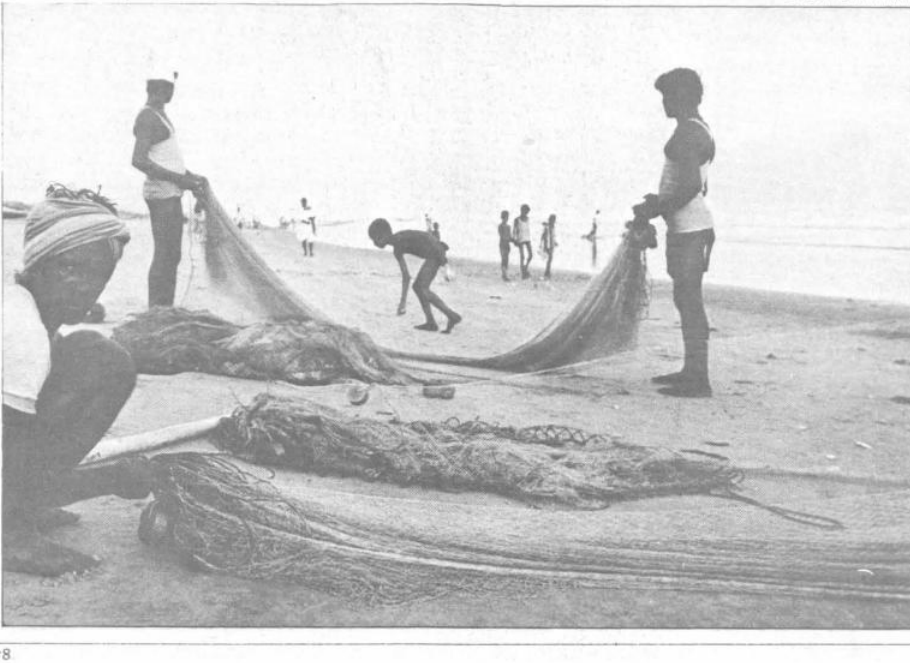

মাছ চাষের শ্রেণীবিভাগ

মাছ সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুকুর, ভেড়ি ইত্যাদিতে থাকে। মাছের বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে মাছ চাষের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। (ক) সমুদ্রে মাছের চাষ এবং (খ) অন্তর্দেশীয় জলাধারে মাছের চাষ।

সমুদ্রে মাছের চাষ

সমুদ্র মানুষের খাদ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। মানুষ প্রতি বছর সমুদ্র থেকে মাছ সংগ্রহ করে কোটি কোটি টন। সমুদ্রের ভাণ্ডারে মানুষের অন্যতম খাদ্য হল মাছ। মানুষ সমুদ্র থেকে মাছ সংগ্রহের পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাজারজাত করে। সমুদ্রের তটরেখা থেকে সমুদ্রের দিকে ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়।

বহু বছর ধরে অনেকের মনে একটা ধারণা রয়েছে যে, সমুদ্রে মাছের ভাণ্ডার অফুরন্ত। খুশিমতো মাছ ধরে গেলেই হল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহের হার, উৎপাদনের হার অপেক্ষা (বিশেষ করে হেরিং, স্যমন, সারডিন মাছ) অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সামুদ্রিক মাছেরও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে তাই ঠিক করা হয়েছে, সমস্ত মাছ সংগ্রহকারী দেশকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেন সমুদ্র থেকে বেশি বা কম মাছ সংগ্রহ না হয়। সমুদ্রের একটি বিশেষ সংগ্রহ স্থানে কত মাছ থাকতে পারে এবং কতটুকুই বা মাছ সংগ্রহ করা যাবে, সে-বিষয়ে প্রথমে অনুসন্ধান করে তবেই মাছ সংগ্রহ করা উচিত। এ ছাড়াও মাছের প্রজনন-ঋতুতে (কয়েকটি মাছের ক্ষেত্রে) সেই মাছের সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অন্তর্দেশীয় জলাধারে মাছের চাষ

এই জলাধার দু' ধরনের। মিষ্টি জলাধার এবং ঈষৎ লবণাক্ত জলাধার। নদী, খাল, পুকুর, হ্রদ, বাঁধ ইত্যাদি মিষ্টি জলাধার। ঈষৎ লবণাক্ত জলাধার বলতে বোঝায় সমুদ্র উপকূলবর্তী ভেড়ি এবং নদীর মোহনায় তৈরি 'ব' দ্বীপগুলোর অন্তর্ভুক্ত পুকুর ঝিল ইত্যাদি।

অন্তর্দেশীয় মাছের ভাণ্ডার সমুদ্রের মতো অফুরন্ত নয়। তাই অন্তর্দেশীয় জলাধার থেকে মাছ সংগ্রহ এবং সেই সঙ্গে মাছের বংশ বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করে সংগ্রহ ও উৎপাদনের মধ্যে সমানুপাত রক্ষা করার চেষ্টা চলছে।

এই চেষ্টা নিছকই চেষ্টা নয়, এর জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, জলাধার সংস্কার। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা। জানতে হবে বিভিন্ন মাছের জীবন-বৃত্তান্ত, তাদের স্বভাব এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে। মাছের ডিম সংগ্রহ ও চারাপোনা সরবরাহের ব্যবস্থারও উন্নতি করতে হবে।

মাছ চাষের বিষয়ে আগ্রহী প্রত্যেককেই এ-সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। প্রয়োজনমতো শিক্ষা গ্রহণের পর সে-বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী করে তোলা সম্ভব। ফলে শুধুমাত্র নিজেরই উন্নতি হবে না, দেশ এবং সমাজের উন্নতি হবে।

সরকারিভাবে মাছ চাষের শিক্ষাক্রম ভিন্ন-ভিন্ন পর্যায়ে চালু করা হয়েছে। যে কেউই এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

এভাবে সমুদ্র থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টন মাছ ধরা হয়

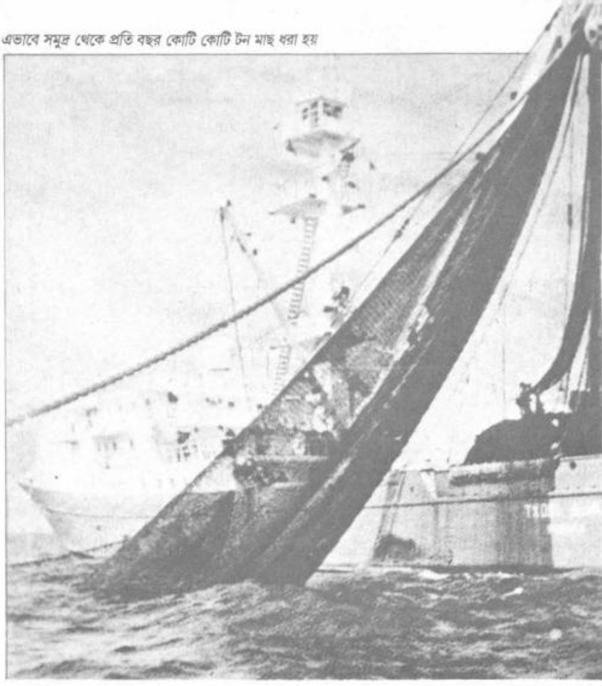

গ্রাস রুট লেভেল ট্রেনিং

এই ট্রেনিং-এর সময়সীমা পনেরো দিন। গ্রামের ব্লক পর্যায়ে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়। যিনি ট্রেনিং নেবেন তাঁর নিজস্ব পুকুর থাকা দরকার। পঞ্চায়েতের প্রমাণপত্র নিয়ে এই শিক্ষাক্রমে যোগ দেওয়া যায়। শিক্ষানবিশ থাকাকালীন ভাতা পাওয়া যাবে দৈনিক ১৫ টাকা হারে। এই শিক্ষাক্রমে যাঁরা ভাল ফল করবেন, তাঁরা সুযোগ পাবেন এক মাসের এই ট্রেনিং কোর্সের। জেলা সদরে এক মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এর পরের পর্যায় তিন মাসের শিক্ষাক্রম স্টেট লেভেল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং দেওয়া হয় কল্যাণীতে। ট্রেনিং চলাকালীন প্রত্যেকেই ভাতা পাবেন দৈনিক ১৫ টাকা।

মিষ্টি জলের মাছ চাষের মতো নোনা জলের মাছ চাষের শিক্ষাক্রম একই ভাবে দেওয়া হয়। সময়সীমা ৩৫ দিন। এই নোনা জলের মেরিন ট্রেনিং সফল হলে এক বছরের বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য পাঠানো হয় সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ, কোচিনে। সমস্ত ব্যয়ভার সরকারের। ওখানে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার পদ্ধতি, বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জাল ফেলা ও জাল তোলা এবং

সংগ্রহ করা মাছের বিশেষ সংরক্ষণ প্রভৃতি শেখানো হয়।

আরও বিস্তারিত খবর জানার জন্য যোগাযোগ করতে হবে : ডাইরেক্টরেট অব ফিশারিজ, ৮/বি লিণ্ডসে স্ট্রিট (তৃতীয় তল), কলকাতা-৭০০০৮৭ ঠিকানায়।

মেয়েদের জন্য ট্রেনিং

মেয়েদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষাক্রমের সময়কাল এক মাস। ট্রেনিং চলাকালীন বিশেষ ভাতার ব্যবস্থাও আছে। এই স্বনির্ভর প্রকল্পে তাঁরাই অগ্রাধিকার পাবেন, যাঁদের স্বামী সমুদ্রে কিংবা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। সরকার ওঁদের কথা ভেবেই এই প্রকল্প চালু করেছেন। জাল বোনা এবং মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি ও মেরামত কীভাবে করতে হয়—এইসব শেখানো হয় এই ট্রেনিংয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এঞ্জিনিয়ারিং

ভারসোভা (বম্বে)-তে ইনল্যান্ড ফিশারিজ ট্রেনিং-এর ওপর সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়। সময়সীমা দু' বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এসসি। পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে এই সার্টিফিকেট কোর্স পড়া যায়। কিন্তু ব্যারাকপুরে পড়ার জন্যও আবেদন জানাতে হবে বম্বের ভারসোভায়।

ডি. এফ. এসসি. (বম্বে)

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং এম. এস্‌সি ফিশারিজ সমতুল। শিক্ষাক্রম দু' বছরের। এ ছাড়াও রয়েছে এম.এসসি ফিশারিজ (বম্বে)। এরও শিক্ষাক্রম দু' বছর। এখানে ফিশারিজ -এর ওপর পিএইচ ডি করারও সুযোগ আছে।

ব্যাচেলর ফিশারিজ অব সায়েন্স (বি. এফ. এস্‌সি)

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর এই শিক্ষাক্রমে যোগ দেওয়া যায়। সময়সীমা চার বছর। ম্যাঙ্গালোর এবং ওড়িশা এই দু' জায়গায় বি.এফ.এসসি পড়ার ব্যবস্থা আছে।

এম. এস্‌সি মেরিন বায়োলজি

মেরিন ফিশারিজ-এর জন্য এই শিক্ষাক্রম পশ্চিমবঙ্গের বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয় কল্যাণীতে পড়ানো হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এস্‌সি। এখানে ব্যাচেলর ফিশারিজ অব সায়েন্স খোলারও চেষ্টা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি এই শিক্ষাক্রম চালু হবে।

মাছ ধরলেই চলবে না, দরকার ঠিকমতো সংরক্ষণ
ফোটো : সোমনাথ ঘোষ

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ নটিকাল এঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি

কোচিনে এই শিক্ষায়তনের শিক্ষাক্রম মূলত সমুদ্রের মাছ এবং সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলে। সচরাচর আমাদের চারপাশে যে ধরনের মাছ এবং তাদের সংগ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই, তার চেয়ে সমুদ্রের মাছ ধরা বিষয়টি একটু অন্যরকম। শুধুমাত্র মাছ সম্বন্ধে জানলেই হবে না, যে জলযান নিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসতে হয় তার সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। জলযান (সি ট্রলার) থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাল ছুঁড়ে ফেলা এবং সময়মতো গুটিয়ে তোলা সব-কিছু সম্পর্কেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিও ক্রমশ আরও উন্নততর হচ্ছে।

তাই এই শিক্ষাক্রমের সময়সীমা ঠিক করা হয় বিষয়ের ওপর। শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো হল : ডেক হেড, স্কিপারস্‌, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

এম. এস্‌সি ওশানোগ্রাফি

কোচিনে এই শিক্ষাক্রম পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। কোর্সের সময়সীমা দু' বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এস্‌সি। সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য কোচিনের এই শিক্ষায়তন অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

পি. এস্‌সি ফিশারিজ

কিছুদিন হল পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফিশারিজ পরীক্ষা চালু হয়েছে। প্রত্যেক বছর অন্যান্য পরীক্ষার মতো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সময়মতো পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এস্‌সি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছ' মাসের বিশেষ শিক্ষানবিশ থাকতে হয়। এর পর ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে জুনিয়ার ফিশারিজ অফিসারের চাকরি পাওয়া যায়।

সমবায়ভিত্তিক মাছ চাষ

এই প্রকল্পে কয়েকজন মিলে সমবায় গঠন করে মাছ চাষ করতে পারেন। সরকারি সহায়তা পাওয়া যাবে সব ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক ঋণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি উন্নত মানের মাছের বীজ পাবেন শস্তায় এবং প্রয়োজন প্রকল্প রূপায়ণের সাহায্যও। এখন মাছ চাষিদের জন্য পেনশন চালু হয়েছে।

ফোটো : সোমনাথ ঘোষ

চল, এবার হাঁটতে শুরু করি । ওই ভাল লোকগুলি যে-রসদ দিয়ে গেছে তা নিয়ে মরুভূমির মধ্যে ঢুকতেও চিন্তা নেই···
কয়েক মাইল দূরে, ছোট্ট এক শহরে···
না, এর বেশি আমি কিছু জানি না···রোজ যেমন আসি, আজ সকালেও তেমনই ব্যাঙ্কে এসে দেখলাম বস্ পড়ে আছেন আর সিন্দুক খোলা···আমি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকলাম আর কয়েকটা লোককে ফাঁসিতেও লটকে দিলাম···কিন্তু চোর পালিয়ে গেছে···
ডাকাতির পরে জানলা দিয়ে পালিয়েছে··· এই পায়ের ছাপ দ্যাখো··· পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে । লক্ষ করো, ডান পায়ের জুতোয় শুধু একসার পেরেক···
ছাপ এত স্পষ্ট যে, ওকে ধরতে দেরি হবে না !
সর্বনাশ ! এই জুতোর ছাপ আমাকে এক্ষুনি ধরিয়ে দেবে···কী করি ?···
!
চমৎকার ! লোকটা ঘুমোচ্ছে !···বাহ্··· পেড্রোর মাথায় দারুণ ফন্দি খেলেছে !···
ও জেগে উঠলে বা নড়লে গুলি করব···
কাজ হয়ে গেছে···পেড্রো এখন নিশ্চিন্ত···

আমেরিকায় টিনটিন

আঃ !···ঘুম ভেঙেছে ! বিশ্রাম শেষ ! কুট্টুস, চল, রওনা হই···
আরে ! তাজ্জব ব্যাপার ! এটা আমার জুতো নয় । এই জুতোর তলায় পেরেক···পিছনে নালও আছে···অদ্ভুত কাণ্ড··· কিছুই বুঝতে পারছি না···
সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার···
ওই ছাপগুলো দ্যাখো···ছাপ লুকোতে চেষ্টা করেছিল···তবে ও আমাদের বোকা বানাতে পারবে না···ওকে এক্ষুনি ধরে ফেলব !
অস্বাভাবিক···
দাঁড়াও !
?
তোমাকে গ্রেফতার করছি !
কিন্তু কেন ? আমি প্রতিবাদ করছি !···
প্রতিবাদ, অ্যাঁ ?···ওল্ড ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা ?···ম্যানেজার খুন···আর টাকা লুঠ··· ?
শহরে ফিরতে সন্ধে হবে···
ওরা ফিরে এসেছে ! ফিরে এসেছে ! ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে ধরে এনেছে !
ওকে ফাঁসিতে লটকাও···
আমাদের কিছু করবার নেই, ফ্রেড··· সবাই ওকে ফাঁসি দেবার জন্যে পাগল···

ফুর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
পিটি, শিগগির ! ওরা আমার পিছনে আসছে !
খবরদার ! আর এগোবে না ।
ফুর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
যা বলছি শোনো ! সোনার বাটগুলি দিয়ে দাও··· কেড়ে নিতে বাধ্য কোরো না !
এতক্ষণ আমরা মেজাজ খারাপ করিনি, মেজাজ খারাপ করতে বাধ্য কোরো না !
জানো, তোমাদের দেখে আমরা আজ মোটেই ভয় পাচ্ছি না !
যদি তাই ভেবে থাকো···
তোমরা সত্যিকারের বিপদে পড়তে যাচ্ছ !

টিমি, ওদের ধরো !
গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
ফুর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
ফুর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
উউফ্ !
কুয়োর নীচে বাটগুলি পেয়ে
ওরা কী খুশিই না হবে !
না !
না আ আ আ আ !

জলের মানুষ

অনিতা অগ্নিহোত্রী

জলের তলায় চিকন অন্ধকার প্রথমে গাঢ় সবুজ, তারপর হালকা সবুজ, তারপর আস্তে-আস্তে ফিকে গোলাপি হয়ে উঠল। বাঁ পাড়ের তেঁতুল গাছটা থেকে হলদে-হলদে ছোট্ট-ছোট্ট পাতা জলের ওপরে তুলি থেকে ছেটানো রঙের মতন ছড়িয়ে যায়। প্রকাণ্ড চাঁদটা ফ্যাকাসে হয়ে হেলে পড়েছে দারাং পাহাড়ের খাঁজে। নাকে, মুখে, মাথায় ঝিরঝির করে সকালের হাওয়া এসে হাত বুলিয়ে যায়। এইরকম করে নন্দর আর-একটা দিন শুরু হয়। ভাল করে রোদ্দুর ওঠেনি এখনও। আধো-আধো গোলাপি আভা চারদিকে চাপা হাসির মতন ছড়িয়ে আছে।

লেজটা ভারী আর ভিজে-ভিজে লাগছে। জলের ধার ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়েছিল কাল সন্ধেবেলা। জোয়ারের জল বোধ হয় উঠে এসেছিল ওপরে। পিঠে-পেটে, হাত-পায়ের তালুতে বালি আটকে চিটচিট করছে। নন্দ একটা হাই তুলল। ডান পাশে বসে-থাকা নীল-সবুজ ছোট্ট পাখিটা তুরুক-তুরুক করে দু' পা পিছিয়ে গেল। খুব খিদে পাচ্ছে। পেটের মধ্যে একটা খালি-খালি উদাস ভাব ঘুরপাক খাচ্ছে। খাকগে। নন্দ আজ আর কিচ্ছু খাবে না। মুখের কাছে মাছের কাটলেট এনে ধরলেও না। উপোস করে রোদ্দুরে পড়ে থাকবে সারাদিন। মল্লিটা কোথায় গেল? মিটমিটে শয়তান এক নম্বরের। নিশ্চয়ই এতক্ষণে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁতটাত মেজে হাসি-হাসি মুখ করে পাড়ের কাছে ভেসে উঠেছে। কাল সন্ধে থেকেই নন্দ ওর ধারেকাছে ঘেঁষছে না। ভারী দায় পড়েছে।

"অ নন্দ, নন্দ, নন্দ। আঃ আঃ আঃ।" ওই বদ্যিবুড়ো ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে চালাঘর থেকে তেঁতুল গাছের গোড়ায়। তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে জলের কাছে এসে গেল। "আঃ আঃ আঃ।" নন্দ শুনেও না-শোনার ভান করে আকাশের দিকে তাকায়। আহ্লাদে টলটল করছে আকাশের নীল। কালো একটা প্রজাপতি গাঁদা ফুলের সব ক'টা ঝোপের গন্ধ শুঁকছে এসে-এসে, আবার দ্যাখো উড়ে যায়।

"অ। ছেলের আমার রাগ হয়েছে বুঝি?" বদ্যিবুড়ো হাঁটুর ওপর ধুতি গুটিয়ে উবু হয়ে জলের ধারে এসে বসল। হাতে দাঁতন-কাঠি।

"কথায়-কথায় অত রাগ করতে আছে!" নন্দ চুপ। গলার কাছটা ব্যথা-ব্যথা। ধীরেসুস্থে দাঁতন করে বুড়ো। তারপর দাঁতন-কাঠি ফেলে রেখে জলে নেমে চোখ-মুখ ধোয়। হাত-পা ধোয়। শেষে আড়ামোড়া ভাঙে দাঁড়িয়ে উঠে। "চিলি দিয়ে পাউরুটি রেখেছিলাম। দেখি পিঁপড়েগুলো বোধ হয় এসে জুটল। ফেলেই দিতে হবে দেখছি। আজ আবার মল্লির পেটটা ভার-ভার। জ্বরের মতো হয়েছে।"

পাউরুটির নাম শুনে সুড়ুত করে মুখে জল টেনে নেয় নন্দ। তারপর খচমচ করে উঠে আসতে থাকে গায়ের পিঠের জল ঝাড়তে-ঝাড়তে। মল্লির আবার কী হল? পেট ভার। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবেলায় চিনেবাদাম, বাতাসা, ঝালমুড়ি হ্যানোত্যানো। সাতবার ঘুম থেকে উঠে পাড়ের কাছে এসে ঠায় দাঁড়াও। যতদিন এই মেলা না ফুরোচ্ছে, আহ্লাদি লোকগুলোর আবদারের শেষ নেই। বদ্যিবুড়ো নিজে এসব ঝঞ্ঝাট পছন্দ করে না। কিন্তু জঙ্গল বিভাগের চৌকিদার বড়ই নাছোড়বান্দা।

নন্দ আকাশপাতাল ভাবে আর একমনে পাউরুটি খেতে থাকে। বদ্যিবুড়ো উঠে পড়ে। "দেখি। হোমোপাথির বাক্সটা আবার কোথায় গেল।" ওষুধ-বিষুধগুলো মরচে ধরে হলদে-হলদে হয়ে এসেছে। তাই সই। জিভের ওপর তিরিশ-চল্লিশটা বড়ি ফেলে দেয় বদ্যিবুড়ো অসুখ-বিসুখ করলে। তারপর দু'ঢোক জল খাও নদীর। ব্যস্।

দারাং পাহাড়ের মাথায় শিবের মন্দির আছে একটা। কপিলেশ্বর শিব, ভারী জাগ্রত ঠাকুর। বদ্যিবুড়ো বলে নাকি আড়াইশো বছরের পুরনো মন্দির। শিবরাত্তিরের এক হপ্তা আগে থেকে মেলা বসে

পাহাড়ের নীচে। সারি-সারি দোকান বসে। জাদুর তাঁবু। গণেশের কথাবলা-পুতুল। নাগরদোলা হইহই করে ঘূর্ণি খায় ওপর-নীচে। সেও দেখা যায় এই পুকুর পাড় থেকেই। এই দারাং গাঁয়ের লোকেরা তো আসেই, আরও আসে আশপাশের সাতগাঁয়ের লোক। ছই-দেওয়া সব গোরুর গাড়ির লাইন পড়ে যায় পাহাড়ের নীচে। নদীর ধারে উনুন গড়ে বউ-ঝিয়েরা। রান্নাবান্না হয়। শিবরাত্রির দিন ভারী জোর উপোস। মুখে জলের দানাটি পড়বে না। সারাদিন। সারা সন্ধে। রাত্তির তিনটের সময় ঠাকুরের প্রদীপ উঠবে মন্দিরের চুড়োয়, যেথায় আছে নাকি এক সোনার কলসি। সেই প্রদীপের শিখা নিজের চক্ষে দেখে তবে কিনা ভক্তরা খেতে বসবে। তাও আবার ফলপাকুড়, দুধ-কলা বড়জোর চিঁড়ের ভাত।

ব্রাহ্মণী নদী বয় পাহাড়ের নীচ দিয়ে। একধারে সেই নদীর জল কেটে খাল বানিয়েছে জঙ্গল বিভাগ। খাল ঘিরে এক ছোট্টখাট্টো চিড়িয়াখানা। সেখানে মোষের মতো বড় সব শম্বর হরিণ ঘুরে বেড়ায় শালগাছের ঝরে-পড়া হলুদ পাতার ওপর দিয়ে। কচি-কচি দুব্বো ঘাস, কি ছোলাভাজা হাতে নিয়ে দাঁড়ালে তারাও জালের ধারে এসে দাঁড়ায়। কখনও-সখনও তাদের লাল-লাল জিভ আর ভেজা-ভেজা নাক ঘষে দেয় খোকাখুকিদের হাতে। নাদুস-নুদুস খরগোশ আছে আট-দশটা। আর আছে তিনটে ময়ূর। বিকেল যখন সন্ধেকে ছুঁই-ছুঁই করে আর বেগুনি হয়ে আসে আকাশ, গলা তুলে তারা ডেকে ওঠে, ক্র্যাঁও, ক্র্যাঁও, ক্র্যাঁও। ভোঁদড় আছে দুটো। একগাদা টিয়াপাখি থাকে জালে ঘেরা গোলমতো জায়গাতে। কয়েক মাস হল রাশভারী চার-পাঁচটা বানর এসেছে মালয়েশিয়া থেকে। এখানকার বানরদের মতো হালকা দুষ্টু-দুষ্টু ভাব নয় তাদের। গালজোড়া দাড়ি আর গুরুগম্ভীর গোলাপি মুখ। আর আছে বদ্যিবুড়োর মাথার মণি নন্দ আর মল্লি। মল্লি আবার নন্দর চেয়ে বছর চারেকের বড়। হলে কী হয়, খুনসুটি আর ঝগড়ায় তার চার-পা মল্লি বাড়িয়েই আছে সবসময়। খালের পাড়ে একমানুষ উঁচু তারের বেড়া। তার ওপাশ দিয়ে যেতে-যেতে মানুষজনেরা কখনও-সখনও বলাবলি করে, "কুমির দুটো গেল কোথায় ? দেখছি না তো।" কেউ বলে,"ঘুমোচ্ছে বোধ হয়।" সারাদিনই তো কাঠ হয়ে পড়ে আছে। ওদের আর কাজটা কী ? জলের তলায় ডুবে তখন হয়তো বুড়বুড়ি কাটছে নন্দ আর মল্লি। কিংবা সত্যিই ওদিকের পাড়ে পড়ে আছে চার হাত-পা ছড়িয়ে। রোদ্দুর খাচ্ছে। মানুষজনের গলার আওয়াজ তাদের কানে গুনগুন করে বাজতে থাকে। শিবরাত্রির মেলার দিনক'টায় ভারী মুশকিল। চিড়িয়াখানায় বিজবিজ করে লোক। উৎসাহী কেউ-কেউ, যারা কিনা আগেরবার দেখে গেছে নন্দ-মল্লির কেরামতি, দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনে খাকি পোশাক-পরা ফরেস্ট-গার্ডকে। "দাদা, ও দাদা, ডাকুন না একবার আপনাদের কুমির দুটোকে।" ওরা নাকি মানুষের ডাক বুঝতে পারে।

অগত্যা ফরেস্ট-গার্ড নন্দ-মল্লিকে ডাকে, "আঃ আঃ আঃ। অ নন্দ। অ মল্লি।" কী আর করে, হাজার হলেও পুরনো সম্পর্ক। যেখানেই থাকুক, নন্দ-মল্লি একবার খোলা মিটমিটে চোখ মেলে পাড়ের দিকে তাকায়। তারপর সু—ইশ করে জলে ঝাঁপিয়ে পোড়াকাঠের মতন ভু—উস্ করে ভেসে ওঠে। অবশেষে গুটগুট করে হাঁটতে-হাঁটতে তারের জালির নীচে পৌঁছে যায়। তাই দেখে বাচ্চারা হাততালি দিয়ে ওঠে খুশিতে। বড়মানুষদের চোখ হয়ে ওঠে গুল্লি-গুল্লি। "এত বড় কুমির ! বাপ রে বাপ !" ফরেস্ট-গার্ড রেড়ির তেলে ভেজানো তার দুই গোঁফ চুমরে বলে, "হবে না-ই বা কেন ? বলি কোথা থেকে এয়েছে ? এদের দেশ জানো—পশ্চিমবঙ্গাল ! সোঁদরবন্স।"

নিষেধ করলেও বাচ্চারা শোনে না, ওদের জন্য খাবার ছড়ায়। চিনেবাদাম। ছোলাভাজা। "ও কাকু, কুমির কী খায় গো ?" বড়রাই কি ছাই জানে ঠিকঠাক। কোনও-কোনও দুষ্টু ছেলে ঘাস-পাতা ফেলে দেয় ওপর থেকে। কেউ-বা দেয় ঝালমুড়ির ঠোঙার তলানি। নন্দ ভাল জিনিসটি না পেলে খায় না। কিন্তু মল্লিটা হ্যাংলা-নম্বর ওয়ান। কাগজটাগজও খেয়ে ফেলে এক-একদিন। বদ্যিবুড়ো সন্ধেবেলা এসে রাগারাগি করে। গার্ডকে বকে। বিড়বিড় করতে-করতে মল্লিকে জোলাপ খাওয়ায়।

প্রত্যেক বছর এইরকম করেই মেলা শুরু হয়, শেষ হয়। এ-বছরও আর তিনটে দিন গেলেই নিশ্চিন্দি। নন্দ অবশ্য ক্যালেণ্ডার দ্যাখেনি। তবে বদ্যিবুড়ো সন্ধেবেলা এসে চিড়িয়াখানার কথা বকবক করে। তাই থেকেই জেনেছে। বদ্যিবুড়ো 'রিটার' হয়ে গেছে কয়েকবছর হল। তারপর এই পার্ক যখন হল, জঙ্গলের লোকেরা ওকে ডাকাডাকি করে নিয়ে আসে। কোথায় যেন ডাক্তারি করত জীবজন্তুদের। চিড়িয়াখানার এক কোনায় একচিলতে এক কোয়ার্টার, চালাঘর। সেইখানেই থাকে।

"আমারও দুটো আসল ছেলে ছিল, বুঝলি রে নন্দ, মল্লি।" হোমিওপ্যাথির শিশি থেকে ওষুধ বার করতে-করতে বুড়ো বলে। "বড় করলুম, লেখাপড়া শেখালুম। তাদের ডানা হল। তারা গেল বিদেশে থাকতে। বুকের ধন কাছে রইল না, মানিঅর্ডারের কুপনে-কুপনে ছয়লাপ আমার বাক্স।" নাক দিয়ে ফোঁত করে একটা শব্দ হয় বদ্যিবুড়োর। নন্দ-মল্লি আস্তে-আস্তে চোখ বুজে ফেলে।

আজও পাউরুটি-চিনি খেয়ে নন্দ ঝপাং করে জলে নেমে গেল। সোজা সাঁতরে খানিকটা দূর গিয়ে জলের ধারে যেখানে বাঁদরলাঠি গাছের নীচে আগাছার জঙ্গলে রোদ এসে পড়েছে, মল্লি উবুড় হয়ে শুয়ে। মুখটা ফাঁক হয়ে আছে, নাকের ডগাটা কাঁপছে একটু-একটু। নন্দ ওর পেটের কাছে হাত (থাবা) রেখে দ্যাখে। আঃ, বেশ জ্বর। হাওয়ায় ওষুধ-ওষুধ একটা গন্ধ উড়ছে। মল্লি চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করে, "বাঁদরগুলো এসে গেছে নাকি ?"

"বাঁদর ? কই ? কোথায় ?" নন্দ পুরনো অভ্যেসে গাছের মাথায় তাকায়, "কই, নেই তো ?"

"আঃ, ওপরে নয়, ওদিকে দ্যাখ না বোকারাম।"

"নাঃ, ওরা এখনও আসেনি। একটু বেলা বাড়লে বোধ হয় আসবে।" এই আর-এক উৎপাত হয়েছে আজকাল। আগে তো ছিল না। খালের দক্ষিণ ধারটা ঘিরে দিয়ে ওরা একটা লেকের মতো করেছে। তাতে চালাবার জন্য ছ'-সাতটা প্যাডল-বোটও আছে। টিকিট মাত্তর আট আনা। সারাদিন দস্যি ছেলেগুলো বোট চড়ছে, ধাঁই-ধাঁই করে বোটের কোনা লাগাচ্ছে জালের গায়ে, প্যাঁচার মতো চেঁচাচ্ছে। একদিন জলের কোণ ঘেঁষে শুয়ে ছিল নন্দ-মল্লি। ধনুর্ধরেরা বাঁশের কঞ্চির লাঠি জালির ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল ওদের। পিঠে লেগেছিল দু'-তিনবার—অতটা খেয়াল হয়নি। চোখের কোনায় একবার লাগাতেই মল্লি, "নন্দ রে, পালা, পালা।" বলে সুড়ুত করে জলে নেমে যায়।

"ওরা আমাদের পেছনে লাগে কেন বল দেখি ?"

নন্দ ভেবেচিন্তে বলে, "আমাদের বোধ হয় অন্যরকম দেখতে। কিম্ভূত।"

"ধ্যাত। তা নয়।" মল্লি রেগে যায়।

"আমাদের যে খাঁচা নেই, শম্বর, বাঁদর, খরগোশ ওদের মতো। এইজন্য হাতের কাছে পাচ্ছে ওদিক থেকে। বদ্যিদাদুকে বলতে হবে একদিন। গুঁফো গার্ডটা আজকাল কিস্সু দ্যাখে না দিনের বেলায়।"

সূর্য মাথার ওপর উঠে আসে আস্তে-আস্তে। খর রোদে চোখ

খুলতে পারে না ওরা। খুব ঘুমোতে থাকে, ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে। বেলা পড়ে এলে নন্দর ঘুম ভাঙে। চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখে, হু-হু বাতাস বইছে বিকেলের, জল নড়ছে ছলাতছল। লোকজনের ভিড় নিশ্চয়ই বেড়েছে মেলায়, কারণ একটানা গুনগুন শব্দের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বাচ্চাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ, ভেঁপুর ভঁপ-ভঁপ, সবকিছুর খিচুড়ি কানে এসে লাগছে। হ্যাংলা মল্লিটা ধারে-কাছে নেই, নিশ্চয়ই খাবারের গন্ধে-গন্ধে পাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দ ঘোলা চোখ তুলে তাকায়। জালের পেছনে অনেক লোক, নানারকম পোশাকের রং ওর ভোঁতা দৃষ্টির সামনে সমস্ত ঝাপসা হয়ে দুলতে থাকে। ঝপাং করে জলে ঝাঁপায় ও, তারপর সরসর করে ডুব-সাঁতার দেয়। জলে সামান্য আঁশটে গন্ধ শ্যাওলার, আকাশ ও তেঁতুল গাছের ভাঙা-ভাঙা টুকরো-টুকরো ছায়া, নন্দকে ওর ছোট্টবেলার কথা মনে পড়ায়। চারটে ভাই ছিল ওরা। মায়ের পিঠের ওপর, একজনের ওপর আর-একজন গাদা হয়ে'গাড়ি-গাড়ি' খেলত। একদিন খুব গভীর রাত্তিরে, যখন আকাশে ফুটফুট করছে অনেক তারা, নৌকোয় চড়ে অনেক লোক এসেছিল। পায়ে মোটা-মোটা তামার কড়া, উল্কি। পা-গুলোর দৌড়ে যাওয়া মনে পড়ে। মশালের আগুনে লাল হয়ে উঠেছিল নদীর চর। ঘুমন্ত মা'র পাশে অনেক ডিম ছিল, হইহই করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। এলোপাথাড়ি বাঁশের কুঁদো পড়েছিল মা'র নাকে, পিঠে, মাথায়। আর এক বুড়ি থাকত ওদের বালির চরে, নাম মনে নেই, একটা বাছুরকে টেনে আনতে গিয়ে খোঁটাসুদ্ধু উপড়ে গিলে নিয়ে চলে আসে। জেলেরা ঘিরে ধরেছিল বুড়িকে। তারপর বাঁশ দিয়ে, বল্লম দিয়ে, কী মার, কী মার। ঠাকুমার পেট চিরে পাওয়া গিয়েছিল এক বউয়ের হাতের মোটা-মোটা দুই রুপোর খাড়ু, অনন্ত, পায়ের মল। নন্দ কখনও মানুষের রক্তের গন্ধ পায়নি। মানুষের মাংস কেমন, পানসে না মিষ্টি কে জানে। বদ্যিবুড়ো ওদের প্রায়ই মাছ এনে দেয়, মিষ্টি জলের মাছ। একদিন ওরা দুজনে বসে মাছ খাচ্ছে, চৌকিদার বেড়ার জালের ওপার থেকে হেঁকে বলেছিল, "এই মেছো কুমিরেরা!"

ঢুলুনি এসে গিয়েছিল দু'চোখে, এমন সময়, ঝপাস্, ঝপাং! নন্দর পিছনে তারের ওপার থেকে কী যেন পাড়ের ওপর পড়ে গেল জল ঘেঁষে, তারপর গড়িয়ে জলের মধ্যে।

বেঁকে দেখার চেষ্টায় পুরোটা ঘুরে যায় নন্দ, জলের মধ্যে। সাপ না তো? পাড়ে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে। সব ক'টা কালো-কালো মাথা একসঙ্গে গাঁক-গাঁক করে চেঁচাচ্ছে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে হায়-হায় করছে দু'জন। জিনিসটা এবার নন্দর নাকের সামনে—হাত-চারেক দূরে—ও এবার দেখতে পেয়েছে। লাল একটা ফ্রকের কোনা, তার সঙ্গে কালো একটা মাথা—ভুস করে উঠে আবার ডুবে গেল। ছোট্ট একটা হাতের পাতা দেখা গেল একপলক। আবার হারিয়ে গেল। সন্ধের মুখে শিরশির করে বাড়ছে জোয়ারের জল। ওটা একটা মানুষের বাচ্চা। ছোট্ট এতটুকুন; সাঁতার-টাঁতার জানে না। জলের টানে-টানে চলে যাচ্ছে খালের মাঝখানটায়। অনেক দূরে বাঁ দিকে সেই তারের জালি, চারটে ছেলে, বোটের ওপর দাঁড়িয়ে, রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। নন্দ মরিয়ার মতো জল কেটে এগোতে থাকে। মাথাটা এবার নন্দর মুখের খুব কাছে। নন্দ সামনের ডান পা বাড়িয়ে ডুবন্ত জামাটাকে ধরে, তারপর দাঁতের ফাঁকে গুঁজে নেয় জামাটা। চারপাশের শোরগোল ঝিঁঝি পোকাদের একটানা চিৎকারের মতো দোলে ওর মাথার মধ্যে। উলটো দিকে যেতে হবে, ওদিকেই যে তেঁতুল গাছের গোড়া। দ্রুত এক মোচড় দেয় নন্দ ওর সমস্ত ভারী শরীরটাকে, তারপর পাড়ের দিকে মুখ করে জলের মধ্যে ভেসে চলে, হিড়-হিড় করে বাচ্চাটাকে টানতে-টানতে। তেঁতুল গাছের গোড়ায় আবার অনেক মানুষ নেমে এসেছে। একটা বউ হাঁউমাউ করে কাঁদে—পরনের শাড়ির আঁচল জলকাদায় ময়লা হয়ে মাটিতে এলোপাথাড়ি লুটোয়। সামনের দু'পা মাটিতে গেঁথে, হাঁ করে নন্দ, মানুষের বাচ্চাটাকে গড়িয়ে দেয় মাটির ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে ধেয়ে আসে পাগুলো, ওটাকে তুলে নিয়ে যায়, যেন মাটি থেকে ছিনিয়ে। আঃ কী অদ্ভুত আরাম লাগছে এবার, নন্দ, নন্দই পেরেছে। মল্লিটা কই, মল্লি পারেনি।

হঠাৎই নন্দর দু'চোখের মাঝখানে একটা আগুনের বল ফেটে ছড়িয়ে গেল। তরল আগুনের ধারা গড়িয়ে চোখ দুটোকে বুজিয়ে দিল। মাথাটা যেন চুরমার হয়ে গেল, নন্দর মাথার ওপর সন্ধের আকাশ, তেঁতুল গাছ ও তার ডালপালা গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। বদ্যিবুড়ো কই, এখনও বুঝি ফেরেনি কাজ থেকে? নন্দর গলার মধ্যে কতরকম শব্দ ঘড়ঘড় করে চলাফেরা করে। অনেক কষ্টে শরীরটাকে হিঁচড়ে টেনে তোলে সে, দুই পায়ের তলাতেই নরম মাটি পায় সে, তারপর কাদার ওপর আস্তে-আস্তে নামিয়ে আনে তার ভারী চোয়াল।

বিমূঢ় মল্লির চোখের সামনে, বদ্যিবুড়ো ফরেস্ট-গার্ডের দু' কাঁধ ধরে ঝাঁকায়, "বল্ বোকা, বল্, গুলি করলি কেন বল্ ওকে?"

"কী করব সার, লোকেরা ডেকে আনল—আমি ভাবলাম বোধ হয় মেরেই ফেলল মেয়েটাকে।"

"ওঃ গড্!" বদ্যিবুড়ো মাথা চেপে ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাল। "নন্দ, অ নন্দ!"

চারপাশ থেকে ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে। নন্দর চেতনার মধ্যে ছলাতছল করে অন্ধকার মাতলার জল। কত যেন রাত। আকাশে ফুটফুট করছে তারা। হইহই করে মশাল জ্বেলে মার ডিমগুলো নিয়ে পালাচ্ছে একদল লোক! কোথায় পালাচ্ছে! বদ্যিবুড়োর ডাক অনেক দূর থেকে ওর কানের কাছে ভেসে আসে। একবার মাথা তুলতে চায় ও। কিন্তু পারে না। ওর নাকের ডগা থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে স্থির হয়ে যায় একসময়। মানুষের কাণ্ডকারখানা থেকে রাগে গনগনে লাল হয়ে সূর্য ডুবতে থাকে দারাং পাহাড়ের মাথায়।

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

জ্ঞানের আলো

তোমরা হয়তো অনেকেই জ্ঞানের আলো বা লাইট অ্যানসার কুইজ গেম দেখেছ। ইচ্ছে করলে এই ধরনের কুইজ গেম খুব সহজেই বানাতে পারো। আজকাল স্কুলে কর্মশিক্ষার ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাতেও অনেক জিনিস হাতে-কলমে তৈরি করতে হয়। এখন যে খেলাটার কথা বলছি সেটা হল, একটা কাডবোর্ডের বাঁ পাশে পর-পর আটটা প্রশ্ন আছে। আর ডান পাশে সেইসব প্রশ্নের উত্তর ওলট-পালট করে দেওয়া আছে। যেমন ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ৬ নম্বরে, তেমনই ৬ নম্বরের উত্তর আছে ১ নম্বরে। একটা টর্চের বাল্‌ব এবং ব্যাটারির সঙ্গে তার দিয়ে লাগানো আছে ছোট দুটো স্টিক বা পেরেক। স্টিক দুটোর যে-কোনও একটা প্রশ্নের পাশের জেম ক্লিপের উপর ধরো, কী উত্তর হবে ভেবে অন্য স্টিকটা উত্তরের পাশের জেম ক্লিপে ঠেকাও। যদি ঠিক উত্তর হয় তা হলেই আলো জ্বলে উঠবে। আর যদি ভুল হয় তা হলে আলো জ্বলবে না। খেলাটা খেলতে যেমন মজার, তেমনই তৈরি করাটাও আরও মজার। এবার খেলাটা কীভাবে তৈরি করবে তা বলছি।

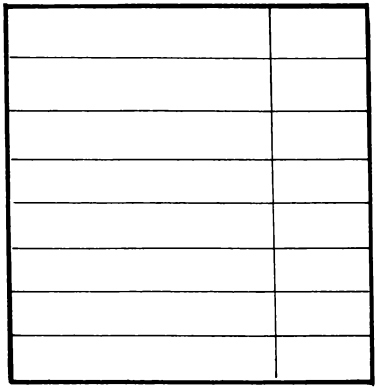

১ নং ছবি

কী কী জিনিস লাগবে

১· একটা ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২০ সেন্টিমিটার চওড়া কাডবোর্ড।
২· ১৬টা জেম ক্লিপ বা পেপার ক্লিপ।
৩· একটা টর্চের ৬ ভোল্টের বাল্‌ব এবং হোল্ডার।
৪· একটা টর্চের ১·৫ ভোল্টের ব্যাটারি।
৫· দেড় মিটার লম্বা সরু ইলেকট্রিক তার।
৬· দুটো পেরেক (৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি)।
৭· সেলোটেপ বা ব্ল্যাকটেপ

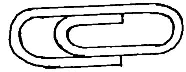

জেম ক্লিপ বা পেপার ক্লিপ

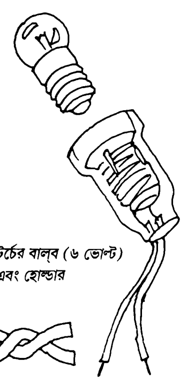

টর্চের বাল্‌ব (৬ ভোল্ট) এবং হোল্ডার

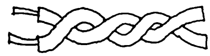

বিশেষ সতর্কতা

এই খেলায় টর্চের ব্যাটারি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা চলবে না। ইলেকট্রিক মেইন-এর সঙ্গে কোনওরকম সংযোগসাধন নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

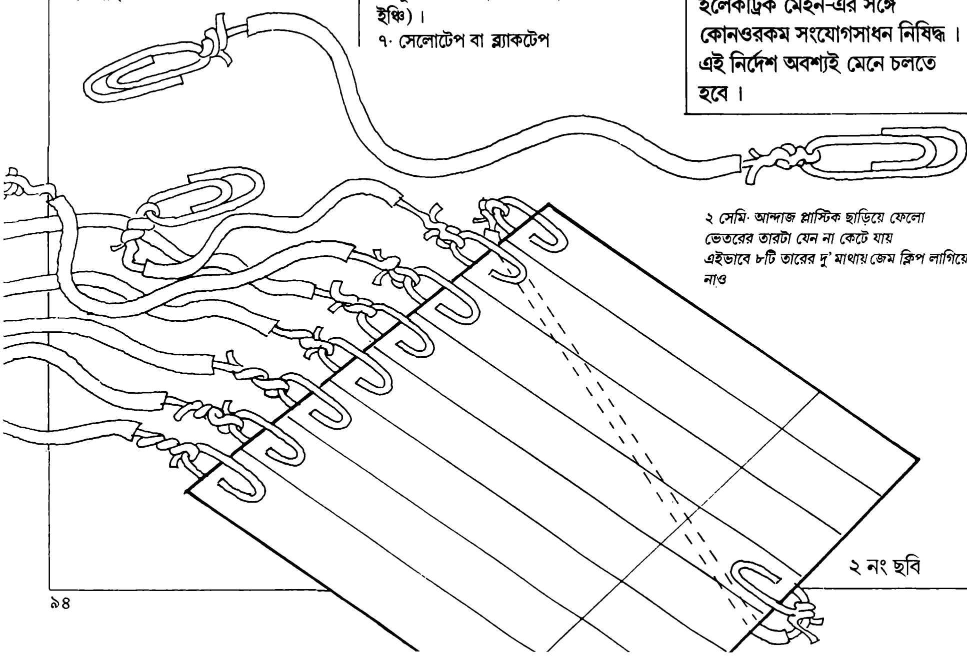

২ নং ছবি

এক নম্বর ছবির মতো কাডবোর্ডের ওপর রুল টেনে আটটি প্রশ্ন এক-দুই করে বাঁ দিক থেকে পর-পর লিখে ফেলো। এবং উত্তরগুলো ওলট-পালট করে ডান দিকে লেখো। এবার ৪০ সেন্টিমিটার মাপের আটটি তার কেটে নাও। এই আটটি তারের দুটো মুখ ছবিতে যেমন দেখানো আছে ঠিক সেইভাবে প্লাস্টিকটা ২ সেন্টিমিটার আন্দাজ ছাড়িয়ে

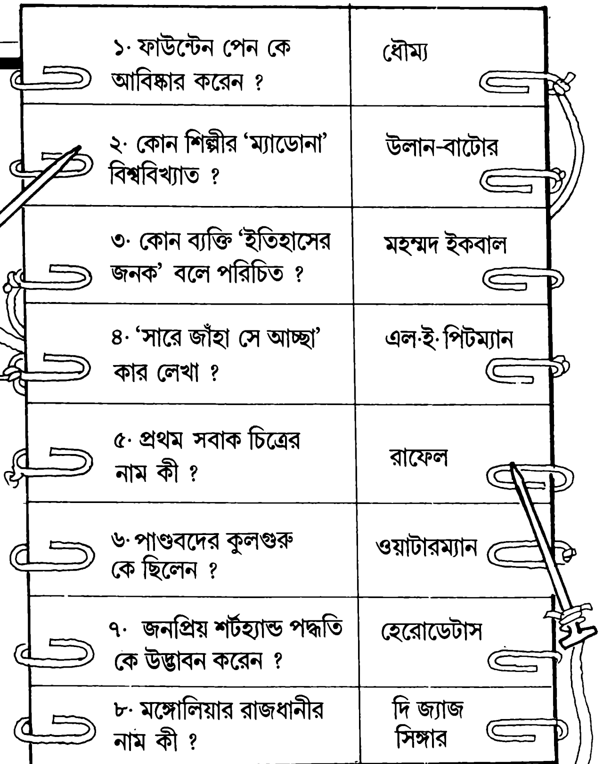

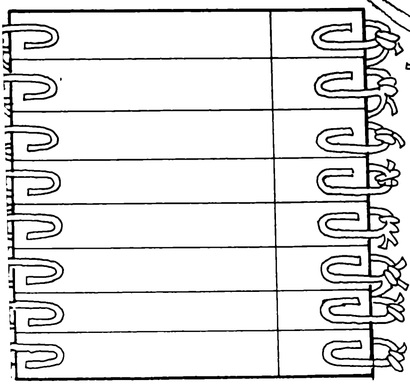

৩ নং ছবি

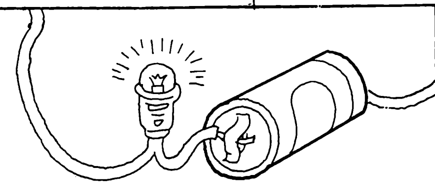

ব্যাটারির মাথার দিকে (+) এবং নীচের দিকে (-) এইভাবে সেলোটেপ দিয়ে তারটি লাগিয়ে নাও

ফেলো। দেখো, ভেতরের তারটা যেন না কেটে যায়। এবার দু' মাথায় দুটো জেম ক্লিপ শক্ত করে পেঁচিয়ে লাগিয়ে নাও। এইভাবে আটটি তারের দু' মাথায় জেম ক্লিপ লাগিয়ে ফেলো।

এখন এই আটটি তারের এক দিকের জেম ক্লিপ কাডবোর্ডের যেদিকে প্রশ্নগুলো আছে সেদিকে প্রশ্নের পাশে-পাশে পর-পর লাগিয়ে যাও, ২ নং ছবির মতো। এবার তারের অন্য দিকের জেম ক্লিপগুলো কাডবোর্ডের নীচ দিয়ে এনে যেটার যা উত্তর সেইভাবে উত্তরের পাশে-পাশে লাগিয়ে দাও। ৩ নং ছবিটা লক্ষ করো।

বাল্‌বটা হোল্ডারের সঙ্গে লাগিয়ে নাও। হোল্ডারের দুটো তারের শেষের দিকটা প্লাস্টিক খুলে নিয়ে এক দিকে একটা পেরেকের সঙ্গে পেঁচিয়ে লাগাও। এবং অন্য দিকটা একটা ব্যাটারির মাথার দিকে (+) সেলোটেপ দিয়ে ভালভাবে লাগিয়ে নাও।

এবার আরও একটা দু' মুখ ছাড়ানো তার নাও। এই তারের একটা দিক ব্যাটারির নীচের দিকে (-) সেলোটেপ দিয়ে লাগাও। আর-একটা দিক দ্বিতীয় পেরেকটার সঙ্গে পেঁচিয়ে লাগিয়ে নাও। ছবিটা ভালভাবে লক্ষ করলে বুঝতে অসুবিধে হবে না। শুধু মনে রাখতে হবে সব তার ঠিকমতো জোড়া না হলে খেলাটা হবে না। খেলাটা এবার তৈরি। বন্ধুদের দেখাতে পারো। ইচ্ছে করলে এইভাবে আরও আটটি নতুন প্রশ্ন এবং উত্তর আলাদা একটা কাগজে লিখে বোর্ডের ওপর লাগিয়ে নিতে পারো।

প্রশান্ত সেন

ধাঁধা

ভাইফোঁটার দিন সন্ধেবেলা নিজে থেকেই ধাঁধাটা দিল ছোটকা। ভাইফোঁটার দিন দারুণ ফুরফুরে লাগে। সকালে সাততাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পিঁড়িতে বসে ফোঁটা নাও আর জলখাবার খাও। চাই-কি উপহারের প্যাকেটও বগলদাবা করো। দুপুরে ভাল-মন্দ খাও। রাত্তিরেও অন্য দিনের থেকে আলাদা ধরনের খাবারের গন্ধে মন-উড়ুউড়ু ভাব জমুক। এমন দিনে কি বেশি মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে? বিশেষত, আমাদের বাড়ি তো সকাল থেকেই জমজমাট। পিসিরা আসবে, বোনেরা আসবে। এ-বেলা একদল আয়োজন করবে, ও-বেলা আর-একদল। সে-এক হইহই রইরই কাণ্ডকারখানা। কথায়-কথায় আসল কথাই কখন হারিয়ে ফেলেছি। ছোটকা যখন ধাঁধার কথা তুলল, তখন ঘড়িতে বাজে পৌনে সাতটা। আমরা সবাই ছোটকার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। কখন ধাঁধাটা বলে ছোটকা। কোন ধরনের ধাঁধা বলে। ছোটকা কিন্তু একবার ধাঁধার কথা বলেই চুপ করে গেছে। আর, অনেক লোক যে-ঘরে, সেখানে চুপচাপ মুহূর্ত কেটে যাওয়ার অবকাশ নেই। তাই, নানান গল্প-গাছায় আবার ঘর সরগরম। ছোটকা মুখ খুলল, ঠিক সাতটায় পুরনো দিনের পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা আওয়াজ হল। আর সেই আওয়াজটা শেষ হতেই ছোটকা বলল ধাঁধাটা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা পেটা ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা বাজতে সাত সেকেন্ড সময় লাগলে, সেই ঘড়িটাতেই দশটার ঘণ্টা বাজতে কত সময় লাগবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শুধু ২ অঙ্ক ব্যবহার করে ২৩ লিখতে পারো? কীভাবে লিখলে ২৩ হবে? ২ যতবার খুশি ব্যবহার করতে পারো।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নামেই কাকা, আসলে হ্রদ। হ্রদ কি কারও কাকা হয়?

গতবারের উত্তর ॥ (১) যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি ঘুমোচ্ছ?' তা হলে সে কিছুতেই 'হ্যাঁ' বলতে পারবে না। কেননা, যদি হ্যাঁ বলে, তা হলে বুঝতে হবে, সে ঘুমোচ্ছে না, জেগে আছে। (২) ২০০। (৩) 'ভুল' শব্দটি।

সত্যসন্ধ

কত কথা

দুটি ফুলের সঙ্গে দুটি ফলের মিতালি হলে হবে বিশেষ দুটি ফল। সে-দুটি কী কী?

২। নীচে চারটি দু-অক্ষরের ছোট-ছোট শব্দ দেওয়া হল।

এগুলোর আগে একই শব্দ (বা উপসর্গ) বসিয়ে চারটি চার-অক্ষরের শব্দ তৈরি করতে হবে।

—শর
—জয়
—ক্রম
—ভূত

৩। বসন্তপবন শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি শব্দ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?

উত্তর ১। চাঁপাকলা, গোলাপজাম। ২। পরাশর, পরাজয়, পরাক্রম, পরাভূত। ৩। বসন্ত, সন্ত, পবন, বন—মোট চারটি।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলা সার্থকনামা। এতই মজাদার যে, যে দেখবে সেই হাসবে। আরও বড় কথা হল, যে এ-খেলায় হেরে যাবে, সেও মজা পাবে। অবশ্য, প্রথমে নয়। শেষে। যখন উত্তরটা তাকে দেখানো হবে।

এ-খেলার জন্য উপকরণও তেমন কিছু লাগবে না। শুধু বন্ধু চাই আর চাই কাগজ-কলম। কাগজ-কলম প্রথমেই হয়তো লাগবে না। কেননা, প্রথমে বন্ধুকে একটা সহজ প্রশ্ন করা হবে। উত্তরের জন্য সে যদি কাগজ-কলম চায়, তবেই না কাগজ-কলমের প্রশ্ন।

ওহো, প্রশ্নটা কী, তাই তো বলা হয়নি। প্রশ্নটা হল, বারোর অর্ধেক সাত হয়, প্রমাণ করতে পারো?

বন্ধুদের সামনে এমন একটা প্রশ্ন করলে তারা প্রথমেই ভাববে, অবাস্তব ব্যাপার। অসম্ভব ব্যাপার। বারোর অর্ধেক কখনও সাত হতে পারে না।

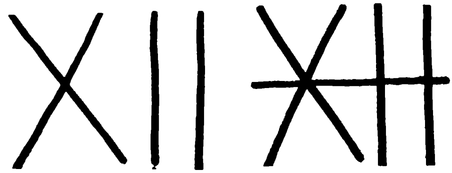

তো, তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন তোমার পক্ষে তো আর ব্যাপারটাকে অবাস্তব-অসম্ভব বলে ভাবা মানায় না। সুতরাং বন্ধুরা যদি প্রশ্ন শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, তোমাকে গম্ভীর হয়েই থাকতে হবে। আর গম্ভীর মুখেই বলতে হবে, চেষ্টা করো, চেষ্টা করে দ্যাখো। না পারলে হার মানো, তখন আমি করে দেখাব, কীভাবে বারোর অর্ধেক সাত হয়।

বলা বাহুল্য, চেষ্টা করবে না কেউই। কেননা, শুনলেই যা অবিশ্বাস্য মনে হয়, তার জন্য চেষ্টা করা বৃথা ভাববে সবাই। তবু যদি কোনও বন্ধু দুঃসাহসী হয়ে চেষ্টা করতে চায়, বাধা দেওয়ার দরকার নেই। কেননা, শেষ পর্যন্ত সেও হার মানবে। সব শেষে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার ভার পড়বে তোমারই উপর। তুমি তখন কী করবে, উপরের ছবি থেকে দেখে নাও। রোমান হরফে বারো লেখো। মাঝখান দিয়ে দাগ টেনে দু'ভাগ করো। দেখবে, বারোর অর্ধেক 'সাত' কেমন জ্বলজ্বল করছে একটা ভাগে।

মজারু

ধাঁধানো ছবি

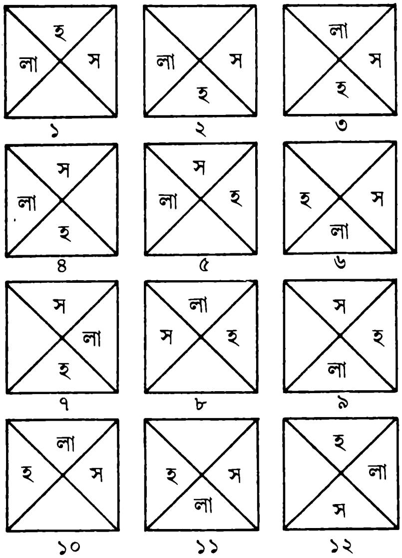

এবারের ছবির মজায় রয়েছে বারোটি চৌকো ঘর । প্রত্যেকটি চৌকো কোনাকুনি ভাগ করে চারটি করে খোপ পাওয়া গেছে । এবার প্রত্যেকটি চৌকোর তিনটি খোপ নির্দেশমতো তিনটি রং দিয়ে ভরিয়ে ফেলতে হবে । একটি করে খোপ সাদা পড়ে থাকবে । রং করা হয়ে গেলে এই বারোটি চৌকো ঘরের কোন্ দুটি হুবহু একরকম খুঁজে বের করতে হবে । দ্যাখো তো পারো কি না ! লা = হবে লাল, হ = হবে হলুদ এবং স = হবে সবুজ রং ।

উত্তর : ৬ ও ১১ নম্বর চৌকো ।

চিত্রক

হাসিখুশি

"বোম্বাই কিংবা দিল্লি ট্রেন ভ্রমণের সময় আমার দাদু বার্থ রিজার্ভ করে যান ঠিকই, কিন্তু ঘুমোন না । জেগেই রাত কাটিয়ে দেন ।"
"কেন, ট্রেনে বুঝি তাঁর ঘুম হয় না ?"
"আরে না না, তা নয়, একবার দিল্লি যাবার পথে সকালে ঘুম ভেঙে দ্যাখেন, তাঁর সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত চুরি হয়ে গেছে । সেই থেকে সতর্ক হয়েছেন, ট্রেনে ভুলেও ঘুমোন না ।"

"গত মাসে এক জোড়া ড্রাম কিনেছি, রোজগারও মন্দ হচ্ছে না ।"
"তুমি কি ব্যান্ড পার্টিতে যোগ দিয়েছ নাকি ?"
"আরে না না । ড্রাম না পেটার জন্য বাবা আমাকে রোজ পঞ্চাশ পয়সা দিচ্ছেন ।"

ট্যানগ্রাম

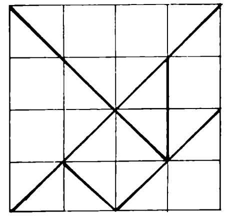

গত সংখ্যার মুখের ছবির সমাধান দেওয়া হল । তোমরা যারা পারোনি, তারা দেখে মিলিয়ে নাও । ট্যানগ্রামের সাতটি টুকরো যাদের তৈরি নেই,

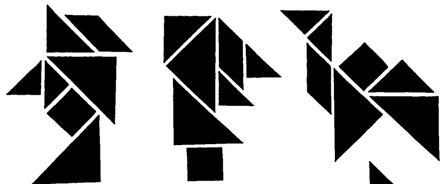

তারা একটা শক্ত কাডবোর্ড পেনসিল দিয়ে আট সেন্টিমিটার মাপের একটা বর্গক্ষেত্রকে সমান ষোলোটি ভাগে ভাগ করো । এবার ওপরের ছবির মতো মোটা লাইন অনুযায়ী সাতটি টুকরো বানাও । এখন এই সাতটি

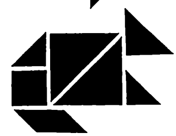

টুকরো দিয়ে অসংখ্য ছবি করতে পারো । দেখেই বুঝতে পারছ নীচের ছবিটির কোনও সমাধান নেই । চেষ্টা করে দ্যাখো পারো কি না ।

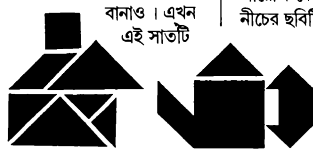

প্রবীর

আঁকিবুকি

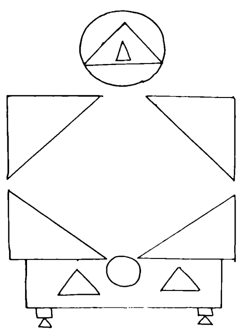

কল্পনায় আঁকো

বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে এবার আমরা আঁকার পাতা ভরিয়ে তুলব অন্য কল্পনায় । আমি একরকম কল্পনা করেছি । তোমরা তোমাদের মতো কল্পনায় ছবি আঁকার চেষ্টা করো এই বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে ।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের একাঙ্ক নাটকের অনবদ্য সঙ্কলন

কিশোর একাঙ্ক সম্ভার
সম্পাদনা : দিলীপকুমার মিত্র।
নবগ্রন্থ কুটির, কলকাতা
৩০ টাকা

ছোটদের একাঙ্ক নাটকের অভাব চোখে পড়ে যখন পুজো বা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পাড়ায় কোনও নাটক মঞ্চস্থ করার কথা মাথায় আসে। সেদিক থেকে একসঙ্গে চব্বিশটি একাঙ্ক নাটক হাতে পাওয়া একটা বড় লাভ।
বইটিতে একদিকে যেমন বহুপঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রের পরীক্ষা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বহুরূপী' বা সুকুমমার রায়ের 'অবাক জলপান' রয়েছে, তারই সঙ্গে আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভীম বধ', শিবরাম চক্রবর্তীর 'মামা-ভাগ্নে' অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্ধকারে গোলাপ বাগানে'। মন্মথ রায়ের 'সোনার তাল' পড়তে পড়তে সেই 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'—নীতিবাক্যটি মনে পড়ে যায়। সুনির্মল বসুর 'দাদার কথা মিথ্যে নয়' কিংবা লীলা মজুমদারের 'আলো'—কোনটা ছেড়ে, কোনটা পড়ি। এ-ধরনের সঙ্কলন যত প্রকাশিত হবে ততই ভাল।
নানা ফুলকে এক-একটি চরিত্র সাজিয়ে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে 'সৌরভ' নাটক তা যেমন ভিন্ন স্বাদের, তেমনই বেশ লাগে পড়তে সহপাঠিনীদের নিত্য কাকলিকে নিয়ে অমল রায়ের লেখা 'অলৌকিক উদ্যানে' পড়তে। নাটক মানে তো তাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করাই নয়, আজ-কাল নাটক পাঠেরও চল হয়েছে। দু' দিক থেকেই এই একাঙ্ক নাটকগুলি ছোটদের কাছে লোভনীয়।
ছোটদের মনে কল্পনার রঙিন ফানুস চিরকালই উড়েছে, তাই তাদের খুব ভাল লাগবে সমীরণ আচার্যের 'সোনার পাথরবাটি'। আদর্শ বা ন্যায়নীতির কথা যাদের ভাল লাগে, তাদের জন্য রয়েছে তলস্তয়ের একটি গল্প অবলম্বনে ঊর্মি মিত্রের 'যেখানেই ভালবাসা'। আবার নাটকের মধ্যেই একটা নাটক দেখলে ভারী ভাল লাগে। যে ছোটরা নিজেদের বড় ভাবতে ভালবাসে তাদের খুব ভাল লাগবে মিলন রায়ের 'একটি নাটকের জন্ম'। প্রবীণ ও নবীন নাট্যকারদের রচনায় সমৃদ্ধ এই বইটি হাতে পেলে শুধু ছোটরাই কেন, বড়রাও কেউ হাতছাড়া করতে চাইবেন না।

তরুণ চক্রবর্তী

অমর জীবনকাহিনী

রাজার কুমার পক্ষিরাজে
দেবেশ দাশ
ওরিয়েন্ট লংম্যান
কলকাতা-৭২
১২ টাকা

অতীত বাঙলার গৌরব, শৌর্য আর জ্ঞানের আধার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ছিলেন বিশ্বমানবতার প্রতীক। মহাকালের স্রোতে তাঁর জীবনী লীন হয়ে গিয়েছে। দেবেশ দাশের 'রাজার কুমার পক্ষিরাজে' সেই বিস্মৃত মহাজীবনের অনেকখানি উন্মোচিত। জন্ম থেকে তিরোভাব পর্যন্ত জীবন-সূত্রগুলি গাঁথতে-গাঁথতে লেখক সমকালীন ভারতের ধর্ম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক জীবনে আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশের বিক্রমপুরের গৌড়রাজের সন্তান রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভের সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ, পাণ্ডিত্য অর্জন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ উপাধি লাভ, শাস্ত্রজ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশযাত্রা, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর মগধের রাজা ন্যায়পাল কর্তৃক বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ হওয়ার অনুরোধ, আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বত যাত্রা ইত্যাদি ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বইটিতে।
লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন—অতীশের বাণী, সাধনায় উপলব্ধ প্রজ্ঞা, আদর্শমানব জীবনের পালনীয় সত্য ও কর্তব্য।
তিব্বতে প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন বাঙালি কেমন করে তিব্বতিদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, তারই আশ্চর্য কাহিনী এই গ্রন্থে রয়েছে। অতীশের জীবনের পবিত্রতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলন প্রত্যক্ষ করে তিব্বতের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তন্ত্রমন্ত্রের অলৌকিকত্ব, প্রেতাত্মার পূজা, কুসংস্কার ভুলে তিব্বতবাসীরা ধর্মীয় নীতিজ্ঞানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। সে-দেশের মানুষ আজও তাঁর মাহাত্ম্য-মর্যাদাকে ভোলেনি। মহত্ত্ব, প্রেম, করুণার মাধ্যমে মানবসত্তাকে কীভাবে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা যায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

স্বপন দাস

খেলোয়াড়দের অবশ্যপাঠ্য

ক্রীড়াজগতে চিকিৎসাবিজ্ঞান
ডাঃ সুনীল ঠাকুর
নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা-১২
৩৬ টাকা

ক্রীড়াবিজ্ঞান ও ক্রীড়াচিকিৎসার সার্বিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ ছাড়া কোনও দেশই খেলাধুলোয় প্রকৃত উন্নতি করতে পারে না। উন্নত দেশগুলিতে এই ক্রীড়াবিজ্ঞান ও ক্রীড়াচিকিৎসার মূল্য অসীম।
কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ক্রীড়াচিকিৎসার প্রসার এখনও সেভাবে ঘটেনি।

প্রখ্যাত চিকিৎসক সুনীল ঠাকুর ক্রীড়াচিকিৎসা নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন। আলোচ্য বইটি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। ক্রীড়াচিকিৎসা কী ও কেন, দক্ষ খেলোয়াড়ের লক্ষণ, খেলোয়াড়দের সুস্বাস্থ্যই দরকার, শারীরিক সক্ষমতা, ওয়ার্ম আপ, দরকার সুষম খাদ্যের, খেলাধুলায় আঘাত, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে লেখক সহজ সরল ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই মূল্যবান বইটি প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবশ্যপাঠ্য।

পরেশচন্দ্র সরকার

YOU COULD HAVE THESE BOOKS

FREE

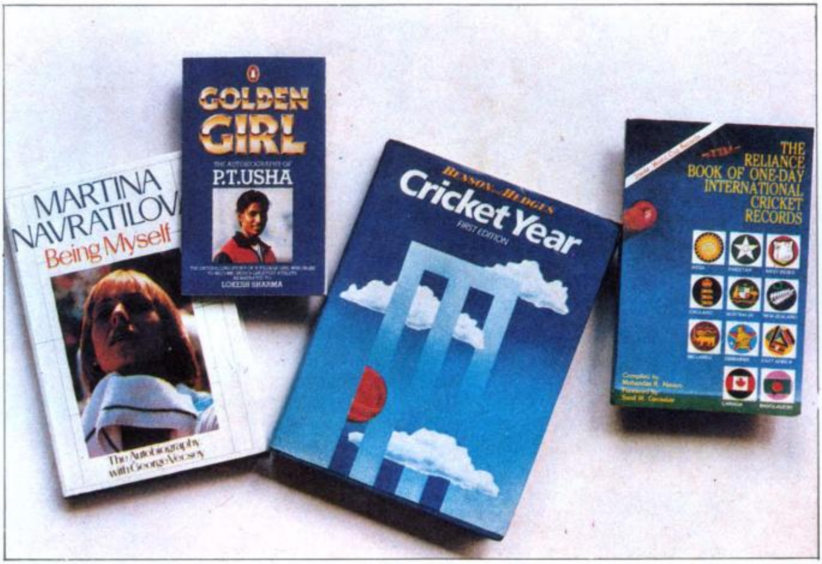

THE SPORTSWORLD-MARINE SPORTS SPECIAL OFFER

Subscribe to Sportsworld for a year and you will get free books of your choice from Marine Sports, Bombay

Sportsworld is available by (inland) post

Rs. 310 a year (52 issues); Rs. 610 for two years (104 issues). An annual saving of Rs. 54 per year on the newsstahd price, plus a book delivered to you.

Following are the books you can choose from

Any TWO for a year's subscription
Bicentennial Test—official book—Rs. 60 (actual price)
B & H series—1987-88 Rs. 60
Australia's World Cup champion Rs. 60
Who's who in one day internationals Rs. 60
Howzat! Cricket Cartoons Rs. 20
Table tennis: Harold Myers Rs. 36
The story of squash Rs. 86
The Guardian book of sports 1982/83 Rs. 364

Any ONE for a year's subscription
Being Myself: Martina Navratilova Rs. 280
Boycott by Don Mosey Rs. 290
Benson & Hedges Cricket year Rs. 280
World Cup Cricket '87 Rs. 75
Play fair Cricket Annual '88 Rs. 49
Zola Rs. 144
The Badminton Story Rs. 131
Golden Girl: P.T. Usha Rs. 35

Tick off the one/two titles you want and send your order mentioning your address and the two/one book you want to

The Circulation Manager

Ananda Bazar Patrika Ltd 6, Prafulla Sarkar Street, Calcutta 700 001.

Please draw your demand draft/cheque in favour of: Ananda Bazar Patrika Ltd, Calcutta

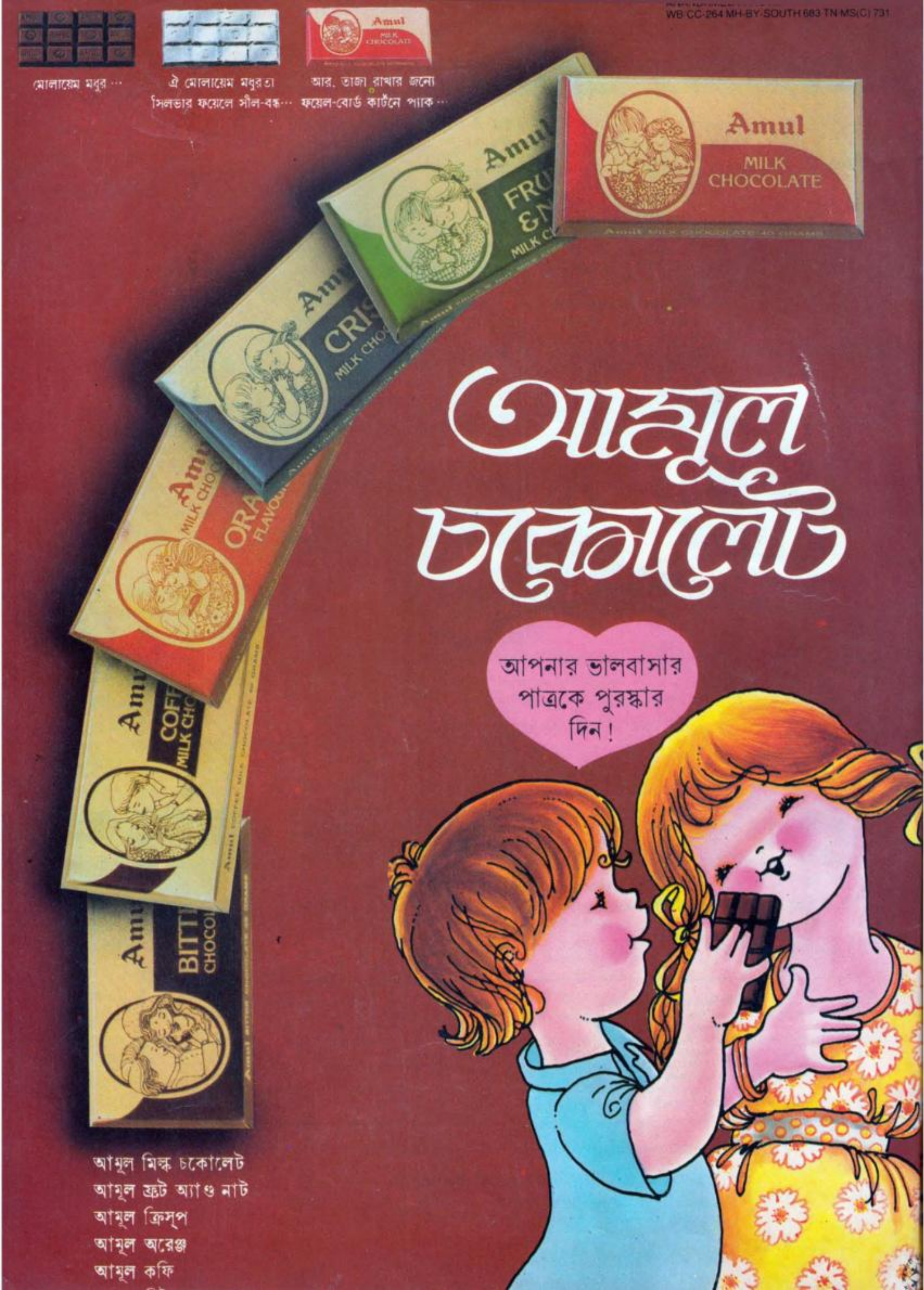

WB-CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN-MS(C) 731
মোলায়েম মধুর ···
ঐ মোলায়েম মধুরতা
সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ···
আর, তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক···
Amul
MILK
CHOCOLATE
আমূলে চকোলেট
আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন!
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি